শুকতারা

প্রথম সংখ্যা
ফাল্গুন•১৪০৮
১০.০০

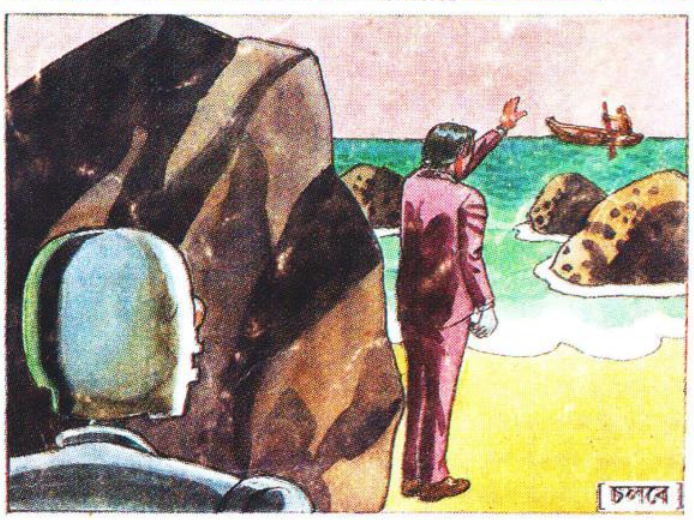

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - লাইব্রেরী
স্ক্যান করেছেন - অপ্টিমাস প্রাইম
এডিট করেছেন - পৌষালী পাল

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা
স্ক্যান করতে চান কিংবা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান
তাহলে নিচের ইমেলে যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com
optifmcybertron@gmail.com

ভারতবর্ষে সবাধিক বিক্রীত কমিকস

ডায়মণ্ড কমিকস

এই মাসে পড়ুন

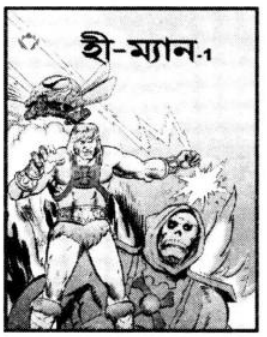

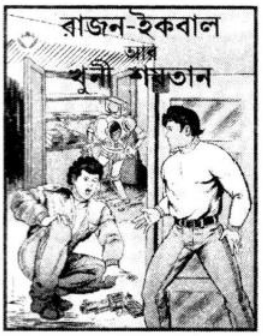

ডায়মণ্ড কমিকস বুক ক্লাব -এর সদস্য হোন এবং বাড়ী বসে ৫০ টাকার কমিকস ৪৫ টাকায় নিন। ডাক ব্যয় ৬ টাকাও আর আলাদা করে দিতে হবে না। এই ভাবে প্রতি মাসে ডায়মণ্ড কমিকসের ৫-টি কমিকসের সেট আপনি বাড়ী বসেই পেতে পারেন। এই স্কীম কেবলমাত্র ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। বাংলাদেশ বা ভারতের বাইরে আর কোন দেশে প্রযোজ্য হবে না। সদস্যতা কুপন ভরে পাঠাবার সময়ই সদস্যতা শুল্ক ২০ টাকা আপনি ডাক টিকিটের মাধ্যমে পাঠান। নিজের নাম-এবং ঠিকানা ইংরেজীতে স্পষ্ট করে লিখুন। সময়ে-সময়ে আপনাকে অন্যান্য উপহারও পাঠানো হবে। লাগাতার ১২-টি ভি.পি. ছাড়ালে ১৩ নম্বর ভি.পি. ফ্রী! ডায়মণ্ড পরিবারের সদস্য হোন এবং মনোরঞ্জনের দুনিয়ায় নিজেকে হারিয়ে ফেলুন।

এক বছরে মাস	কনশেসন (টাকা)	মোট সঞ্চয় (টাকা)
১২	৫.০০ (কনশেসন)	৬০.০০
১২	৬.০০ (ডাক খরচ)	৭২.০০
১	৫০.০০ (১৩ নং ভি.পি. ফ্রী)	৫০.০০
সদস্যতা প্রমাণপত্র এবং অন্য আকর্ষক উপহার, স্টিকার এবং ডায়মণ্ড পুস্তক সমাচার ফ্রী		২০.০০
		২০২.০০

সদস্য হওয়ার জন্য আপনি কেবল নীচের কুপনটি ভরে পাঠান এবং সদস্যতা শুল্ক ২০ টাকা ডাক **টিকিট** অথবা মানি অর্ডারের রূপে অবশ্যই পাঠান। এই স্কীমের অন্তর্গত প্রতি মাসে ২০ তারিখে আপনাকে ভি.পি. পাঠানো হবে, যাতে ৬-টি কমিকস থাকবে।

হ্যাঁ! আমি '**ডায়মণ্ড কমিকস বুক ক্লাব**'-এর সদস্য হতে চাই এবং আপনাদের দ্বারা দেওয়া সুবিধাগুলো পেতে চাই। আমি নিয়মগুলো ভাল করে পড়ে নিয়েছি। আমি কথা দিচ্ছি প্রতি মাসে ভি. পি. ছাড়িয়ে নেব।

নাম : _____

ঠিকানা : _____

পোস্ট : _____ জেলা : _____

পিন কোড : _____

সদস্যতা শুল্ক ২০ টাকা ডাক টিকিট / মানি অর্ডারের রূপে পাঠাচ্ছি।

আমার জন্মদিন : _____

নোট : সদস্যতা শুল্ক পাওয়ার পরই সদস্যতা দেওয়া হবে।

এই স্কীম কেবলমাত্র ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বাংলাদেশ অথবা অন্য কোন দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

ডায়মণ্ড কমিকস প্রা. লি. 257, দরিবা কলান, দিল্লী-110 006

বাঁটুল দি গ্রেট

আজ খুব দেরী হয়ে গেছে। দুধটা তাড়াতাড়ি ডিপোতে পৌঁছে দিতে চেষ্টা করো।
ঠিক আছে।
দুধ
সবাই খুব সেয়ানা হয়ে গেছে, দোস্ত। কেউ আর তোলা দিয়ে ঝোলা ভরে দিতে চায় না। তাই ঠিক করেছি দুধের গাড়ি লুট করবো!
রাস্তায় গাড়ি অচল করবে এরা তারপর আমরা আশপাশ থেকে সচল হয়ে উঠবো। বুঝলি কিছু?
একেবারে জলের মতো, গুরু! হেঃ হেঃ হেঃ!
পেরেক
ঠিক মতো পৌঁছোতে গেলে আরো একটু জোরে যেতে হবে।
আজ্ঞে, গুরু! গাড়ি অচল হলেই আমরা সচল হয়ে কাম শুরু করে দেবো।
অ্যাই মরেচে! রাস্তায় এতো কাঁটা পেরেক এলো কোত্থেকে!
দুম! দুম!
আমাদের কাছ থেকে। আপনি গাড়িতে থাকুন শুধু দুধটা আমাদের চাই।
সাধারণের জন্যে দুধ। চাই বললেই কি পাওয়া যায়!
কি, এবার পাওয়া যাবে?
ওরে বাবা! ইয়ে- হ্যাঁ-হ্যাঁ অবশ্যই পাওয়া যাবে।

সকালে হাল্কা দৌড়োলে শরীর মন দুই-ই চাঙ্গা থাকে।
সামনে একটা গাড়ি ঘিরে কয়েকজন লোক। অ্যাকসিডেন্ট হয়নি তো, বাঁটুলদা?
অ্যাকসিডেন্ট নয়, বাঁটুলদা! মনে হচ্ছে লোকগুলোর হাতে বন্দুক রয়েছে!
ব্যাপারটা গোলমেলে বলে মনে হচ্ছে!
এখানে এসব কি হচ্ছে, ভাই?
ওসব জেনে তোমার কোন লাভ নাই, আমরা চাই তুমি এখুনি এখান থেকে হড়কাও।
দ্যাখো, এরা দুধ ছিনতাই করার তাল করেছে।
দেখুন, এই দুধ আপনারা ছিনতাই করলে অনেক বাচ্চাই দুধ পাবেনা।
এই দুধ অন্য জায়গায় বেচে মাল কামাবো।
তাহলে আপনারা কেন, আমিই ছিনতাই করবো।
তাই বুঝি! তাহলে দুধের বদলে এই নে!
দুম
ওরে, ভাই, দুধ লুটে কাম নাই, জান নিয়ে এবার চল পালাই।
পালালেই বাঁচা, না হলেই প্রাণপাখি ছেড়ে যাবে খাঁচা।
দুধ
গাড়ির চাকা ফেঁসে গেছে কাজেই দুধ পৌঁছানোর এ ছাড়া উপায় নেই।
ঘটনা শুনে দুধের আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম কিন্তু তুমি আমাদের অপযশ থেকে বাঁচিয়ে দিলে, বাঁটুল!
এবার আমরা সব সেন্টারে দুধ পাঠিয়ে দিতে পারবো।
দুধ

ফাল্গুন ১৪০৮
ফেব্রুয়ারি ২০০২

শুকতারা ৫৫

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত ছোটদের সেরা মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

৮ রাতে চোর পড়ল বাংলোয় আর সকালে কর্নেল কুড়িয়ে পেলেন হুমকি দেওয়া চিঠি। তিনি ঠিক করলেন চিঠির কথামতোই কাজ করবেন। তবে কি কর্নেল ভয় পেলেন জাহাজিবাবুকে? এদিকে ঘটে গেল আরেক কাণ্ড। খুন হলো দীপনারায়ণ রায়। ভৈরব যে জয়ন্তকে বলেছিল জাহাজিবাবু এলেই একটা করে লাশ পড়ে—তবে কি সে কথা সত্যি? কী রহস্য লুকিয়ে আছে এখানে?—সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ধারাবাহিক গোয়েন্দা উপন্যাস তিতলিপুরের জঙ্গলে।

১২ ডক্টর রক্ষিত চারু সম্পর্কে যে কমপ্লিমেন্ট দিয়ে গেলেন তাতে আদিনাথবাবুর গর্বে বুক ভরে ওঠার কথা, কারণ চারু তাঁরই আবিষ্কার। কিন্তু তা না হয়ে তাঁর বুকের ভেতরটায় যেন কাঁটা বিঁধতে লাগল। চারুর প্রতি আদিনাথবাবুর এই হঠাৎ বিরূপতার কারণ জানতে পারবে কুমার মিত্রর লেখা আদিনাথবাবুর বিভ্রম গল্পে।

৫৩ মহামিলন প্রেক্ষাগৃহ আজ লোকে লোকারণ্য। এক অদ্ভুত চ্যালেঞ্জের জবাব দেখতে ভিড় করে এসেছে শহরবাসী। চ্যালেঞ্জ যে জানিয়েছে সে উপস্থিত কিন্তু যিনি তার জবাব দেবেন তিনি? রুদ্ধশ্বাস সেই জবাবের গল্প বিদ্যুৎ চৌধুরীর লেখা শেষ ম্যাজিক।

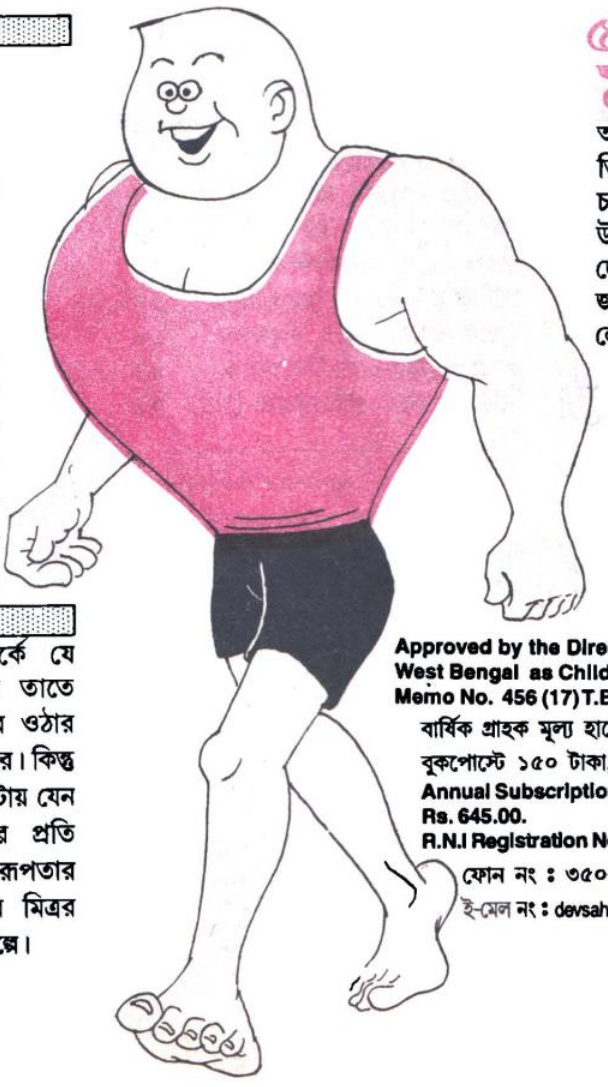

Approved by the Directorate of Public Instruction West Bengal as Children's Monthly Magazine Vide Memo No. 456 (17) T.B.C. (Dated 5-7-88)

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য হাতে নিলে ১১০ টাকা, ডাকে : বুকপোস্টে ১৫০ টাকা, রেজিস্ট্রি ডাকে ৩২৫ টাকা।

Annual Subscription : UK and USA—By Air Mail Rs. 645.00.

R.N.I Registration No. 2621/57

ফোন নং : ৩৫০-৪২৯৪, ৩৫০-৪২৯৫, ৩৫০-৭৮৮৭

ই-মেল নং : devsahitya@caltiger.com

মূল্য : দশ টাকা

বাকী সূচী

৬

নিতান্তই ছেলেমানুষ তাই কে বেশি ভালো সেই নিয়ে তুমুল ঝগড়া বাধল দুজনের মধ্যে। ঝগড়া থেকে ভয়ঙ্কর পরিণতি। সনাতন চক্রবর্তীর পৌরাণিক গল্প **হুহু আর হাহা**।

৬৮

বাগানে বৃষ্টির জমা জলে ঝপাৎ ঝপাৎ আওয়াজ হচ্ছে। বুদু ভাবে ছাদের জল পড়ছে। কিন্তু না, আওয়াজটা যেন অন্যরকম। বুদু বারান্দায় আসে.....কী দেখে, কী হয় তারপর তাই নিয়েই দীপ্তরূপ গঙ্গোপাধ্যায়ের **নিলয় স্যার**।

আরও গল্প

বজ্র আঁটুনি
—হীরেন চট্টোপাধ্যায় ১৭

কিছুতেই বলবে না
—নির্মলেন্দু গৌতম ৫৮

দুই বন্ধুর কাহিনী (অনুবাদ)
—সত্যপ্রিয় নন্দী ৩০

মণিরামের প্রেতাত্মা
—সতীশ বিশ্বাস ৬৬

কিচির মিচির আসর
—সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ৭০

ফিরে দেখা

ট্রাপিজের খেলা
—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ৩৭

পুরস্কৃত গল্প

সততা (প্রথম)
—মানিকলাল মজুমদার ৪৯

পরশমণি (দ্বিতীয়)
—শ্যামাশ্রী চৌধুরী ৫১

ফিচার

গল্প হলেও সত্যি—তড়িৎ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ২২

ম্যালেরিয়া ঠেকাতে নাইট্রিক অক্সাইড—সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৭

কেরিয়ার গাইড—ডি. এ. চন্দ্রণ ১৫

বিজ্ঞানের খবর—সন্দীপ সেন ৪০

আবিষ্কার—দীপক কুমার রায় ১৪

মজার খবর—বরুণ মজুমদার ১৬

জানা-অজানা—মহসীন মল্লিক ৬৪

বিচিত্র খবর—প্রবীরকুমার মৈত্র ৫৬

ক্রীড়াঙ্গন

খেলা—শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ৪১

উঠছে যারা—বীরু বসু ৪৬

শরীর গড়তে যোগ ও ব্যায়াম
—তুষার শীল ৪৭

কবিতা ও ছড়া

খুশির ছড়া
—উজ্জ্বল কুমার দাস ৫

ট্রামগাড়ি থাকবেই
—অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায় ৬৫

ওরা সবাই ব্যস্ত—অতীন বসু ৬৫

আমি ভয় পাইনি
—দীপঙ্কর বিশ্বাস ৬৫

বিভাগীয় লেখা

চিঠিপত্র ৩৬

মনের জানলা—জগদিন্দ্র মণ্ডল ৪৮

আমরা বলছি ২৬

দাদুমণির চিঠি ২৩

তোমাদের পাতা ২৪

মজার পাতা ৬২

ছবিতে গল্প

বাঁটুল দি গ্রেট
—নারায়ণ দেবনাথ ১

হাঁদা-ভোঁদা
—নারায়ণ দেবনাথ ২৮

প্রচ্ছদ ঃ খুনে বিজ্ঞানীর দ্বীপে
—নারায়ণ দেবনাথ

ঘোষণা

জানো কী! ৬১

কমলা বসু স্মৃতি-সাহিত্য প্রতিযোগিতা ৫০

খুশির ছড়া

উজ্জ্বল কুমার দাস

এই ছড়াটা ফুলের তো নয়
এই ছড়াটা পাখির,
এই ছড়াটা আড়ির তো নয়
এই ছড়াটা রাখির।

এই ছড়াতে খুশির হাওয়া
জানলা খোলা খুকুর,
এই ছড়াতে শিউলিতলায়
নাচতে এলো দুপুর।

এই ছড়াতে ছুটির বাঁশি
বাজিয়ে দিলে কারা,
বকুলতলায়, মাঠটা জুড়ে
খেলতে এলো যারা।

এই ছড়াটা ঝিকির মিকির
এই ছড়াটা খুশি,
খুশির ছড়া নিয়ে যাচ্ছে
মিষ্টি মেয়ে টুসি।

ছবি : সুফি

হুহু আর হাহা

সনাতন চক্রবর্তী

গন্ধর্ব কাদের বলে বোধহয় তোমাদের জানা আছে। ওরা স্বর্গের দেবতা না হলেও বলা যায় তাদেরই এক বিশেষ সম্প্রদায়। গানবাজনায় ওরা খুবই নিপুণ। স্বর্গের রাজসভায় গানবাজনার দরকার হলেই ওদের ডাক পড়তো, যেমন নাচের জন্য ডাকা হতো অপ্সরাদের।

একসময় এই গন্ধর্বসমাজে হুহু আর হাহা নামে দুই বন্ধু ছিল। আর পাঁচজন গন্ধর্বের মতো ওরাও ছিল গানবাজনায় খুবই পটু। তবে বয়স কম আর ছেলেমানুষ হলে যা হয়, দুজনের মধ্যে লেগে গেল একদিন তুমুল ঝগড়া। হাহা বলে, আমি তোর চেয়ে ঢের বড়ো গাইয়ে বুঝলি? হুহু ফুৎকারে তাকে উড়িয়ে দেয়। আরে থাম, আমি তোর চেয়ে অনেক ভালো গাই।

ঝগড়া থেকে হাতাহাতি। এ ওকে ঘুঁষি মেরে শুইয়ে দেয় তো ও একে লাথি মেরে করে ধরাশায়ী। এভাবে কিছুক্ষণ চললো। কোনো ফয়সালা না হতে এক বন্ধু শেষে গায়ের ধুলোটুলো ঝেড়ে আর একজনকে বললে, দ্যাখ এভাবে তো মীমাংসা হচ্ছে না। তারচেয়ে চল আমরা দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে যাই। উনিই ঠিক করে দেবেন আমাদের মধ্যে কে বড়ো? অপরজন এ প্রস্তাবে রাজী হলো।

দু'জনে দেবরাজের কাছে এসে সব বললে। দেবরাজ বললেন, বেশ গাও তোমরা শুনি। দু'জনে দুটি করে গান গাইলে। দেবরাজ পড়ে গেলেন মহা ফ্যাসাদে। দু'জনেই সমান গেয়েছে। কে ভালো কে মন্দ বোঝা যাচ্ছে না। তার ওপর দু'জনেই ছেলেমানুষ। একজনকে বড়ো বললে অপরের মনে দুঃখ দেওয়া হবে। সেটা করাও অনুচিত। মাথা চুলকে দেবরাজ তাই বললেন, দ্যাখো বাপু, গানবাজনার আমি তো তেমন কিছু বুঝি না। তোমরা বরং দেবল ঋষির কাছে যাও। উনি গানবাজনার মস্ত পণ্ডিত। উনিই ঠিক করে দেবেন দু'জনের মধ্যে কে বড়ো।

দুই বন্ধু দৌড়লো দেবল ঋষির কাছে। ঋষি তখন গভীর ধ্যানে মগ্ন। ওরা খুব ডাকাডাকি করলে। ঋষির ধ্যান তবু ভাঙলো না। তখন হাহা বললে, এক কাজ করা যাক হুহু। আয় আমরা গান শুরু করে দিই। উনি ঠিকই শুনতে পাবেন। হুহু রাজী হলো।

দুই বন্ধু বেশ কিছুক্ষণ ধরে প্রাণ খুলে গাইলে। ভাবলে এবার বোধহয় ঋষি হাঁ-হুঁ করবেন। কিন্তু কোথায় কি? ঋষি আগের মতোই নট নড়নচড়ন।

ছেলেমানুষ আর কতক্ষণ ধৈর্য রাখতে পারে! ধ্যাত্তেরি বলে দু'জনে ঋষির গায়ে মারলে জোর ঠেলা। চিৎকার করে বললে, ওহে ঋষিবর, বলি শুনতে-টুনতে পাচ্ছেন কিছু?

ঋষির ধ্যান ভেঙে গেল। কটমট করে তাকিয়ে দুই বন্ধুকে তিনি ভস্ম করে ফেলেন আর কি। ছেলেমানুষ দেখে খুব সামলে নিলেন। হুংকার দিয়ে বললেন, তোরা জোর করে আমার ধ্যান ভাঙালি। ছেলেমানুষ বলে খুব বেঁচে গেলি। তবে কিছু শাস্তি তোদের পেতেই হবে। সুখের দেবলোক ছেড়ে তোদের গিয়ে জন্মাতে হবে দুঃখের পৃথিবীতে।

দুই বন্ধুর এবার হুঁশ ফিরলো। ঋষির পা জড়িয়ে ধরে তারা কাঁদতে শুরু করে, অতবড়ো অভিশাপ দেবেন না আমাদের ঋষি। ওখানকার পরিবেশ শুনেছি ভীষণ দূষিত। জল মাটি আকাশ বাতাস সব জায়গা দূষণে ভরা। দেবতা হয়ে কি করে আমরা সেখানে বাস করবো? আপনার অভিশাপ ফিরিয়ে নিন।

ঋষি একটু নরম হন। বলেন, মুখ দিয়ে যখন বেরিয়ে গেছে আর ফেরানো যাবে না। তবে শীঘ্র যাতে তোরা মুক্তি পেয়ে আবার দেবলোকে ফিরে আসিস তার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। মহামুনি কশ্যপের ছেলে গরুড় যেদিন তোদের দু'জনকে একসঙ্গে খেয়ে নেবে সেদিন তোরা আবার স্বর্গে ফিরে আসবি।

দুই বন্ধু ঋষিকে প্রণাম করে চলে গেল।

ঋষির শাপে একজন গজ, অপরজন কচ্ছপ হয়ে পৃথিবীতে জন্ম নিল। হাহা গজ হয়ে শোণনদীর পাড়ে গভীর জঙ্গলে বাসা নিল আর কচ্ছপ হয়ে হুহু বাস করতে লাগলো ঐ নদীরই অতল কালো জলে। মর্ত্যে এসেও তাদের স্বভাব কিন্তু বদলালো না একটুও। আবার দুই বন্ধু আগের মতোই শুরু করলো লড়াই। গজরূপী হাহা যেই একদিন নদীতে জল খেতে এসেছে অমনি কচ্ছপবেশী হুহু ধরলে তার শুঁড় কামড়ে। গজও কম যায় না। তবে রে—বলে দু'পায়ের ফাঁকে ধরলে তাকে চেপে। শুরু হলো গজ-কচ্ছপের লড়াই। দিন যায় মাস যায়। মাসে মাসে যায় বছর। লড়াই আর তাদের থামে না। কখনও এ জেতে তো ওর হার, কখন ওর জিত তো এর হার।

এভাবে কিছুকাল গেল। একদিন হলো কি মহামুনি কশ্যপের ছেলে গরুড়ের পেল ভীষণ খিদে। এটা খায় ওটা খায় খিদে মেটে না কিছুতেই। মা বিনতা তো ভেবেই অস্থির। কী খেতে দেয় বাছাকে। শেষে নিরুপায় হয়ে সে কশ্যপ মুনির কাছে যায় ছেলের খিদে কি করে মিটবে তা জানতে।

মুনি শোণনদীর জলে গজকচ্ছপের কথা বলেন। ওদের খেয়ে নিলে এক্ষুণি ছেলের খিদে মিটে যাবে।

মায়ের মুখে তাই না শুনে গরুড় তো নিমেষে শোণনদীর পাড়ে। দুই বিশাল পর্বতের মতো গজকচ্ছপকে খুঁজে পেতে তার দেরি হলো না। ওষুধের বড়ির মতো টুপ করে সে তাদের গিলে নিলে। বাস্! হাহা-হুহুর মর্ত্যজীবনও শেষ। গন্ধর্ব হয়ে ফের তারা দেবলোকে চলে গেল। সেখানে গিয়ে তারা বারে বারে নাকে-কানে খৎ দেয়। বাবাঃ! আর কক্ষণো ঝগড়াঝাঁটি করছিনে।

সেদিন থেকে হাহা-হুহু দু'জনে হরিহর আত্মা।

ছবিঃ সুবল সরকার

তিতলিপুরের জঙ্গলে

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

সকালে ভৈরবের ডাকে ঘুম ভেঙেছিল। ঘড়ি দেখলাম, সাড়ে সাতটা বাজে। দরজা খোলা এবং ভৈরব চা এনেছে, এতেই বোঝা গেল কর্নেল যথারীতি প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছেন। বিছানায় বসে চায়ে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—কাল রাত্রে বাংলোয় চোর ঢুকেছিল নাকি?

ভৈরব হাসল।—ভিতরে ঢোকেনি স্যার। উঁকি দিচ্ছিল। ও দিকে ঝিলের মাথায় বাঁধ আছে। সেই পথে সে এসেছিল। মাধু দারোয়ানের চোখে পড়েছিল।

—তুমি বলছিলে এলাকায় চোরডাকাত নেই!

—ছিঁচকে চোর স্যার। মুখটা এক পলক দেখেছি। কেন যেন চেনাচেনা লাগল। তবে আশ্চর্য ব্যাপার স্যার, এই বাংলোয় কোনওদিন চোরের উপদ্রব হয়নি।

—কর্নেল সায়েব কোনদিকে গেছেন দেখেছ?

—না স্যার। এবেলা হাটু দারোয়ানের ডিউটি। সে জানে।

—আচ্ছা। ঠিক আছে।

ভৈরব সেলাম দিয়ে চলে গেল। বেডটি খেয়ে বাথরুমে গেলাম। দাড়ি কামিয়ে ফিটফাট হয়ে বারান্দায় বসলাম। আজ ঘন কুয়াশা। বিস্তীর্ণ জলাধার কুয়াশার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেছে। বারান্দায় বসে কুয়াশা দেখার মানে হয় না। বাংলোর সামনে পার্কিং জোনে আমার গাড়িটা দেখার ইচ্ছে হলো। কিন্তু সেখানে গিয়ে আমি চমকে উঠলাম। গাড়িটা নেই। হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। সেই সময় দারোয়ান গেটের পাশে তার ঘর থেকে কম্বলমুড়ি দিয়ে বেরিয়ে বলল—স্যার কি ওখানে কিছু খুঁজছেন?

বললাম—আমার গাড়িটা নেই।

—আপনার গাড়ি কর্নেলসায়েব নিয়ে গেছেন। আমাকে বলে গেছেন, আপনি খোঁজ করলে আমি যেন বলি।

স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল। ঘরে ফিরে গিয়ে ওয়ার্ডরোবের ভিতরে ঝোলানো প্যান্টটা দেখলাম। ওই প্যান্টের পকেটে চাবি ছিল। অতএব বৃদ্ধ ঘুঘুমশাই আমার পকেট মেরেছেন।

কিন্তু হঠাৎ ওঁর গাড়ির দরকার হলো

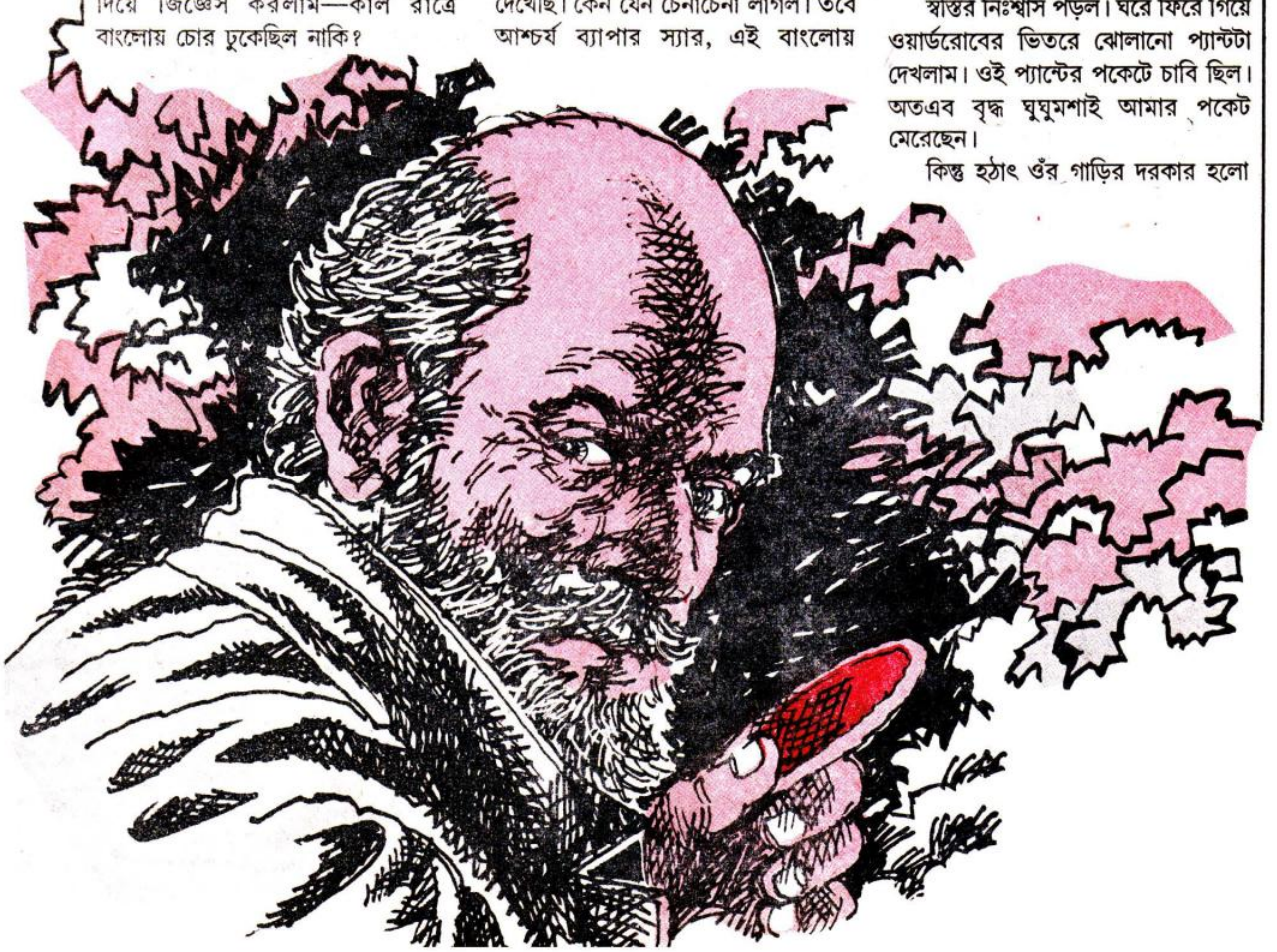

কেন? উনি না ফিরলে এ প্রশ্নের উত্তর পাব না.....।

কর্নেল ফিরলেন সাড়ে নটায়। গাড়ির শব্দ শুনে বারান্দায় বেরিয়েছিলাম। একটু পরে তাঁকে দেখতে পেলাম। তাঁর মুখে হাসি ঝলমল করছে। ততক্ষণে কুয়াশা খানিকটা পরিষ্কার হয়েছে। কাছে এসে কর্নেল যথারীতি সম্ভাষণ করলেন—মর্নিং জয়ন্ত! আশা করি সুনিদ্রা হয়েছে।

—মর্নিং বস। হাসতে হাসতে বললাম। —আপনি দুটো অপরাধ করেছেন। প্রথমটা পকেটমারি। দ্বিতীয়টা আমার গাড়ি চুরি। গাড়ি নেই দেখে আমি তো ভড়কে গিয়েছিলাম। রাত্রে আমাকে জানাননি আপন্যর গাড়ির দরকার আছে।

কর্নেল বারান্দায় বসে টুপি খুললেন। তারপর বাঁ হাতে প্রশস্ত টাকে হাত বুলিয়ে ডান হাতে আমার গাড়ির চাবির গোছা আমাকে দিলেন। মৃদু হেসে তিনি বললেন —তোমার গাড়ি চুরি করতে হয়েছিল, তার কারণ আছে। রাত্রে মনে মনে ঠিক করেছিলাম, কেল্লাবাড়ির জঙ্গলে সত্যি নীল সারসের একটা দল এসে জুটেছে কি না দেখতে যাব। কিন্তু রাত্রে চোর এসেছিল বাংলোয়। ভোরে বেরুতে গিয়ে উত্তরের পাঁচিলটা একবার দেখার ইচ্ছে হলো। কাঁটাতারের বেড়ায় কোনও ফাঁক আছে কি না। নেই। অথচ চোর এসেছিল! পাঁচিলের ধারে ঝাউ আর ক্যাকটাসের টব আছে। একটা করবী আছে। হঠাৎ চোখে পড়ল, একটা ভাঁজকরা কাগজ করবী গাছটার পিছনে কাঁটাতারে গোঁজা আছে। সেই কাগজটা শিশিরে ভিজে গেছে। বারান্দায় এসে সাবধানে খুলে দেখলাম, একটা হুমকি। এতে আমি ভয় পাইনি। কিন্তু এখান থেকে নির্বিঘ্নে কলকাতা ফিরতে হবে। কাজেই তোমার গাড়ি নিয়ে চন্দ্রপুর থানায় গিয়েছিলাম। ও. সি. মিঃ রাজেন হাটির সাহায্য দরকার হবে।

নরুঠাকুর কফি আর স্ন্যাক্সের ট্রে রেখে গেল টেবিলে। তারপর বললাম—চিঠিটা দেখতে পারি?

কর্নেল জ্যাকেটের ভিতর থেকে একটা ভাঁজকরা কাগজ বের করলেন। কাগজটা ভিজে ছিল, তা স্পষ্ট। সাবধানে খুলে দেখলাম, লাল ডটপেনের লেখাগুলো ভিজে কিছুটা অস্পষ্ট হয়ে গেছে। তবু বোঝা যাচ্ছিল।

"পেতলের নলটা যেখানে ছিল, সেখানে আজ সকালে রেখে না এলে খুলি ছেঁদা হয়ে যাবে। তুই কি ভেবেছিস তোর পরিচয় আমি পাইনি? কলকাতায় আমার লোক আছে। বুড়ো টিকটিকিকে লেজসুদ্ধু হাপিজ করে দেব।"

কর্নেলকে চিঠিটা আবার তেমনই ভাঁজ করে ফেরত দিয়ে বললাম—লেজ সম্ভবত আমি।

কর্নেল তুম্বো মুখে বললেন—তুমি তো জানো জয়ন্ত! কেউ আমাকে টিকটিকি বললে আমার টাক থেকে গরম বাষ্প বেরিয়ে যায়। ওটা অশ্লীল শব্দ। কারণ ডিটেকটিভ থেকে বাংলায় টিকটিকি শব্দটা এসেছে! টিকটিকি আমি? প্রকৃতিবিজ্ঞানী কর্নেল নীলাদ্রি সরকার টিকটিকি?

কর্নেলের গাম্ভীর্য আর ক্ষোভ দেখে তাঁকে নিয়ে রসিকতার সাহস পেলাম না। কফি দ্রুত শেষ করে উনি চুরুট ধরালেন। তারপর হেসে উঠলেন। বললাম—হাসছেন যে! হঠাৎ গরম বাষ্পে বরফ পড়া শুরু হলো নাকি?

কর্নেল কিটব্যাগ ঘরে রেখে এসে বারান্দায় বসলেন। তারপর জ্যাকেটের ভিতর থেকে একটা ফোটো বের করে বললেন—কাল সন্ধ্যায় আমার ক্যামেরা আমাকে বঞ্চিত করেনি। ছবিটার দুটো প্রিন্ট করেছিলাম। অত কিছু ভেবে করিনি। মনে হয়েছিল, ভৈরবকে দিয়ে লোক দুটোকে শনাক্ত করাব। ভৈরব চন্দ্রপুরের লোক। আর দরকার হলে পুলিশকে দিয়ে যাব।

ওঁর হাত থেকে ছবিটা নিয়ে দেখলাম, পাথরের স্ল্যাবটা দেখা না গেলেও আঁতকে ওঠা দুটো লোকের ছবি স্পষ্ট উঠেছে। একজন সবে ঘুরতে যাচ্ছে। অন্যজন ফুটবল খেলোয়াড়ের মতো শূন্যে লাফ দিয়েছে। ছবিটা দেখে হাসি এল। বললাম—চন্দ্রপুর থানার বড়বাবুকে ছবির অন্য কপিটা দিয়ে এসেছেন মনে হচ্ছে!

—তুমি বুদ্ধিমান। যে শূন্যে লাফ দিয়েছে, তার নাম পঞ্চানন দাশ। ডাকনাম পাঁচু। অন্যজন কালোবরণ খটিক। ডাকনাম 'গলাকাটা' কেলো। দাগি ডাকাত। পুলিশ ওদের খুঁজে পাচ্ছে না। এবার খুঁজে পাওয়ার চান্স আছে।

—কী ভাবে?

—জাহাজিবাবু ওদের কেল্লাবাড়ির জঙ্গলে ওত পাততে পাঠাবে। আমি

সুনির্মল বসুর জন্মশতবর্ষে
দেব সাহিত্য কুটীরের শ্রদ্ধার্ঘ্য

সুনির্মল বসু সম্পাদিত
পূজাবার্ষিকী
ঝলমল
দাম ঃ ৫৫ টাকা মাত্র

লিখেছেন
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
কালিদাস রায়
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
কামিনী রায়
সুবিনয় রায় চৌধুরী
মণীন্দ্রলাল বসু
অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত
সুখলতা রাও
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
নরেন্দ্র দেব
কুমুদরঞ্জন মল্লিক
প্রেমেন্দ্র মিত্র
মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়
জলধর সেন
যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
মৈত্রেয়ী দেবী
কাজী নজরুল ইসলাম
রাধারানী দেবী
দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার
হেমেন্দ্রলাল রায়
প্রবোধ কুমার সান্যাল
হেমেন্দ্র কুমার রায়
ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য
মন্মথ রায়
সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
বুদ্ধদেব বসু
এবং আরও অনেকে

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

পেতলের নলটা যথাস্থানে রেখে আসব!

—কী আশ্চর্য! কর্নেল নীলাদ্রি সরকার কোন এক জাহাজিবাবুর হুমকিতে ভয় পেয়ে ওটা ফেরত দিতে যাবেন—এটা কল্পনা করা যায় না।

কর্নেল চুরুটের একরাশ ধোঁয়ার মধ্যে বললেন—হ্যাঁ। রেখে আসব। তবে ভয় পেয়ে নয়। লোক দুটোকে ফাঁদে ফেলার জন্য। পুলিশ উল্টোদিক থেকে জঙ্গলে ঢুকে কাছাকাছি লুকিয়ে থাকবে। না—থাকবে না। এখনই তারা লুকিয়ে আছে। তোমার গাড়িতে একজন সাবইন্সপেক্টর আর দু'জন ভোজপুরি কনস্টেবলকে এনে কেল্লাবাড়ির জঙ্গলের কাছে নামিয়ে দিয়ে এলাম। কাজেই ব্রেকফাস্ট করে নিয়ে শীগগির বেরুতে হবে।

দশটা বাজে প্রায়। নরুঠাকুর ব্রেকফাস্ট দিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে দরজায় তালা এঁটে আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম। কর্নেলের পিঠে কিটব্যাগটা আঁটা ছিল। গলা থেকে বাইনোকুলার আর ক্যামেরা ঝুলছিল। প্রজাপতিধরা জালের স্টিকটা পিঠের কিটব্যাগের কোনা দিয়ে বেরিয়ে ছিল।

রমেনবাবু সাইকেলে চেপে সবে ফিরছিলেন। নমস্কার করে তিনি বললেন—জেলেদের কাছে টাটকা পাবদা মাছ পেয়েছি কর্নেলসায়েব। যেন শীগগির ফিরে আসবেন।

কর্নেল বললেন—সুখবর পেলাম যাত্রার সময়। তা হলে আজ নীল সারসের দেখা পাবই.....

ডাইনে কেল্লাবাড়ির জঙ্গল আর বাঁদিকে তিতলিপুর আবছা কুয়াশায় তখনও ঢাকা। ঝিলের ধারে ঘাসে শিশির তখনও শুকোয়নি। আমরা কালকের মতো সাবধানে পা ফেলে জঙ্গলে ঢুকলাম। ধ্বংসস্তূপ আর ঘন ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে কিছুটা এগিয়ে কর্নেল হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। তাঁর চোখে বাইনোকুলার। নব ঘুরিয়ে দূরত্ব অ্যাডজাস্ট করে নিয়ে চাপা স্বরে বললেন—জয়ন্ত! তুমি ওই লাইমকংক্রিটের ওপর বসে থাকো। আমি শীগগির ফিরে আসছি।

বলে তিনি আমাকে অবাক করে ডানদিকে অদৃশ্য হলেন। অস্বস্তি হচ্ছিল। লাইমকংক্রিটের একটা চাঙড়ে বসে আমি রিভলভারটা জ্যাকেটের পকেট থেকে বের করলাম। কর্নেলের পাগলামি মাঝেমাঝে অসহ্য লাগে। বহুবার দেখেছি, এইভাবে আমাকে প্রতীক্ষায় রেখে উনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোথায় কোনও বিরল প্রজাতির পাখির পিছনে ছোটাছুটি করে বেড়ান। কিন্তু এখন তো তেমন সময় নয়। বদমাশ দুটোকে ফাঁদে ফেলার উদ্দেশ্যেই আমরা বেরিয়েছি।

আমার বিরক্তি পনের মিনিটের মধ্যে কেটে গেল। একটা ঝোপের ফাঁকে কর্নেলের টুপি দেখতে পেলাম। অমনি অস্ত্রটা লুকিয়ে রাখলাম। তিনি কাছে এসে আমার একটা হাত চেপে ধরে চাপা উল্লাসে বললেন—পাবদা মাছের খবরটা সত্যি সুখবর ডার্লিং। ওদিকে একটা উঁচু দেওয়াল দাঁড়িয়ে আছে। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম শকুন। তারপর দেখলাম, তিনজোড়া নীল সারস দেওয়ালের ওপর বসে রোদ পোহাচ্ছে। ক্যামেরায় টেলিলেন্স ফিট করে চারটে ছবি তুলেছি। ওঃ! আজকের মতো শুভদিন জীবনে কখনও আসেনি। চিয়ার আপ জয়ন্ত! কুইক মার্চ। তবে নিঃশব্দে।

আমাকে ভাঙা দেউড়ির ওপাশে অপেক্ষা করতে বলে কর্নেল গুঁড়ি মেরে এগিয়ে গেলেন। কাল শেষ বেলায় ঘন ছায়া এবং তারপর দ্রুত আঁধার এসে পড়ায় কেল্লাবাড়ির জঙ্গল পরিষ্কার দেখতে পাইনি। এখন পাচ্ছিলাম। মিনিট দশেক পরে তিনি একটা ঝোপের আড়াল থেকে ইশারায় আমাকে ডাকলেন। কাছে গেলে চাপা স্বরে বললেন—ফায়ার আর্মস হাতে নাও। কিন্তু সাবধান! গুলি ছুঁড়ো না। এখন গুলি ছোঁড়ার দরকার হবে না।

তারপর ঝোপের পাশ দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম, সেই লোক দুটো এদিক-ওদিকে তাকাতে তাকাতে এগিয়ে আসছে। তারপর দুজন এককোণে দাঁড়িয়ে গেল। একজন বলল—তুমি গিয়ে মালটা নিয়ে এস। আমি 'মেশিন' হাতে পাহারা দিচ্ছি। বুড়ো মাইরি এমন ভয় পেয়েছে যে—

তারপরই দেখলাম, বাঁদিক, ডানদিক এবং সামনের দিক থেকে একজন পুলিশ অফিসার আর দুজন দৈত্যাকৃতি কনস্টেবল বেরিয়ে এল। পুলিশ অফিসার রিভলভার তাক করে গর্জালেন—হাত উঠাও! পিস্তলসুদ্ধু একজোড়া হাত উপরে উঠল। দ্বিতীয় জন পালাতে যাচ্ছিল। ভোজপুরী কনস্টেবলের ছোট্ট লাঠি তার এক হাঁটুর পেছনে গিয়ে ঘা মারতেই সে 'বাপ রে' বলে পড়ে গেল। পুলিশ ইন্সপেক্টরের হুকুমে অন্য ভোজপুরী দৈত্যটি পিস্তল কেড়ে নিয়ে তার গলার কাছে সোয়েটারের একটা অংশ খামচে ধরে পিঠে লাঠির গুঁতো মারল। সে-ও 'বাপ রে' বলে ককিয়ে উঠল। তার সঙ্গী ততক্ষণে অন্য ভোজপুরী দৈত্যের কবলে বেড়ালছানার মতো মিঁউ মিঁউ করছে।

কর্নেল আমাকে ইশারা করে নিঃশব্দে কেটে পড়লেন। কেল্লার জঙ্গল পেরিয়ে ঝিলের ধারে এসে বললাম—একেই বলে 'ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখনি'!

কর্নেল হাসলেন।—দোমোহানির বিখ্যাত পাবদা মাছের ঝোল খাব এবেলা। কী সৌভাগ্য!

—কিন্তু পেতলের নলটা যে পড়ে রইল।

—নলটা এস আই রথীশ চক্রবর্তী নিয়ে যাবেন। ওটা শুধু নল। ভিতরের জিনিস আমার কাছে আছে। শুধু নল নিয়ে পুলিশ মাথা ঘামাক। চলো! আমরা এবেলা ড্যামের জলে রোয়িং করি।

—কী সর্বনাশ! এখন সবে বাতাস উঠেছে। একটু পরে জলাধার সমুদ্র হয়ে উঠবে যে!

—ওঃ জয়ন্ত! তুমি কলকাতার রোয়িং ক্লাবের মেম্বার না? তা ছাড়া তুমি সেবার প্রশান্ত মহাসাগরে একজনের সঙ্গে বোটে চেপে কিয়োতো দ্বীপে গিয়ে উঠেছিলে। আমি আর্মি হেলিকপ্টারে গিয়ে তোমাকে উদ্ধার করেছিলাম। সেই তুমি একরত্তি দোমোহানিকে ভয় পাচ্ছ?

—সেটা ছিল প্রাণের দায়ে। এটা তো নেহাত শখে!

—নেহাত শখ নয় জয়ন্ত! ড্যামের পূর্ব দিকটায় কয়েকটা জলটুঙ্গি আছে। সেখানে সেক্রেটারি বার্ড অর্থাৎ কেরানি পাখির থাকার সম্ভাবনা আছে। তুমি ছবিতে এই পাখি দেখেছ। কিন্তু কানে কলমগোঁজা কেরানিবাবুদের মতো লম্বাঠেঙো এই পাখি জ্যান্ত দেখনি।

আমরা পিচরাস্তায় উঠেছি, এমন সময় দেখলাম বাংলোর 'কুক' নরুঠাকুর বাংলো থেকে একটা সাইকেলে চেপে আসছে। আমাদের কাছাকাছি হলে কর্নেল বললেন—ঠাকুরমশাই কি পাবদা মাছের জন্য মশলা কিনতে যাচ্ছ?

নরুঠাকুর সাইকেল থামিয়ে এক পা মাটিতে রেখে বলল—সাংঘাতিক খবর

স্যার!

তার মুখচোখে আতঙ্কের ছাপ লক্ষ্য করলাম। কর্নেল বললেন—কী হয়েছে নরেন?

—দীপনারায়ণদাকে গতরাতে কে খুন করেছে। ওঁর বোন সুনয়নী সম্পর্কে আমার দিদি হয়। বড়দি বলে তাকে ডাকি। বড়দি একটা লোক পাঠিয়ে এইমাত্র খবর দিল। শুনে আমার হাত-পা কাঁপছে স্যার! হাজার হলেও রক্তের সম্পর্ক। কিছু পারি না-পারি, একবার গিয়ে বড়দির পাশে দাঁড়ানো উচিত।

বলেই সে সাইকেল চালিয়ে চলে গেল। কর্নেল নিষ্পলক চোখে তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তিনি জোরে শ্বাস ছেড়ে বললেন—জয়ন্ত! এই আমার বরাত। আর কী বলব? চলো। আগে বাংলোয় ফেরা যাক।

যেতে যেতে বললাম—ভৈরব আমাকে বলছিল যখনই জাহাজিবাবু শম্ভু চৌধুরি বিদেশ থেকে বাড়ি ফিরে আসে, তখনই নাকি একটা করে লাশ পড়ে। সব লাশের মাথার পিছনে নাকি গুলির চিহ্ন খুঁজে পায় পুলিশ। ভৈরব ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছে বলল। পুলিশের মাথায় ব্যাপারটা কেন আসে না বলে সে দুঃখ করছিল।

কর্নেল হনহন করে হাঁটছিলেন। ওঁর নাগাল পেতে আমাকে প্রায় 'জগিং' করতে হচ্ছিল। সামরিক জীবনের অনেক অভ্যাস আমার বৃদ্ধ বন্ধুর জীবনে এখনও থেকে গেছে। বহুবার এটা লক্ষ্য করেছি। তাই আর অবাক হই না।

গেটের একটা অংশ খুলে দিয়ে দারোয়ান সেলাম দিল। ভৈরব রমেনবাবুর সঙ্গে লনে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত ভাবে কথা বলছিল। আমরা ভিতরে গেলে ভৈরব আমাকে বলল—যা বলছিলাম, তা-ই ঘটে গেল স্যার!

রমেনবাবু বললেন—তিতলিপুরের বড়বাবুর ভাগ্যে এমন একটা কিছু ঘটবে, গ্রামের লোকেরা সবাই জানে। হাড়বজ্জাত লোক। জমিজমা সম্পত্তি প্রায় সবই কবে বেচে দিয়েছিল। তার বোন বিধবা হয়ে বাবার বাড়ি আশ্রয় নিয়েছিল। বাকি যেটুকু সম্পত্তি ছিল ওই মহিলাই দু'হাতে আগলে রেখেছিল। বড়বাবু বোনকে সমীহ করে চলত।

ভৈরব বলল—ম্যানেজারবাবুকে বলছিলাম, এ কাজ জাহাজিবাবুর।

—ছাড়ো! আমরা ওসব সাতে-পাঁচে নেই। বড়বাবুর বোন সত্যিকার রায়বাঘিনী। সে যা করার করবে। বলে রমেনবাবু কর্নেলকে অনুসরণ করলেন।—নরেনকে যেতে দিতে হলো। জ্ঞাতি বলে কথা। কর্নেল-সায়েবদের পাবদা মাছ খাওয়ানোর জন্য আমি আছি। একবেলা আমার হাতের রান্না খেয়ে দেখুন।

আমাদের রুমের সামনে গিয়ে কর্নেল বললেন—আপনি যখন রাঁধতে পারেন, তখন কফিও তৈরি করতে পারেন। তাই না?

রমেনবাবু সহাস্যে বললেন—এখনই কফি করে আনছি স্যার!.....

তিনি দ্রুত চলে গেলেন। আমার মনে হলো, কোনও কারণে রমেনবাবু দীপনারায়ণবাবুকে পছন্দ করতেন না। গ্রাম্য দলাদলির ব্যাপারও থাকতে পারে।

কর্নেল দরজার তালা খুলে ঘরে ঢুকলেন। আমি দক্ষিণের বারান্দায় দরজার পাশে বেতের চেয়ারে বসলাম। জলাধারের কুয়াশা দিগন্তে সরে গেছে। আকাশ আর জল একাকার হয়ে আছে। একটা জেলেডিঙি কালো হয়ে ভেসে আছে।

কর্নেল বাইরে এসে বসলেন। বললেন—নীল সারসের ছবি তুলতে এসেছিলাম। ছবি তুলেছি। ভেবেছিলাম লাঞ্চ খেয়েই কলকাতা ফিরব। কিন্তু—

উনি চুপ করলে বললাম—কিন্তু কী?

—আমার সামনে একটা লাশ।

—কেউ তো আপনার কাছে এসে অনুরোধ করেনি, এই হত্যারহস্যের সমাধান করুন!

—জয়ন্ত! আমার ক্যামেরা বলছে, শম্ভু চৌধুরি আর দীপনারায়ণ রায় নিজেদের ছবিকে অত ভয় পেয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন কেন? ওঁরা দুজনেই চাননি ওঁরা ছবিতে থাকুন। কথাটা শুনতে তোমার হেঁয়ালি মনে হবে। কিন্তু একটু ভাবলেই দেখবে, ওঁরা চাননি কেউ ওঁদের ছবি তুলুক।

—ও. সি. রাজেন্দ্র হাটি জাহাজিবাবু সম্পর্কে কী বললেন?

—এই এলাকার সীমান্তে চোরাচালানের সঙ্গে জাহাজিবাবুর যোগাযোগ আছে বলে তাঁরা জানেন। কিন্তু প্রমাণ পাননি। তাছাড়া জাহাজিবাবু সারা বছর এখানে থাকেনও না। কলকাতা পুলিশের সঙ্গে চন্দ্রপুর থানা এবার যোগাযোগ করবে। শম্ভু চৌধুরি কোথায় থাকে, কী করে ইত্যাদি খবর জানতে চাইবে। জাহাজে আর চাকরি করে না সে, তা তার বয়স থেকে বলা যায়।

—কিন্তু প্রাক্তন জাহাজি হিসেবে খিদিরপুর ডকের চোরাকারবারি দলের সঙ্গে তার যোগাযোগ থাকতে পারে।

—তা পারে। কিন্তু ব্রোঞ্জের ফলক আর কিউনিফর্ম লিপিভর্তি পার্চমেন্ট—নাঃ জয়ন্ত! আমার সামনে একটা গভীর রহস্য এসে দাঁড়িয়েছে। দীপনারায়ণ রায়ের হত্যাকাণ্ডের চেয়ে এই রহস্য জটিল।

ভৈরব কফির ট্রে নিয়ে এল। সে কিছু বলার জন্য ইতস্তত করছিল। কিন্তু কর্নেল তাকে বললেন—ঠিক আছে ভৈরব। দরকার হলে তোমাকে ডাকব।

ভৈরব চলে গেল। বললাম—আপনার রোয়িং প্রোগ্রামের কী হলো?

কর্নেল আস্তে বললেন—থাক। সারাজীবন নরহত্যা দেখে আসছি। আমার সামরিক জীবনের কথাও চিন্তা করো। কিন্তু আশ্চর্য জয়ন্ত! এখনও নরহত্যা আমাকে বিব্রত করে।

—তা হলে চলুন। তিতলিপুরের জমিদারবাড়ি গিয়ে ব্যাপারটা দেখে আসা যাক। আমিও একটা হাতে-গরম খবর পেয়ে যাব। দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার জন্য অন্তত একটা কিছু নিয়ে যাই।

কর্নেল একটু হেসে বললেন—হ্যাঁ। খালি হাতে তোমার কলকাতা ফেরার চেয়ে এটা মন্দ কী! তা ছাড়া প্রাচীন মিশরের ফলক আর কোনো দেশের পার্চমেন্টে লেখা কিউনিফর্ম লিপির সঙ্গে তিতলিপুরের এই হত্যাকাণ্ডের যোগসূত্র তো স্পষ্ট।

রমেনবাবু কিচেনে ছিলেন। ভৈরব তাঁকে সাহায্য করছিল। কর্নেল শুধু বলে এলেন—একটু বেরুচ্ছি।

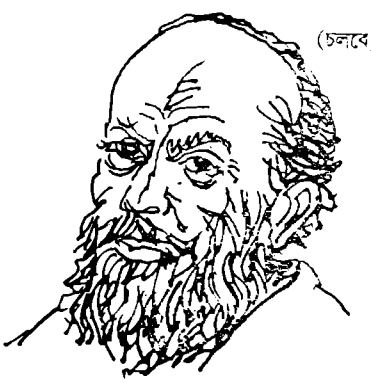

(চলবে)

আদিনাথবাবুর বিভ্রম

কুমার মিত্র

বইটার পৃষ্ঠায় চোখ বুলোতে বুলোতে ভুরু কুঁচকে উঠল আদিনাথবাবুর। কী বিশ্রী অজ্ঞতা! লেখকের নামটা যেমন ভারিক্কি গোছের বিদ্যের বহরও তেমনি। থার্ড কভারের লেখক-পরিচিতি থেকে জানা যাচ্ছে ভদ্রলোক অনেকগুলি উঁচুদরের স্বদেশী-বিদেশী ডিগ্রির অধিকারী। অ্যানথ্রোপলজিতে কেমব্রিজ থেকে ডক্টরেট করেছেন। অথচ ভারতের জনজাতি সম্পর্কে বিশেষ খোঁজখবর রাখেন না। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তো নেই-ই। প্রকাশকের ঠিকানায় একটা প্রতিবাদপত্র পাঠানো দরকার। কাগজ-কলম নিয়ে বসে গেলেন আদিনাথবাবু।

এদেশের তফশিলি এবং উপজাতি সম্পর্কে আদিনাথ বসু একজন বিশেষজ্ঞ। কেন্দ্রীয় আদিবাসী কল্যাণ দপ্তরের অনেক হোমরাচোমরা তাঁর কাছে পরামর্শ নিতে আসেন। তা না হবেই বা কেন? উঁচুদরের ডিগ্রি তাঁর কিছু কম নেই, সেই সঙ্গে আছে প্রচুর গবেষণার অভিজ্ঞতা। ন্যাশন্যাল জিওগ্রাফিকের মতো ইজ্জতদার পত্রিকা তাঁর বেশ কিছু লেখা আগ্রহ সহকারে ছেপেছে এবং সেগুলি উচ্চ-প্রশংসিতও হয়েছে। নানা আদিবাসী উন্নয়ন প্রকল্পের সঙ্গেও তিনি যুক্ত। অধ্যাপনা করেন একটি নামী বিশ্ববিদ্যালয়ে। নৃতত্ত্ব নিয়ে কারো ভুল ধরার যোগ্যতা এবং সাহস দুই-ই তাঁর আছে।

আদিনাথবাবুর ধারণা নিজের জীবনের সঙ্গে জীবনদর্শনকে চমৎকারভাবে মিলিয়ে দিতে পেরেছেন। বিদ্যার সঙ্গে বাস্তবকে। অন্তত সে চেষ্টা যে তিনি করে থাকেন তাতে সন্দেহ নেই। বাড়ির নাম রেখেছেন 'আরণ্যক'। এই নামের প্রেরণা বিভূতিভূষণের বহুখ্যাত উপন্যাসটি নয়, এ নাম এসেছে তাঁর জীবনদৃষ্টি থেকে। বাড়ির পরিবেশের মধ্যে অরণ্যলোকের ছায়া। চারদিকে প্রচুর গাছপালা। শাল, সেগুন, শিশু, আকাশমণি। মউল দুধকি করমের মতো গাছও আছে যা কেবল বনজঙ্গলেই চোখে পড়ে। অর্কিড আর ক্যাকটাসের জন্যে একটা গ্রিন হাউস পর্যন্ত তৈরি করেছেন। বাড়ি ও বাগান দেখাশুনোর জন্যে রেখেছেন এক বুড়োগোছের সাঁওতালকে। নাম অনাদি মুর্মু। তার একটি বছর বারোর ছেলে আছে। তার নাম চারু। বাপব্যাটা বাগানের একধারে একটা চালার মধ্যে থাকে। ইটের দেয়াল, ওপরে টালি চাপানো। ইলেকট্রিকের বন্দোবস্তও আছে। মোটকথা, ওদের সুখসুবিধের দিকে আদিনাথবাবুর প্রখর দৃষ্টি। এ নিয়ে তাঁর মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার আছে। ক্লাশের মধ্যে, ক্লাশের বাইরে, তাঁর লেখায় এবং বিভিন্ন আলোচনাচক্রে তিনি বলে থাকেন—মানুষকে ঘৃণা করার মতো পাপ আর নেই। ছোট-বড়, কালো-সাদা, সভ্য-বন্য এসব ভেদাভেদ কৃত্রিম। এ ধরনের কথা তাঁর স্ত্রী বা ছেলেও তাঁর মুখে অনেকবার শুনেছে।

আদিনাথবাবুর একটিমাত্রই সন্তান। তথাগত। হাওড়ার রামকৃষ্ণ শিক্ষালয়ে ক্লাশ সিক্সের ছাত্র। বেশ মেধাবী এবং পাঁচরকম বই পড়তে ভালবাসে। স্বভাবটিও ভারি মিষ্টি। অনাদির ছেলে চারুর সঙ্গে দারুণ ভাব। আদিনাথ ওদের এনেছিলেন ঝাড়গ্রাম থেকে। লোধাদের ওপর একটা সমীক্ষা চালাতে গিয়ে ঝাড়গ্রাম গিয়েছিলেন। অনাদি সেইসময় তাঁর ফাইফরমাস খাটত। লোকটি পরিশ্রমী ও বিশ্বস্ত। আসার সময় বাড়ির দরকারের কথা ভেবে অনাদিকে নিয়ে চলে আসেন। সঙ্গে আসে চারু। ত্রিসংসারে ওই ছেলে ছাড়া আর কেউ নেই অনাদির। চারুকে আদিনাথ ভর্তি করে দিয়েছেন তথাগতদের স্কুলেই। ক্লাশ ফাইভের ছাত্র। পড়াশোনার দিকে বেশ ঝোঁক। মাথাও ভাল। ওর জন্যে আলাদা শিক্ষকও রেখেছেন আদিনাথ। এসব খবর যাঁরা রাখেন তাঁরা আদিনাথের উদারতার যথেষ্ট প্রশংসা করে থাকেন। সে প্রশংসা প্রাপ্য বলেই মনে করেন আদিনাথবাবু। না করবেনই বা কেন? কই, কেউ বলুক তো দেখি সাঁওতাল বলে অনাদি কিংবা চারুকে তিনি অবহেলা করেন? অনাদির সঙ্গে ব্যবহার করেন চাকরের মতো? চারুকে মিশতে দেন না তথাগতর সঙ্গে? না, কেউ এসব বলতে পারবে না। আরে বাবা, কাগজে-কলমে বড় বড় কথার ফুলঝুরি ছোটালেই তো হয় না, কাজে সেটা করে দেখাতে হয়।

তথাগতর মা তাঁর এতখানি মহত্ত্ব বুঝতে চান না। প্রায়ই নালিশ করেন চারুকে নিয়ে। চারু সব ঘরে অবাধে ঢোকে, ছাদে ওঠে, ছেলের সঙ্গে ঘুড়ি ওড়ায়, ছেলের পড়ার টেবিলে এসে বসে—এতটা বাড়াবাড়ি তাঁর পছন্দ নয়। আদিনাথবাবু উদার হাসি হেসে ব্যাপারটাকে হাল্কা করে দেবার চেষ্টা করেন, চারু ছেলেমানুষ। ও কি আর তোমার ছেলের সঙ্গে নিজের তফাৎ বোঝে? বোঝে না। এসব একটু মানিয়ে নিতে হয়। বড় হলে চারু নিজে থেকেই বুঝতে শিখবে।

তথাগতর মা বলেন, তোমার সব-তাতেই বাড়াবাড়ি। হাজার হোক, ওরা জংলি মানুষ। সভ্য মানুষের সঙ্গে অনেক তফাৎ।

—কিছু না, কিছু না। মানুষ মানুষই।

কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই আদিনাথবাবুর মনে হতে থাকে ব্যাপারটা সত্যিই বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। নাই পেয়ে পেয়ে চারু ছেলেটা মাথায় উঠে যাচ্ছে। কোনো সীমারেখাই মানে না। তথাগতকে না পেলে ওর এক মুহূর্ত চলে না। অবশ্য তথাগতরও তাই। তথাগত বন্ধুর বাড়ি গেলে চারু সঙ্গে যেতে চাইবে কিংবা তথাগতই ওকে নিয়ে যাবে। তথাগত আইসক্রিম খেতে চাইলে চারুকেও না দিয়ে উপায় নেই। তথাগতর তুলনায় পুজোর পোশাক চারুর একটু কমদামী হলে ফ্যাসাদ বেধে যাবে। এতে তথাগতরও আপত্তি, চারুরও মুখ ভার। বাড়ির বাগানে একদিন খেলতে খেলতে তথাগতকে এমন ধাক্কা মেরেছিল যে কপাল ফেটে রক্তারক্তি। ডাক্তারখানায় পর্যন্ত নিয়ে যেতে হয়েছিল। আদিনাথ সেদিন রাগ সামলাতে পারেননি। কড়া গলায় চারুকে ধমক দিয়েছিলেন। আর তথাগতর মা তো বিরক্তি গোপন করার কোনো চেষ্টাই করেননি। মুখঝামটা দিয়ে বলেছিলেন, অন্য লোক দেখ, এ একেবারে অসহ্য।

আদিনাথবাবু অবশ্য অতটা নিষ্ঠুর হতে পারেননি।

তবে একটা জিনিস তাঁকে বেশ কিছুদিন ধরে ভাবাচ্ছে। তাঁর কেমন মনে হচ্ছে চারু ছেলেটা তথাগতর চেয়েও মেধাবী। একটু গাইডেন্স পেলে তথাগতকে ও পিছনে ফেলে দেবে। তাঁর ধারণাটা যে মিথ্যে নয় তা পরিষ্কার করে দিয়ে গেলেন ডক্টর রক্ষিত।

ডক্টর দেবব্রত রক্ষিত। আমেরিকার বার্কেলে ইউনিভার্সিটিতে ইন্ডোলজির প্রফেসর। প্রেসিডেন্সিতে পড়ার সময় আদিনাথের সহপাঠী ছিলেন। অবশ্য পাঠ্যবিষয় তাঁদের এক ছিল না। একই কলেজের ছাত্র হিসেবে ঘনিষ্ঠতা। ক'দিনের জন্যে দেশ ঘুরতে এসে আদিনাথবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। ভারি খোলামেলা আর স্নেহশীল মানুষ। বাচ্চাদের সঙ্গে আলাপ জমাতে ওস্তাদ। তথাগত আর চারুর সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে গল্পগুজব করলেন। সারাদিন কাটিয়ে সন্ধ্যের মুখে ওঠার সময় বললেন, এই ট্রাইবাল ছেলেটিকে কোত্থেকে যোগাড় করলে হে আদিনাথ?

যোগাড় হবার বৃত্তান্ত শুনে বললেন, অনেক দিন আছে এখানে? সেইরকমই মনে হচ্ছিল। চমৎকার বাংলা বলে গায়ের রঙ আর চোখমুখ ওর পরিচয় না ধরিয়ে দিলে বাঙালি বলেই মনে হতো একটা জিনিস লক্ষ্য করেছ?

আদিনাথবাবু জিগ্যেস করলেন, কি বল তো?

—ছেলেটি কিন্তু খুবই ব্রাইট এবং প্রমিসিং। একটু কেয়ার নিলে অনেকদূর যাবে।

—আমার ছেলেটিকে কেমন দেখলে?

—সেও বেশ শার্প। কিন্তু এই আদিবাসী ছেলেটির চমৎকার রিফ্লেক্স। প্রশ্ন মুখ থেকে খসাবার আগেই বুঝে নেয় কি বলতে চাইছি। কালচারাল হেরিটেজ নেই অথচ এরকম ইনটেলিজেন্স—ব্যাপারটা খুবই আশ্চর্যের তোমার যা সাবজেক্ট তাতে ও গবেষণার আওতায় আসতেই পারে।

ডক্টর রক্ষিত সোজা-সরল মনে চারু সম্পর্কে যে কমপ্লিমেন্ট দিয়ে গেলেন তাতে গর্বে আদিনাথবাবুর বুক ভরে ওঠার কথা। কেননা চারু তো তাঁরই আবিষ্কার। চারুকে লালন-পালনের মূলে তো তিনিই। কিন্তু ফল হলো উল্টো। তাঁর বুকের ভিতরটায় যেন কাঁটা বিঁধতে লাগল। আদিনাথবাবু না ভেবে পারলেন না, সত্যিই যদি তথাগত বিদ্যেবুদ্ধির খেলায় হেরে যায় আর ওই সাঁওতাল ছেলেটা জেতে, তাহলে সমাজে মুখ দেখাবেন কি করে?

তারপর কখন যে চারুর ওপর তাঁর মনের ভাব বদলে গেল তা তিনি খেয়ালও করলেন না। এরপর দেখা গেল তার ওপর সংসারের নানা ফাইফরমাস খাটার হুকুম আসছে, তথাগতর সঙ্গে আগের মতো খেলাধুলো করতে গেলে গিন্নিমার কাছে বকুনি খেতে হচ্ছে, ছাদে উঠে ঘুড়ি ওড়ানো সরাসরি নিষিদ্ধ। মোটকথা, আগের অবস্থা আর নেই। তথাগত অবশ্য আড়ালে ওকে বলেছে, তুই কিচ্ছু মনে করিস না। বাবা লোক খারাপ নয়, মাও নয়। তবে একটু কড়া, এই যা।

এত কাণ্ড করেও কিন্তু ভবিতব্যকে এড়াতে পারলেন না আদিনাথবাবু। বার্ষিক

পরীক্ষার ফল বেরোলে দেখা গেল চারু পঞ্চম শ্রেণীতে তৃতীয় স্থান পেয়েছে অথচ ষষ্ঠ শ্রেণীতে তথাগত প্রথম দশের মধ্যে শেষদিকে। আদিনাথবাবুর কাকা একদিন বাড়িতে এসে সব শুনেটুনে বেশ বকাঝকাই করলেন অধ্যাপক ভাইপোকে, নিজের ছেলের দিকে কি একদম মন দেবার সময় পাচ্ছ না আদিনাথ?

—এরকম বলছেন কেন?

—বলছি কি সাধে? ওই জংলি ছেলেটা ক্লাশের পরীক্ষায় প্লেস পেয়ে গেল, আর তোমার ছেলেটা সাদামাঠাভাবে পাশ? তথাগত এইটথ হয়েছে, এটা কি একটা শোনার মতো খবর? বংশের নাম ডোবাবে দেখছি। তা পরের ছেলের জন্যে স্পেশাল কেয়ার আর নিজের ছেলের জন্যে ঢুঁঢু!

আদিনাথ বলতে পারলেন না যে চারুর জন্যে স্পেশাল কেন, বিশেষ কেয়ারই তিনি নেননি। চারু যেটুকু করেছে তা নিজের ক্ষমতাতেই। কাকা কিছু উপদেশ-টুপদেশ দিয়ে চলে গেলেন। এদিকে আদিনাথবাবুর মাথায় তো আকাশ ভেঙে পড়ার উপক্রম। তথাগতর মার মুখ ভার। প্রতিবেশীরা বলতে শুরু করেছে, ট্যালেন্টের কি কিছু বিকল্প হয়? তাই তো প্রফেসরের ছেলে হয়েও তথাগতটা ওই বুনো ছেলেটার কাছে দাঁড়াতে পারল না। শুনে আদিনাথবাবুর মনের কষ্ট বাড়ে। কেবল যার কোনো পরিবর্তনই হয়নি সে তথাগত। সে যেমন ছিল তেমনই আছে। সেই একই রকম হাসিখুশি, সোজাসরল।

একসময় আদিনাথবাবুর মনে হলো চারু আর তথাগত পাশাপাশি থাকলে সাংসারিক অশান্তি এবং মনের কষ্ট এড়ানো অসম্ভব। চারু আর তার বাবাকে সরে যেতেই হবে। কাজটা একটু অমানবিক হয়ে যাবে, কিন্তু উপায় কি?

দিন ছয়েকের জন্যে তথাগত মামার বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিল। ফিরে এসে অবাক। চারু নেই, তার অনাদিজেঠুও নেই।

মাকে জিগ্যেস করল, ওদের দেখছি না, গেল কোথায়?

মা বললেন, তোমার বাবাকে জিগ্যেস কর।

আদিনাথ বললেন, ওরা নেই, চলে গেছে।

—চলে গেছে মানে?

—ওদের এখানে আর দরকার নেই। তাই—

—তাই তুমি ওদের তাড়িয়ে দিয়েছ, না? তথাগতর চোখে আগুন জ্বলছে। ছেলের এমন রুদ্রমূর্তি কখনও দেখেননি আদিনাথ।

আমতা আমতা করে বলেন, না, মানে—

—মানে আবার কি? চারুকে তোমার সহ্য হচ্ছিল না, আমি জানি। ও আমার চেয়ে যদি লেখাপড়ায় এগিয়ে যায়, এই তোমাদের ভয়। বাবা, তুমি নাকি কিসব আদিবাসী কল্যাণ-টল্যান নিয়ে কাজ কর? সব ভুয়ো, মিথ্যে কথা। ভড়ং। চারুকে তুমি ফিরিয়ে আনবে কি না বল? আমি তাকে ছোট ভাইয়ের মতো দেখি। আর অনাদিজেঠু বুড়ো মানুষ, এই বয়সে কোথায় যাবে? কোথায় তাদের তাড়িয়ে দিয়েছ বল, আমি নিজে গিয়ে ফিরিয়ে আনব।

বলতে বলতে ডুকরে কেঁদে উঠল তথাগত।

নিজেকে ভারি ছোট মনে হলো আদিনাথবাবুর। তাঁর চোখের সামনে থেকে যেন একটা অন্ধকারের পর্দা উঠে গেল।

আস্তে আস্তে বললেন, তোকে যেতে হবে না। আমিই নিজে গিয়ে ফিরিয়ে আনব। ওরা হাওড়াতেই আছে। আমার এক বন্ধুর বাড়িতে কাজে লাগিয়ে দিয়েছিলাম।

বছর ছয়েক পরের কথা। প্রসিদ্ধ একটি সংবাদপত্রের তরফ থেকে এক সাংবাদিক এসেছেন তথাগতদের বাড়ি। উদ্দেশ্য মাধ্যমিকে 'স্টার' পাওয়া আদিবাসী ছাত্র চারু মুর্মুর ওপর একটা প্রতিবেদন তৈরি করা। কাজ মিটে গেলে গৃহকর্তাকে সাংবাদিক বললেন, ডক্টর বসু, আপনি একটি আদিবাসী ছেলেকে যেভাবে গড়ে তুলেছেন, যেভাবে সংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠে তাকে মর্যাদা দিয়েছেন তা একটা নোবল এগজামপল।

সাংবাদিক ভদ্রলোক আরো কি বলতে যাচ্ছিলেন, তাঁকে থামিয়ে দিয়ে আদিনাথ-বাবু 'একটু বসুন, আসছি' বলে তথাগতকে ডেকে এনে বললেন, আমার ছেলে। চারুর মানুষ হয়ে ওঠার সমস্ত ক্রেডিট এর। আমার নয়। আমি বরং ভুল পথে যাচ্ছিলাম। সঠিক পথের নিশানা ওই আমাকে দেখিয়ে দেয়। ছোটরা যা পারে আমরা বড়রা তা পারি না। চারু স্টার পেয়ে পাশ করাতে সবচেয়ে কে বেশি খুশি হয়েছে জানেন? আমার এই ছেলেটা। কিরে, তাই তো?

তথাগত জবাব দিল না। জবাব লেখা ছিল ওর চোখে। চোখ দুটোতে খুশির ঝিকিমিকি।

কিছুদিন পরে তথাগতকে একটা রেজিস্ট্রি ডাকে আসা চিঠি দেখিয়ে আদিনাথবাবু বললেন, ইন্ডিয়ান ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের কাছ থেকে প্রস্তাব এসেছে আমাকে ওরা চেয়ারম্যানের পদ দিতে চায়। কি জানাব?

বাবার মুখের দিকে চেয়ে তথাগত হাসিমুখে বলল, লিখে দাও পদটা তুমি নিচ্ছ।

—খোলা মনে বলছিস তো?

—শতকরা একশো ভাগ।

ছবি ঃ জুরান নাথ

আবিষ্কার • দীপক কুমার রায়

শ্রবণযন্ত্র

যাঁরা কানে কম শোনেন অথবা একেবারেই শোনেন না, তাঁদের জন্য ক্যালিফোর্নিয়ার 'সিমফোনিক্স ডিভাইসেস' সংস্থা 'ভাইব্র্যান্ট সাউন্ডব্রীজ' নামে এক যন্ত্র উদ্ভাবন করেছে। যন্ত্রটির দৈর্ঘ্য একটি চালের অর্ধেক পরিমাণ, কানের ভেতর 'ইনকাস-বোন'-এর সঙ্গে আঠা দিয়ে সেঁটে দেওয়া হয় সেটি। যন্ত্রটির মধ্যে একটি চুম্বক ও একটি তার আছে যা ক্ষুদ্র ইনকাস হাড়ের শব্দগ্রহণ ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলে ও শব্দসংকেত সঠিকভাবে ব্রেনে পৌঁছে দিতে সহায়তা করে। ফলে বধির শুনতে পায়।

কেরিয়ার গাইড

ডি. এ. চন্দ্রণ

পাহাড় ডাকে আয়

পাহাড়ের ডাকে সাড়া দিয়ে প্রতি বছর অনেক তরুণ-তরুণী পাহাড়ে ছোটে। মৃত্যুভয়কে কলা দেখিয়ে দিব্যি পাহাড় বেয়ে উঠে যায় তরতরিয়ে। বিশাল মহিমা নিয়ে আত্মমগ্ন পাহাড়ের কন্দরে-কন্দরে জমা হয়ে আছে কতই না অপার রহস্য। তবে এই অভিযানে ক্লান্তি না থাকলেও প্রশিক্ষণের দরকার আছে। দার্জিলিং, উত্তরকাশী, মানালি আর কাশ্মীরের মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট রয়েছে দার্জিলিঙের সাত হাজার ফুট উঁচুতে। এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গের দৃশ্য অতি মনোরম। এখানের মিউজিয়ামে আছে মাউন্টেনিয়ারিং-এর নানা যন্ত্রপাতি, খাবার-দাবার, পোশাক-পরিচ্ছদ। এই ইনস্টিটিউটে দু'ধরনের মাউন্টেনিয়ারিং কোর্স করানো হয়।—বেসিক ও অ্যাডভান্স কোর্স। মার্চ-মে, মে-জুন, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, অক্টোবর-নভেম্বর, নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে বেসিক ও অ্যাডভান্স কোর্স করানো হয়। এছাড়া ১৪-১৮ বছরের ছেলেমেয়েদের জন্য অ্যাডভেঞ্চার কোর্স করানো হয়—ডিসেম্বর, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মে এবং জুন মাসে। এপ্রিল-মে মাসের কোর্স সাধারণত মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত থাকে।

বেসিক কোর্সের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পর্বতশৃঙ্গ এবং পর্বতারোহণ সম্পর্কে প্রারম্ভিক জ্ঞান দেওয়া হয়। এখানে মাউন্টেনিয়ারিং-এর বিভিন্ন কৌশল সম্পর্কে থিওরিটিক্যাল এবং প্র্যাকটিক্যাল শিক্ষা দেওয়া হয়। এই কোর্সের মেয়াদ ২৮ দিন। ছেলে এবং মেয়ে সকলেই এই কোর্সে ভর্তি হতে পারেন। বয়স হতে হবে ১৯ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। ২৮ দিনের কোর্সের মধ্যে ৫ দিনের অ্যাকলেমেটাইজেশন পিরিয়ড, ৬ দিনের ট্রেক টু বেস ক্যাম্প, ১০ দিনের বেস ক্যাম্প ফিল্ড ট্রেনিং, ৪ দিনের ট্রেক ব্যাক টু দার্জিলিঙ এবং শেষ ৩ দিনের প্রশাসনিক পর্যায়। গ্র্যাজুয়েশন সেরিমনি দিয়ে কোর্স শেষ।

এবার আসি অ্যাডভান্স কোর্সের কথায়। অ্যাডভান্স কোর্সের উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীকে এমনভাবে তৈরি করা যাতে তিনি সক্রিয়ভাবে পর্বত অভিযাত্রীদলের সভ্য হতে পারেন। কীভাবে পাহাড়ে চড়তে হয় সেবিষয়ে উন্নত কলাকৌশল সম্পর্কিত শিক্ষা দেওয়া হয়। এই কোর্সের মেয়াদ ৩২ দিন। ছেলেমেয়েরা উভয়েই এই কোর্সে ভর্তি হতে পারেন। বয়স হতে হবে ১৯ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। প্রথম ৫ দিন শেখানো হয় মাউন্টেন থিওরি, পরের ৫ দিন ট্রেক টু বেস ক্যাম্প, ১৫ দিনের ফিল্ড ট্রেনিং, পরের ৪ দিন ট্রেক ব্যাক টু দার্জিলিঙ এবং শেষের ৩ দিন প্রশাসনিক পর্ব, তারপর গ্র্যাজুয়েশন সেরিমনি দিয়ে কোর্স শেষ। এসব ইনস্টিটিউটের বেসিক

প্রকাশিত হল

অরূপরতন ভট্টাচার্য সম্পাদিত

বিজ্ঞান জিজ্ঞাসার একটি প্রামাণ্য বই

বিজ্ঞান যখন ভাবায় ২৬৫

পরিমার্জিত চারটি নতুন অধ্যায় সন্নিবেশিত সংশোধিত সংস্করণ

লুচি কেন ফোলে? রক্তের রঙ লাল কেন? লঙ্কা মরিচ লাল কেন? তেঁতুল কেন বেশী টক? নারকেলের তিনটি মাত্র চোখ কেন? উল্কার কি নিজস্ব আলো আছে? গাছের পাতা ঝরে পড়ে কেন? ছাতার রং কালো কিন্তু ট্রাফিক পুলিশের ছাতার রঙ সাদা কেন?

এই ধরণের অনেক প্রশ্ন আর কৌতূহলের খোরাক আছে এই বই-এর পাতায় পাতায়। অনেক ছবিতে সমৃদ্ধ বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই গ্রন্থটি এক ঐতিহাসিক প্রকাশন।

● ● ●

অরূপরতন ভট্টাচার্য ও শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত

স্বাস্থ্য যখন ভাবায় ১০০

খেতে বসে কথা বলা কি খারাপ? হোমিওপ্যাথি ও অ্যালোপ্যাথি ওষুধ কি এক সঙ্গে খাওয়া চলবে? কানে পোকা ঢুকলে কি করবো? বাড়িতে মানিপ্ল্যান্ট থাকলে কি ক্যানসারের আশঙ্কা বাড়ে? কোল্ড ড্রিঙ্কস খাওয়া কি দাঁতের পক্ষে ক্ষতিকর? নিম দাঁতন না টুথব্রাশ কোনটা বেশী উপকারী? চোখে গগলস সারাক্ষণ ব্যবহার করা কি চোখের পক্ষে ক্ষতিকর? দেশী ডিম বা পোলট্রি ডিম কোনটা বেশী উপকারী? একটি নবজাত শিশু বধির কিনা তা কি করে জানা যায়? চুলে মেহেন্দি লাগানো কি উচিৎ।

চিকিৎসা শাস্ত্রের কৌতূহলকর এই ধরণের হাজারো প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে এই বইটিতে যাতে কেটে যাবে অনেক ভ্রান্ত বিশ্বাস, সংশয় ও অবৈজ্ঞানিক ধ্যান ধারণা।

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রা.) লিমিটেড

৬৮, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা - ৭০০০৭৩

কোর্সে 'এ' গ্রেড পেয়ে পাশ করলে অ্যাডভান্স কোর্সে ভর্তি হওয়া যায়।

এবার অ্যাডভেঞ্চার কোর্স নিয়ে কিছু বলা দরকার। ছেলেমেয়েদের মনে অ্যাডভেঞ্চারের আগ্রহ জাগিয়ে তোলাই এই কোর্সের উদ্দেশ্য। এতে চরিত্র গঠনে যেমন সাহায্য হয় তেমনি দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যেরও বিকাশ ঘটে।

এই কোর্সের মধ্যে থাকে—রক ক্লাইম্বিং, ওয়াটারম্যানশিপ, সারভাইভাল ইন জাঙ্গল, র‍্যাফটিং অ্যান্ড ক্যানোয়িং, ট্রেকিং অ্যান্ড মাউন্টেনিয়ারিং, অবস্ট্যাকল কোর্সেস, ক্রসকানট্রি রানিং, সোলো ক্যাম্পিং ইত্যাদি। ট্রেনিংয়ের সময় শিক্ষার্থীদের টাইগার হিল, সান্দাকফু, ফালুট, জলদাপাড়া গেমস স্যাংচুয়ারি, মিরিক, হাসিমারা, রঙ্গিত এরিয়াল রোপওয়ে সব জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়।

অ্যাডভেঞ্চার কোর্স সাধারণত স্কুল-কলেজের ছুটির সময়ে করা হয়—বিশেষত জুন এবং জানুয়ারি মাসের দিকে। ১৫-২০ দিনের ট্রেনিং। ১৪ থেকে ১৮ বছরের ছেলেমেয়েরা এই কোর্সে ভর্তি হতে পারে।

মাউন্টেনিয়ারিংয়ের বিভিন্ন কোর্সে ভর্তি হতে গেলে দৈহিক সুস্থতা অবশ্য জরুরি। কেননা রুগ্ন, অসমর্থ শরীরে মাউন্টেনিয়ারিং শেখা যায় না। যেমন, আধঘণ্টায় ৫ কিমি জগিং করতে পারা চাই, ২ ঘণ্টায় ১০ কিমি হাঁটতে পারা চাই, ২০ মিনিটে ১০ কিমি সাইক্লিং করা চাই, ১৪ মিনিটে ৪০০ মিটার সাঁতার কাটতে পারা চাই। সবদিক থেকে শক্তসমর্থ না হলে পাহাড়ে চড়া শেখা যায় না। মনে রাখতে হবে, বেসিক মাউন্টেনিয়ারিংয়ের সময় ফিল্ড ট্রেনিং-এ ১৮ হাজার ফুট উঁচুতে নিয়ে যাওয়া হয়। শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে বাঁধাধরা নিয়ম নেই, মেডিকেল টেস্ট ছাড়া কোনো প্রবেশিকা পরীক্ষাও নেওয়া হয় না। আগে থেকে পাহাড়ে ওঠার কলাকৌশলও তেমন জানার দরকার নেই। ছেলে-মেয়েদের জন্য আলাদাভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। প্রিন্সিপালের সুপারিশক্রমে স্কলারশিপও পাওয়া যেতে পারে—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্পোর্টস অ্যান্ড ইয়ুথ সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট, ৩২/১, বি. বা. দী. বাগ (দক্ষিণ), কলকাতা-৭০০ ০০১ এবং ইন্ডিয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ফাউন্ডেশন, বেনিটো জুয়ারেজ রোড, আনন্দ নিকেতন, নতুন দিল্লি-১১০ ০২১ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে।

শিক্ষার্থীরা ইনস্টিটিউট থেকে যন্ত্রপাতি, পোশাক-আশাক পেয়ে থাকে। তাদের সঙ্গে নিজস্ব হাফ্টার বুট, উলেন মোজা, উলেন গ্লাভস, সানগ্লাস, ওয়াটারপ্রুফ, সুইমিং ট্রাংক, ট্রাক স্যুট, পুলওভার ইত্যাদি নিতে হয়। হিন্দি, ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়। কোর্স ফি-র মধ্যে থাকা, খাওয়ার খরচ ধরা থাকে। এখানে ভর্তি হতে আগ্রহী প্রার্থীরা যোগাযোগ করতে পারে—প্রিন্সিপাল, হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট, দার্জিলিং-৭৩৪ ১০১ ঠিকানায়।

আগ্রহী প্রার্থীরা উত্তরকাশীর নেহরু মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটেও যোগাযোগ করতে পারে। ওখানে কোর্স করানো হয়—মার্চ-এপ্রিল, জুন-জুলাই, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে। প্রত্যেক টার্মেই ৪০ জন শিক্ষার্থী নেওয়া হয়। জুন-জুলাই মাসের কোর্সে শুধুমাত্র মেয়েদের নেওয়া হয়। এখানে অ্যাডভান্স মাউন্টেনিয়ারিং কোর্স করা হয় মার্চ-এপ্রিল, জুন-জুলাই, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, অক্টোবর-নভেম্বর মাসে। এক্ষেত্রে জুন-জুলাই মাসের কোর্স মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত থাকে। অ্যাডভেঞ্চার কোর্স করানো হয় এপ্রিল ও মে মাসে। মে মাসে দুটি কোর্স করানো হয়। একটি মেয়েদের, অন্যটি প্রাপ্তবয়স্ক মহিলাদের। নভেম্বর মাসের কোর্সটিতে মূক-বধির ছেলেমেয়েদের ভর্তি করা হয়। আসন সংখ্যা ২০টি। ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে অ্যাডভেঞ্চার কোর্সের আসন সংখ্যা ৬০। এই ইনস্টিটিউটে দার্জিলিঙয়ের চেয়ে ৩টি কোর্স বেশি করানো হয়। সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ কোর্স, মেথড অব ইনস্ট্রাকশন কোর্স, গাইড কোর্স। সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ কোর্স করানো হয় এপ্রিল-মে মাসে। আসন ২০টি। ছেলে-মেয়ে সবাই ভর্তি হতে পারে। মেথড অব ইনস্ট্রাকশন কোর্স করানো হয় এপ্রিল-মে মাসে। এখানেও ২০টি আসন। অ্যাডভান্স মাউন্টেনিয়ারিং কোর্সে 'এ' গ্রেড না পেলে সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ কোর্সে ভর্তি হওয়া যায় না। যোগাযোগ করা যেতে পারে—প্রিন্সিপাল, নেহরু ইনস্টিটিউট অব মাউন্টেনিয়ারিং, উত্তরকাশী-২৪৯ ১৯৩ (উত্তরপ্রদেশ) ঠিকানায়।

মজার খবর ● বরুণ মজুমদার

সর্বাধুনিক 'স্পাইডারম্যান'?

মানুষের কখন যে কি খেয়াল চাপে তা বলা মুশকিল। তা না হলে বেপরোয়া এক ফরাসী যুবক হঠাৎ কেন টোকিওর ৫৪ তলা একটা বাড়িতে বাইরে থেকে খালি হাতে উঠে যাবে? অ্যালেন রবার্ট নামে ২৯ বছর বয়স্ক যুবকটি স্পাইডারম্যানের মতো তরতর করে উঠে গেল সেই বিরাট অট্টালিকার ছাদে। সিনজুকু সেন্টার ভবনের উচ্চতা হলো ২৩২ মিটার। সেই উঁচু বাড়ির ছাদে উঠতে সে সময় নিয়েছিল প্রায় তিরিশ মিনিট।

যুবকটি জানিয়েছে যে, সে এর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংসহ তিরিশটির বেশি উঁচু ভবনের ছাদে উঠেছে। জনসাধারণের কাছ থেকে বাহবা কুড়ানোর জন্যই তার এই চমক বলে সে জানিয়েছে। অ্যালেন ঐ অঞ্চলে জড়ো হওয়া অসংখ্য মানুষের বাহবা কুড়ালেও পুলিশের চোখে ধুলো দিতে পারেনি। বাইরে থেকে হঠাৎ একজন থানায় ফোন করে পুলিশকে জানায় যে, একটা লোক ঐ বাড়ির ছাদে উঠছে। খবর পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে থানা থেকে পুলিশ সেখানে গিয়ে হাজির। অ্যালেন নিচে নেমে আসতেই পুলিশ তাকে অনধিকার প্রবেশের দায়ে গ্রেপ্তার করে। কার কি উদ্দেশ্য তা তো বলা যায় না। অ্যালেনের মনে কিন্তু কোনো খারাপ উদ্দেশ্য ছিল না। চুরি-ডাকাতির জন্য ওভাবে সে ঐ বাড়ির ছাদে ওঠেনি। এটা ছিল নেহাৎই তার চমক। কিন্তু হলে কি হবে, আইন তো আর তার স্বপক্ষে নয়। সুতরাং বেচারাকে শ্রীঘরে যেতে হয়েছে। এবার হয়তো তার আক্কেল গুড়ুম হবে।

বজ্র আঁটুনি

হীরেন চট্টোপাধ্যায়

না, আমাদের গরানহাটায় এটা নতুন কিছু নয়। পুজোর পর প্রথম শীতের আমেজটি পড়ল কী, কাজ শুরু হয়ে গেল নিশিকুটুম্বদের। দিব্যি সব দশটা-এগারোটার মধ্যে লেপ-কম্বল মুড়ি দিয়ে মনের সুখে নাক ডাকাচ্ছে, সকালবেলা উঠেই চক্ষু চড়কগাছ—সদর দরজা একেবারে হাট, বাড়ির দামি সব জিনিসপত্র বেমালুম হওয়া। নিঃশব্দে কী করে যে এই রাজসূয় যজ্ঞটি সমাপ্ত হয়ে গেল, বুঝতেই পারল না কেউ।

হতো, কিন্তু সেটা ওই কড়া শীতে পিঠে-পায়েস খাবার সময়। এতো আগেই যে এবার নিশিকুটুম্বদের 'সিজন' শুরু হয়ে যাবে, সেটা বুঝতে পারা যায়নি। বোঝা গেল, যেদিন সকালে ওলাইচণ্ডীতলার বুলাই নন্দী সাতসকালে গগনদার বাড়ির সামনে এসে উচ্চিংড়ের মতো তিড়িং-বিড়িং শুরু করে দিলে, 'ছি ছি ছি গগন, তোমাদের ক্লাবের অমন সব ডানপিটে ছেলেরা থাকতে আমার এমন সব্বোনাশটা করে গেল সব! ধনেপ্রাণে মেরে গেল আমাকে! দু'বেলা তিরিশ-বত্তিরিশটা পাত পড়ে বাড়িতে—কী দিয়ে এখন সামলাই বলো তো ওদের!'

ঘটনাটা এইরকম, আলুর দর পড়ে যাচ্ছে বলে ঠাণ্ডা ঘর থেকে সব আলু বের করে বেচে দিয়েছে বুলাই নন্দী। ওই ঠাণ্ডা ঘরে জিনিসপত্র ঢোকানো আর বার করা, এইটেই ওর ব্যবসা। তো বেলা হয়ে গিয়েছিল বলে টাকাটা আর ব্যাঙ্কে ফেলতে পারেনি কাল, বাড়িতেই নিয়ে এসেছিল। ভেবেছিল, একটা রাতের তো ব্যাপার, একটু তক্কেতক্কে থাকলেই হবে। চোরচূড়ামণি যে আরো তক্কেতক্কে ছিলেন, সে আর নন্দীমশাই জানবে কী করে!

তবু ব্যাপারটা যদি একা বুলাই নন্দীকে দিয়ে শেষ হতো তো না হয় হঠাৎ একটা চুরি হয়ে গেছে বলে চুপচাপ বসে থাকা যেতো। কিন্তু তা তো আর হলো না! বুলাই নন্দীর পর মধু সামন্ত, তারপর চণ্ডী পরামানিক,—এই করে দেখতে দেখতে পাঁচ-ছটা বাড়ি সাফ হয়ে গেল। কাজেই আমাদের গ্রেট গগনদা কি এরপর আর নিশ্চিন্তে বসে থাকতে পারে! গগনদা শুধু যে আমাদের গরানহাটা স্পোর্টিং ক্লাবের পার্মানেন্ট প্রেসিডেন্ট তা তো নয়, বিপদে-আপদে নানারকম বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে আমাদের পাড়াটাকেও তো ঠাণ্ডা করে রেখেছে। কাজেই এ ব্যাপারে গগনদার টনক নড়বে, এ তো খুব স্বাভাবিক ব্যাপার।

টনক নড়েছে আরো এই কারণে যে, ওই যাকে বলে 'সিজন', তার অনেক আগেই এবার ব্যাপারটা শুরু হয়ে গেল। শীতের এখন কোথায় কী, পুজোই তো এলো না এখনও। সবে বোধহয় বোনাস-টোনাসগুলো হাতে এসেছে, ব্যস শুরু হয়ে গেল কাণ্ডকারখানা। পুজোর সময় কোথায় লোকে দু'-চারটে পয়সা যোগাড়-টোগাড় করবে, নতুন দু'-চারখানা জামাকাপড়

কিনবে—যার যেমন ক্ষমতা। হয়ে গেল সেসব। তার ওপর এবার নতুন উৎপাত, ছিঁচকেমি। ভর সন্ধ্যেবেলা দরজাটি একটু খুলে পাশের বাড়িতে গিয়েছিল বুলানের মা—দু'তিন মিনিট বড়ো জোর, রান্নাঘর থেকে একগোছা বাসনপত্র উধাও। মহাদেব ধোপা সাইকেলে করে কাচা জামাকাপড় নিয়ে আসে, এক বাড়িতে জামা দিয়ে আসতে আসতে দুটো দামি শাড়ি লোপাট। রাত্তির তখন কটা? সবে সাড়ে সাতটা কি আটটা, রাস্তায় লোক গমগম করছে। বাড়ির মেয়েদের মনে তো ভয় ঢুকে গেছে, এই বুঝি কী একটা হয়ে গেল। ছেলে-ছোকরারা আড্ডা মারতে চলে যায়, বাড়ির পুরুষ-মানুষরাও সব ফেরে না অনেকে এই সময়। এরকম উটকো ঝঞ্ঝাট লেগে থাকলে তো মহা বিপদ।

তা বিপদ যেখানে, মুশকিল-আসান গগনদাও সেখানে। দেরি না করে একেবারে যাকে বলে 'যুদ্ধকালীন তৎপরতায়' কাজে নেমে পড়ল গগনদা। ক্লাবে জোরদার মিটিং হয়ে গেল একটা পাড়ার লোকজন নিয়ে। রাতে বেরোবার জন্যে আর. জি. পার্টিও তৈরি হয়ে গেল। কোন কোন বাড়ি থেকে কবে কে বেরোবে তার লিস্টি তৈরি, চাঁদা কতো দিতে হবে সেও ঠিক হয়ে গেল। এমনকি পরের দিনের মধ্যেই ব্যাটারি, টর্চ, লাঠি, হুইস্‌ল্‌ সমস্ত রেডি—গগনদার পয়সাতেই অবশ্য, পরে চাঁদা থেকে পয়সা ওকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। মোট কথা, আর. জি. পার্টি গগনদার লিডারশিপে পরের দিনই পুরো তৈরি।

সকলেই খুশি পাড়ার, কিন্তু আমাদের মুখ ভার। হবে না কেন, মিটিং হলো গরানহাটা গন্ধেশ্বরী স্পোর্টিং ক্লাবে, গোটা ব্যাপারটা ঠিকঠাক করল আমাদেরই গগনদা, আর মাঝখান থেকে কিনা আমরাই বাদ। মিটিং-এ কথাটা তুলতে গিয়েছিল ঘোঁতন, এক দাবড়ানিতে তাকে থামিয়ে দিয়েছিল গগনদা, বলেছিল, 'কোনো কথা বলবি না! এইচ. এস.-এ এবার ডবকেছিস, তোর বাবা-মা পুরো দোষটা আমার ঘাড়ে চাপিয়েছে, আমিই নাকি আস্কারা দিয়ে তোদের মাথাটি খেয়েছি। এ বছর পাশ কর, পরের বছরই নিয়ে নেবো তোকে পার্টিতে।'

সে, ঘোঁতন না হয় এরকম গাঁটে আটকে আটকেই পার হয় প্রত্যেক বছর, কোন ক্লাসেই বা এক চান্সে বেরিয়েছে ও এ পর্যন্ত! তাই বলে আমাদের সকলের জন্যেই ওই এক বিধান!

হ্যাঁ, এক বিধান। অন্য যে-কোনো ব্যাপারে কথা বলো, গগনদা এক কথায় রাজী। এমনকি, আসানসোলে ফুটবল খেলতে গিয়ে আমরা দু' রাত্তির কাটিয়ে পর্যন্ত এসেছি। কিন্তু এখানে গগনদার মাথা সেই যে দু' দিকে নড়তে শুরু করেছে, সে আর থামবার নামটি নেই। খালি বলে, 'তোদের এখন পড়াশুনোর সময়, রাত্তির জেগে টহল দিবি, আর দিনের বেলা পড়ে পড়ে ঘুম মারবি, ওটি হচ্ছে না।'

'সে তো আর রোজ নয় গগনদা', ঢ্যাঙা স্বপন বলবার চেষ্টা করেছিল একবার, 'মাসে ধরো বড়ো জোর দু'দিন। সেই দুটো দিন যদি—'

'ওসব যদি-ফদির কথা ছাড়। বেরনো তোদের হচ্ছে না।'

'কেন ওরকম করছো গগনদা?' ভোটকা মোলায়েম করে বললে, 'তুমি হচ্ছো গিয়ে পার্টির লিডার, আমরা না থাকলে তোমার ভালো লাগবে?'

'খুব লাগবে। অনেক নিশ্চিন্তে থাকবো। কার বাগানে ডিল পড়ল, কার জানলায় খটখট শব্দ হলো—এসব উল্টো-পাল্টা কথা অন্তত আমায় শুনতে হবে না।'

'ওসব আমরা মোটেই করি না', আমি গজগজ করছিলাম, 'যে-কোনো জায়গায় যাও, দেখবে আর. জি. পার্টিতে আমাদের মতো ছেলেরাই সব পাহারায় বেরোচ্ছে। যতো দোষ কিনা সব আমাদের বেলায়!'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই তাই', গগনদার গলা চড়ল, 'যা বুঝিস না তা নিয়ে কথা বলিস কেন! আমি যা ঠিক করবো তাই তো হবে, নাকি?'

সে তো বিলক্ষণ। জানি বলেই তো কেউ বিশেষ উচ্চবাচ্য করতে পারছি না, এক ওই প্রায় আপন মনে গজগজ করা ছাড়া। কিন্তু আসল ব্রহ্মাস্ত্রটা যে বেরিয়ে আসবে আমাদের গোলকীপার বেটুয়ার কাছ থেকে, সেটা কি কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছি!

শুরুটা করেছিল বেটুয়া খুব নিরীহ ভাবেই, বলেছিল, 'নারে গোরা, গগনদা ভালো কথাই বলেছে। এমনিতেই তো ধর প্র্যাকটিস সেরে একটু আড্ডা-ফাড্ডা দিই আমরা—'

'একটু মানে, ওটাকে একটু বলে?' গগনদা কটমট করে তাকিয়েছিল বেটুয়ার দিকে, 'তারপরও যদি বলিস রাত্তিরে বেরোব—'

'বলছি না তো সেই জন্যে!' বেটুয়া বলেছিল, 'তবে ওই সাড়ে আটটা-নটা পর্যন্ত গল্পগুজব করাটা তুমি অ্যালাউ করছো তো!'

'উঃ! না করলেই যেন শুনবি কতো তোরা!'

'তাহলে এবার আর একটা জিনিস ভেবে দেখো গগনদা,' বেটুয়া আড়চোখে গগনদার মুখটা জরিপ করে নিয়ে বলেছিল, 'চুরিটা কিন্তু কেবল রাত্তিরেই হয় না।'

'মানে?'

'মানে ছিঁচকে চুরিও হচ্ছে এখন অনেক। শুধু রাত্তিরে পাহারা দিলে সেটা কিন্তু তুমি আটকাতে পারবে না।'

'তো! কী করতে হবে আমাকে?'

'কিচ্ছু করতে হবে না—নটা পর্যন্ত তোমার পাহারাদার তো আমরা রেডি। শুধু দোকানের বিলটা যদি তোমার আর. জি. পার্টি মাঝে মাঝে পেমেন্ট করে দেয়—'

আঃ, জিতা রহো বেটুয়া। গগনদা যে গগনদা, তার মুখে পর্যন্ত কথা নেই কয়েক সেকেন্ড। তারপর ব্যাপারটা বুঝে নিয়েই কী হাসি। একটু পরে হাসি থামিয়ে বললে, 'ঠিক আছে, যা। ছিঁচকে চোরের ডিপার্টমেন্ট তোদের।'

আমরা বেজায় খুশি, বলাই বাহুল্য। কিন্তু ভোটকা তখনও কিন্তু কিন্তু করছে, বলল, 'আমাদের কি কোনোদিনই প্রোমোশন হবে না গগনদা?'

'কেন? প্রোমোশন পাওয়ার জন্যে অতো ব্যস্ত কেন?'

'না, মানে, ছিঁচকে কেস কি আর বিশেষ আসবে! মিছিমিছি হা-পিত্যেশ করে বসে থাকা—'

'ম্যালা ফ্যাচফ্যাচ করিস না তো! দিব্যি ঘোষ কেবিনে বসে মাংসর সিঙাড়া ওড়াবি, তার আবার মিছিমিছিটা কিসের শুনি!' গগনদা হঠাৎ গলার স্বর পাল্টে ফেলে বললে, 'আচ্ছা দাঁড়া, টস করি, দেখি তোদের ভাগ্যটা কেমন।'

সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে একটা দু'টাকার কয়েন বার করলে গগনদা। ডানহাতের মধ্যমায় সেটা রেখে ঠিক তার নিচে বুড়ো আঙুলটাকে ব্যালেন্স করতে করতে বলল, 'বল চটপট, হেড না টেল?'

বলল বেটুয়া। কয়েন শূন্যে কয়েকটা পাক খেয়ে গগনদার হাতের চাপড়ে বন্দী। হাতের ঢাকা খুলেই গগনদা উল্লসিত, 'পাবি। কেস তোরা পাবি। কয়েন আমার সঙ্গে বিট্রে করে না।'

ব্যাপারটা সত্যি কিনা, সেটা প্রথম আমরা যেন আঁচ করতে পারলাম এই তৃতীয় দিনে এসে। লোকটাকে দেখেই আমার ভুরু কুঁচকে উঠেছে। আমি ঘাড় ঘুরিয়ে বুঝতে পেরেছি রকেটের চোখও ওই দিকেই। ততোক্ষণে বাকি ক'জোড়া চোখও ওই দিকে ফিরেছে।

একটা কিছু ছিলই লোকটার চালচলনে। নইলে এমনটা হবার কথা নয়!

না, এ কথা অবশ্য ঠিক যে প্রথম দু'দিন ঠায় একভাবে নজর রাখতে রাখতে আমরাও কিরকম অধৈর্য হয়ে উঠছিলাম। অতোটা অবশ্য হয়েছিল আমাদের অতি উৎসাহের জন্যেই। চেনা মানুষ, চেনা পাড়া, নতুন কেউ এলে সঙ্গে সঙ্গেই চোখে পড়ে যাবে। যাঁরা মাঝে মাঝে আসেন তাঁরাও মোটামুটি আমাদের চেনা হয়ে গেছেন। কাজেই অতোটা বাড়াবাড়ির কোনো দরকার ছিল না। গগনদা কিন্তু দু'দিনই আমাদের পিঠ চাপড়ে দিয়ে গেছে, বলেছে, 'তোদের হবে, চালিয়ে যা।' আজও একটু আগে চা খেল আমাদের সঙ্গে, তারপর ভুরু কুঁচকে বললে, 'মনে হচ্ছে একটা কেস তোরা পাবি দু'-একদিনের মধ্যেই।' তারপরই এই কাণ্ড। সবে সন্ধ্যে আটটার সময়।

পঞ্চাশের ওপরেই বয়স, এখান থেকে যতোটা বুঝতে পারা যাচ্ছে। তা হোক, ছিঁচকের বয়সের কোনো ঠিক থাকে না— ষোল থেকে ছেষট্টি, যাহোক কিছু হতে পারে। কিন্তু চেহারাটা আর যেরকমই হোক, ভদ্রমানুষের মতো নয়। বারকোশের মতো চ্যাপ্টা একটা মুখ। টিয়াপাখির মতো ঝুলে পড়া নাক। কুৎকুতে চোখ, কুঁচকে থাকার জন্যে আরো ছোট দেখাচ্ছে। দু'-তিন দিনের না-কাটা দাড়িগোঁফ মুখে। পোশাক-আশাকও চেহারার সঙ্গে মানানসই। আধময়লা পাজামা-পাঞ্জাবি, পাঞ্জাবিটা একটু বেশি কোঁচকানো। কাঁধে বেঢপ এক ঝোলানো ব্যাগ।

না, চেহারা ভদ্রলোকের মতো না হলেই চোখে পড়তে হবে, এমন কোনো কথা নেই। পাড়ার চেনা মানুষ না হলেও এতোটা শঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ ছিল না, কিন্তু এই যে ভোটকার মতো ছেলে চিকেন পকোড়া ফেলে একদৃষ্টে চেয়ে আছে লোকটার দিকে, সেটা অন্য কারণে।

একটা কিছু মতলব আছে লোকটার, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আর মতলবটা যে সাধু নয়, সে ওর ভাবভঙ্গি দেখেই বোঝা যায়। মনাদার সিগারেটের দোকানের সামনে দাঁড়িয়েছে, মানে ঘোষ কেবিনের ঠিক উল্টো দিকে। ভাবখানা, যেন সিগারেটই কিনছে, কিন্তু একটু খেয়াল করলেই বোঝা যায় সামনে ঝোলানো আয়নায় চোখ রেখে দেখতে চাইছে আমাদেরই। অর্থাৎ পাড়ার ছেলে-ছোকরাদের মতিগতি একটু বুঝে রাখার চেষ্টা করছে।

আমরা কোনো কথা বলছি না, কিন্তু খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে সকলেরই। আমাদের মধ্যে জনুই একটু মারকুটে টাইপের। দেখলাম সে বসে বসে হাত দু'টো মুঠো করছে আর খুলছে।

সিগারেট নিয়েছে লোকটা, ধরিয়েওছে। কিন্তু খাচ্ছে না। কী যেন কথা হলো একবার মনাদার সঙ্গে, তারপরই ঢুকে পড়ল পাড়ার মধ্যে।

চোখে চোখে কথা হয়ে গেল আমাদের। বাক্যব্যয় না করে যে মুহূর্তে আমরা উঠে পড়েছি ঘোষ কেবিন থেকে—

ভাগ্য একেই বলে, ঝুপ করে নেমে এলো অন্ধকার। লোডশেডিং।

বোঝ কাণ্ড। হাতে পেয়েও ছেড়ে দিতে হবে নাকি লোকটাকে! দ্রুত বেরিয়ে এলাম দোকান থেকে। মনাদাকে জিজ্ঞেস করা যেতো কী জানতে চাইল লোকটা। কিন্তু তাতে অনর্থক সময় নষ্ট হবে। নষ্ট করার মতো সময় এখন একেবারে নেই।

দু'-তিন লাফে আমরা রাস্তা পার হয়েছি। চেনা পাড়া, চেনা দোকান, চেনা রাস্তা, কিন্তু ওই হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গেলে চোখকে সেটা সইয়ে নিতে খানিকটা সময় দিতে হয়। সেটুকু সময় অন্ধকার হাতড়ে একটু এগুবার পর সামনে কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না। অর্থাৎ পাখি পালিয়েছে।

কথাটা মুখ ফুটে বলার সঙ্গে সঙ্গে একটা বিচিত্র মুখভঙ্গি করল ঘোঁতন, বলল, 'আরে ছাড় তো! পালাতে দিচ্ছি ওকে! যা, তোরা খুঁজে বের কর, আমি রইলুম এই ঘোষ কেবিনে ঘাঁটি আগলে। পাড়া থেকে বেরুবার আর তো কোনো রাস্তা নেই।'

তা অবশ্য নেই। জনুকে আমরা পাঠিয়ে

এ টি দেবের অভিধান

সংশোধিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ

শব্দবোধ অভিধান ১৫০.০০

শব্দাভিধান ও সাইক্লোপিডিয়া

(বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক আদ্যোপান্ত পরিমার্জিত ও পরিশোধিত)

ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, গণিতের বিভিন্ন শাখার নূতন পারিভাষিক শব্দ ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক অফিস ইত্যাদির জন্য প্রবর্তিত শব্দ ও পরিভাষা এই সংস্করণে সন্নিবেশিত হয়েছে। আছে জীবন-চরিত, বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়ও।

২৬০০০ শব্দের বিবিধ প্রয়োজন-সাধক অভিধান

নববিধান ৮৫.০০

(জ্যোতিভূষণ চাকী কর্তৃক পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত)

এই অভিধানের বৈশিষ্ট্য

শব্দব্যাখ্যা চলিত ভাষায় ◆ উৎস ও ব্যুৎপত্তি ◆ পদপরিচয় সন্ধিসমাসাদি জ্ঞাতব্য ◆ পদান্তর ও বিপরীত শব্দ ◆ প্রবাদ প্রবচন ◆ বিবিধ জ্ঞাতব্য ঃ স্থান বিষয় ইত্যাদির পরিচয় ◆ চরিতকথা ◆ বাংলা ধাতু পরিচয় ◆ ব্রজবুলি প্রসঙ্গ ◆ পরিভাষা ইত্যাদি

সরল অভিধান ৫০.০০

(জ্যোতিভূষণ চাকী কর্তৃক পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত)

এই অভিধানটি আদৃত হয়েছিল তার সুবহতা ও ব্যবহার্যতার জন্য। বিশেষ্য বা বিশেষণ এবং তজ্জাত শব্দগুলি পৃথক-ভাবে সন্নিবেশিত হওয়ায় এর ব্যবহার্যতা বেড়েছে।

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিঃ

২১, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

দিলাম গগনদার কাছে। খবরটা গগনদাকে জানিয়ে রাখা দরকার। তারপর চোখ-কান সতর্ক করে এগোলাম।

বেশিক্ষণ নয়, মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই দেখা গেল লোকটাকে আবার। এখন যে-কোনো ছেলে ওকে ফলো করলেই বুঝতে পারবে ওর মতলবটা কী। কারো বাড়ি এসে থাকো, স্ট্রেট চলে যাও সেখানে, কিংবা কাউকে জিজ্ঞেস করো। তা না, দু'পা করে এগুচ্ছে তো থমকে দাঁড়াচ্ছে খানিক। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। একটা আধখোলা দরজা, কি বারান্দায় কাপড়জামা ঝুলছে দেখলেই যে টুক করে সেটা হাতিয়ে পালাবে, এ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই।

'একটু দূরত্ব রেখে হাঁট,' ভোটকা বললে, 'ব্যাটা টের পেয়ে গেলে দেখবি আমাদের বুদ্ধু বানিয়ে কাশীর দোকান থেকে অ্যাবাউট টার্ন হয়েছে।'

'হতে দে,' রকেট বলল, 'ঝাঁপিয়ে পড়বো পালাতে গেলেই। কথা নেই বার্তা নেই, পাড়ার ভেতর ঘুরঘুর করলেই হলো!'

'তাতে তোর কী!' ঢ্যাঙা স্বপন বললে, 'পাড়ায় ঢুকলেই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে! ওরকম মাথা গরম করে কোনো লাভ আছে?'

'তাহলে হাতে পেয়েও ছেড়ে দাও। অতো মাথা ঠাণ্ডা রাখতে গেলে জিন্দেগিতে কেস পাবে না।'

'না-না, স্বপন ঠিকই বলেছে,' বেটুয়া বাধা দিল, 'ধরবি তো রেড-হ্যান্ডেড! নইলে ফালতু ওই—'

কথা শেষ হয়নি, তার আগেই লোকটা থেমে গেছে। হাতের একেবারে নিঃশেষিত সিগারেটের টুকরো ছুঁড়ে ফেলেছে রাস্তায়। তারপর পায়ে পায়ে বাঁদিকের লোহার গেটের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

সন্দেহ নেই, এবার আর কোনো সন্দেহ নেই।

পুরো দলটা আমরা দাঁড়িয়ে গেছি সতর্ক হয়ে।

সোমনাথদার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে যখন, খবরাখবর ভালোই নিয়েছে মনে হয়। পাড়ার মধ্যে যে-কটা সলভেন্ট পার্টি আছে, সোমনাথদা তাদের একটা। ওরা দুই ভাই-ই—সোমনাথদা, শঙ্খনাদদা শিপিং কর্পোরেশনে কাজ করে, মালকড়ি ভালোই পায়। সোমনাথদা গগনদার বন্ধু, শঙ্খনাদদা বেশ কয়েক বছরের ছোট—বিয়ে-টিয়েও হয়নি এখনও। সোমনাথদার বছর পাঁচেকের ছেলে আছে একটা, রন্টু। ভারি মিষ্টি ছেলে।

ওই রন্টুকে নিয়েই যতো সমস্যা। দারুণ মিশুকে ছেলে, হুটহাট চলে যাবে এর-ওর বাড়ি। দরজা খোল, দরজা বন্ধ করো বলতে তো ওই বৌদি—একা মানুষ আর ক'দিক সামলাবে।

যেমন এখন! নির্ঘাৎ রন্টু এসে ঢুকেছে দরজা ঠেলে।

এতোটা দূর থেকেও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, দরজাটা খোলা। লোডশেডিং বলেই বোঝা যাচ্ছে অবশ্য। বাইরেটা অন্ধকার, অথচ ঘরের ভেতর থেকে ছোট্ট একটা আলোর রেখা বেরিয়ে এসেছে বাইরে।

আর সেইটেই লক্ষ্য করেছে লোকটা। এই সুযোগ। অন্ধকারে একটা কিছু হাতিয়ে সরে পড়লে আর ধরছে কে।

লোহার গেট খুলে সন্তর্পণে এগিয়েছে লোকটা ভেতরে।

শিকারী বেড়ালের মতো গুটিসুটি মেরে আমরাও এগিয়ে এসেছি একটু সামনে।

শব্দ হলো নাকি। লোকটা হঠাৎ থমকে গেল কেন। আস্তে আস্তে পেছন দিকে তাকাল একবার।

আমরা সব ছায়ার মতো সেঁটে আছি অন্ধকারে। শিবের বাবারও সাধ্যি নেই ধরে।

এগুচ্ছে লোকটা দরজার দিকে, আমরাও এগুচ্ছি তার দিকে।

লোকটার একটা হাত দরজায়। আমরা তার প্রায় পেছনে।

লোকটা দরজা ঠেলেছে, আমরা তৈরি হয়েছি।

দরজা ফাঁক করে লোকটা ভেতরে গলবার জন্যে পা বাড়িয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে রকেট ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার ওপর। কলার ধরে হিড়হিড় করে টেনে এনেছে পেছন দিকে।

হিঁক করে একটা শব্দ করেই হঠাৎ এতোগুলো ছেলে দেখতে পেয়ে হাঁউমাউ করে উঠতে যাচ্ছিল, বেটুয়া বল ফিস্ট করার মতো বুকে একটা ধাক্কা দিয়ে বললে, 'একেবারে চুপ! বেশি চেঁচামেচি করেছো কি সোজা শাস্টিং করে দেবো।'

'অ্যাঁ! কী বললে?'

'শাস্টিং! শাস্টিং শোননি? মায়ের ভোগে চলে যাবে।'

'ওরে বাবারে, সে আবার কী!'

'ন্যাকামি হচ্ছে!' হেঁড়ে গলায় চাপা চিৎকার করে উঠল রকেট, 'দু' ঠুসোয় বেন্দাবন দেখিয়ে দেবো—মুখের খোমা পাল্টে দেবো। কীরে, ঝাড়বো?'

'দাঁড়া-দাঁড়া,' আমি বললাম। আসলে গগনদা এসে না পড়া পর্যন্ত গায়ে-টায়ে হাত তোলার বিশেষ পক্ষপাতী আমি নই, তাই বললাম, 'শোনাই যাক না লোকটা কী বলে। দরকারে এসেছে এমনও তো হতে পারে।'

'দরকারেই এসেছে বটে! অন্ধকার দেখে স্যাট করে একেবারে ভেতরে'—রকেট কলার ধরেই ছিল, একটা বেদম ঝাঁকানি দিয়ে বললে, 'এই! এ বাড়িতে ঢুকছিলে কেন?'

'ঢুকছিলাম মানে, বলছি—কলারটা ছাড়ো, নইলে তো ঠিক—'

'ছেড়ে দে রকেট, ছেড়ে দে। ব্যাটা পালাবে কোথায়!' ভোটকা বললে, 'হ্যাঁ, বলো, কী বলবে!'

'সেটা মানে, এ বাড়ির লোকদের বললেই ভালো হয় না! তোমরা, কী বলে, বাবারা—'

'আমরা কে সেটা তোমায় ভালো করেই বুঝিয়ে দেবো, তবে তার আগে তোমায় একটা চান্স দিচ্ছি'—ভোটকা টুক করে বাড়ির ভেতরে ঢুকে গিয়ে গলা তুলল, 'বৌদি—এই রন্টু—শঙ্খনাদদা—'

ভেতরে ছ্যাঁক ছ্যাঁক শব্দ হচ্ছিল রান্নাঘরে, সেখান থেকেই সাড়া দিল রন্টুর মা, 'যাই—ওরা কেউ ফেরেনি—'

আঁচলে হাত মুছতে মুছতে আসছিল, বললে, 'আরে, দরজা খোলা ছিল নাকি! দেখেছ রন্টুর কাণ্ড! কী ব্যাপার বলো তো ঠাকুরপো?'

'দেখুন কাণ্ড! পাড়াসুদ্ধু হুলুস্থুলু—আর আপনি বলছেন, কী ব্যাপার! চোর ঢুকেছিল যে আপনার বাড়িতে!'

'অ্যাঁ! সে কী!'

'হ্যাঁ। ভয় নেই আপনার, তক্কেতক্কে ছিলুম আমরা। যেই মাথা গলিয়েছে, খপ্ করে চেপে ধরেছি।'

'ধরা পড়েছে! আঃ, বাঁচালে!'

'আরে আমরা থাকতে বৌদি আপনাদের কী ভয়! আপনি শুধু এসে একবার আইডেনটিফাই করে দিন লোকটাকে আপনি চেনেন কিনা, ব্যস।'

জামাটা খামছে ধরে তুলেছে ফের রকেট

'কোথায় সে?'

'ওই তো, দরজার বাইরে। আমরা সবাই আছি।'

ততোক্ষণে রন্টুও এসে ভয়ে ভয়ে মায়ের আঁচল মুঠো করে ধরেছে। ভয় যে রন্টুর মাও কিছু কম পায়নি সেটা তার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। তাকে দেখতে পেয়েই লোকটা কষ্ট করে একগাল হেসে বললে, 'দ্যাখো তো মা লক্ষ্মী, ছেলেপিলের দল আমাকে ধরে একেবারে—'

'চোপ!' রকেট প্রবল চিৎকারে থামিয়ে দিয়েছে লোকটাকে—'ওসব আমড়াগাছি পরে হবে। দেখুন তো বৌদি, একে আপনি চেনেন কিনা।'

'কী করে চিনবো'—রন্টুর মা ভুরু কুঁচকে বলল, 'জীবনে দেখেছি নাকি কোনোদিন!'

'দেখেননি তো? শিওর?'

'কক্ষনো না। আসেওনি কখনও এ বাড়িতে।'

'না-না, আসিনি তো—সেই কথাই তো আমি—'

'ব্যস ব্যস, আর কিচ্ছু বলতে হবে না—' ভোটকার এক ধাক্কায় লোকটা ছিটকে লোহার গেটের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। বুকের কাছে জামাটা খামছে ধরে তুলেছে ফের রকেট লোকটাকে, দরজার দিকে ফিরে বলেছে, 'ঠিক আছে বৌদি, দরজা বন্ধ করে দিন। লোকটার দেখাশোনার ভার আমাদের ওপরই ছেড়ে দিন।'

দেখাশোনার ব্যবস্থা যে অতি উত্তম, অচিরেই টের পেয়ে যেতো লোকটা, বাঁচিয়ে দিল গগনদা এসে। সবে গেট খুলে বেরিয়েছি, হুড়মুড় করে এসে পড়ল জনু গগনদাকে নিয়ে। লোকটার চেহারা দেখেই বুঝতে পেরেছে ছোটখাটো একটা দলাইমলাই হয়ে গেছে এর মধ্যেই। ডান হাতটাকে কাটারির মতো ধরে প্রায় উড়ে এসে একটা মার্শাল আর্ট ঝাড়তে যাচ্ছিল, গগনদাই আটকে দিল, বলল, 'দাঁড়া না, এসব কি পালিয়ে যাচ্ছে নাকি! আমাকে একটু কথা বলতে দে লোকটার সঙ্গে।'

'কী কথা বলবে গগনদা'—আমি বললাম, 'বৌদি স্রেফ ডিনাই করেছে। দেখেইনি কোনোদিন লোকটাকে।'

'আরে আমিও তো তাই বলছি—উনি তো আমাকে—'

'চুপ চুপ, বেশি কথা আমি একদম পছন্দ করি না—' গগনদা একেবারে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, 'যা জিজ্ঞেস করবো শুধু তারই জবাব দেবেন। রাইট? বলুন, নাম কী আপনার?'

'শিবকালী রক্ষিত!'

'থাকেন কোথায়?'

'অনেক দূর! সোদপুর—সেই সোদপুর থেকে এই এখানে—'

'ফের বাজে বকছেন! এখানে কোথায় এসেছিলেন?'

'এই তো, এই বাড়িতে।'

'সেটা তো দেখতেই পাচ্ছি চোখে! এ বাড়ির নম্বর কতো?'

'নম্বর! দাঁড়ান নম্বর হচ্ছে গিয়ে—'

'নাম কী, যার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন?'

'নাম হলো গিয়ে'—একবার হোঁচট খেয়ে বললে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, সোমনাথ গুপ্ত।'

'শুনে এসেছে গগনদা—মনাদার দোকান থেকে।' জনু চেঁচিয়ে উঠল, তারপর হাতের আস্তিন গুটোতে গুটোতে বললে, 'একেবারে কনফার্মড কেস গগনদা—প্রত্যেক কথায় হোঁচট খাচ্ছে, বৌদি পর্যন্ত নাকি চিনতে পারেনি! এবার যদি একটু হাতের সুখ করতে না দাও—'

হাতের সুখ করবার এমন সুবর্ণ সুযোগও যে হাতছাড়া হয়ে যাবে, এক সেকেন্ড আগেও কি কেউ ভাবতে পেরেছিল সে কথা! ঠিক যে মুহূর্তে জনু ঘুঁষি বাগিয়ে লাফিয়ে পড়তে যাবে সামনে—

রিকশা থেকেই চিৎকার করে উঠেছে সোমনাথ, 'আরে দাঁড়াও দাঁড়াও, কী হয়েছে কী!'

কাউকে কিছু বলবার সুযোগ না দিয়েই হাঁউমাউ করে উঠেছে লোকটা, 'সোমনাথবাবু?'

'হ্যাঁ, কিন্তু আপনি—'

'শিবকালী রক্ষিত। সোদপুর, এইচ. বি. টাউন।'

মুহূর্তের অবকাশ, তারপরই রিকশা থেকে নেমে সহাস্যবদনে এগিয়ে এসেছে সোমনাথ, 'শিবকালীবাবু, তাই বলুন। আসুন আসুন।'

জনুর উদ্যত ঘুঁষি স্তব্ধ! আমরা হতবাক!! গগনদা বিমূঢ়!!!

রিকশার ভাড়া মিটিয়ে সোমনাথ গগনদার দিকে ফিরল, বলল, 'ওই শঙ্খনাদের জন্যে একটা যোগাযোগ করেছিলাম কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে। শিবকালীবাবুরই মেয়ে। তা আপনার তো মশাই সামনের রোববার আসার কথা ছিল, কোনো চিঠিপত্র না দিয়েই হঠাৎ—'

'মেয়ের বাবা, বুঝতেই পারেন! এদিকে একটু এসেছিলাম, তাই—'

'সে ভালোই করেছেন, কিন্তু কোনো ঝামেলায় পড়েননি তো! বাড়ির সামনে এতো ভিড়—'

জনু জামা থেকে পোকা ঝাড়ছে। ভোটকা অন্যদিকে তাকিয়ে আঙুল মটকাচ্ছে। গগনদা দার্শনিকের মতো আকাশের তারা গুনছে।

জামার সামনেটা কোঁচকানোই ছিল, ঘাড়ে বোধহয় খুঁচি নড়ে গিয়েছিল। সেটা দুটো-একটা হ্যাঁচকা মেরে ঠিক করতে করতে কাষ্ঠ হাসি হাসলেন শিবকালী, বললেন, 'তেমন কিছু না, ওই একটু আলাপ করেছিলাম আর কী ওদের সঙ্গে। হীরের টুকরো ছেলে তো সব—'

ছবি : জুরান নাথ

গল্প হলেও সত্যি

তড়িৎ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

[ইংরেজিতে বলে টার্নিং পয়েন্ট। বাংলায় সন্ধিকাল অর্থাৎ মানুষের জীবনের মোড় ঘুরে যাবার মুহূর্ত। জীবনে বহু ঘটনা ঘটে—নানা মানুষ, নানা সাধু বা সাধিকার জীবনে, যেগুলি সাধারণ হলেও অসাধারণ হয়ে অনেক মানুষের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। সেই রকমই কিছু ঘটনা তুলে ধরা হচ্ছে গল্প হলেও সত্যি শিরোনামে।]

হিম্মতলাল

আখড়ার সব সাধুই ঘুমে অচেতন কিন্তু হিম্মতলালের ঘুম নেই। হিম্মতলালের বয়স দশ বছর হবে। তার গ্রাম থেকে সাধুরা তাকে চুরি করে নিয়ে এসেছে তাদের আখড়ায়। হিম্মতলাল ভাবতে লাগল, এই সুযোগে পালালে হয়। আবার ভাবল, যদি সাধুরা তার পিছু ধাওয়া করে? ধরে ফেললে হয়তো তাকে মেরেই ফেলবে। হিমালয়ের পথঘাট তার অজানা। তার চেয়ে বরং ভোর হোক তারপর ভাবা যাবে। সাত-পাঁচ চিন্তার মধ্যে কয়েকজন সাধু তার ঘরে ঢুকে তাকে নিরীক্ষণ করে গেল। হিম্মতলাল বুঝতে পারল যে, সত্যিই সাধুরা তাকে আড়াল থেকে লক্ষ্য করছে।

ক্রমে আলো ফুটল। বনের পাখিদের ডাকে হিম্মতলালের ঘুম ভেঙে গেল। যেই না ভাঙা, অমনি সে আখড়া থেকে বেরিয়ে দৌড় দিল। উদ্দেশ্যহীনভাবে পাহাড়ী পথে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াতে লাগল সে। মাঝে মাঝে পিছন ফিরে দেখে কেউ তাকে ধাওয়া করে আসছে কিনা। কিছুক্ষণ দৌড়ানোর পর সে একটা জীর্ণ কুটিরের সামনে হাজির হলো। তেষ্টায় তার ছাতি ফেটে যাচ্ছে। হিম্মতলাল ভাবল কুটিরের মালিকের কাছে গিয়ে একটু জল চাইবে। কিন্তু কুটিরে ঢুকে দেখল মুমূর্ষু এক বৃদ্ধের শিয়রে বসে এক তরুণ সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী হিম্মতকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি চাই বাবা? হিম্মত বলে, একটু জল দেবেন? বড় পিপাসা পেয়েছে। সন্ন্যাসী আবার প্রশ্ন করেন, এত সকালে তুমি কোথা থেকে আসছ? হিম্মত দৃঢ়তার সঙ্গে বলে, আমাকে ঐ পাহাড়ের সাধুরা চুরি করে নিয়ে এসেছে। আমি লুকিয়ে পালিয়ে এসেছি।

সন্ন্যাসীটি হিম্মতকে সস্নেহে কাছে ডাকেন। কিন্তু হিম্মতের ভয় হয়। সন্ন্যাসী তা বুঝতে পেরে নিজেই হিম্মতের কাছে যান এবং তাকে জল দেন। হিম্মত সন্ন্যাসীর দেওয়া জল পান করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করে, এই বুড়ো লোকটা আপনার কে হন? সন্ন্যাসী বলেন, ও কেউ হয় না। গতকাল রাতে আমিও পিপাসার্ত হয়ে এই কুটিরে আসি। এসে দেখি বৃদ্ধ মুমূর্ষু। আর যেতে পারলাম না।

পরক্ষণেই সন্ন্যাসী বলেন, তোমার বাড়ি কোথায়? হিম্মত বলে, লিমডিতে। সন্ন্যাসীর পাল্টা প্রশ্ন, তুমি কি একা একা বাড়ি ফিরতে পারবে? হিম্মত ইতস্তত করে। তখন সন্ন্যাসী বলেন, তুমি একটু অপেক্ষা কর। আমি তোমার পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে দেব।

হিম্মতলাল সন্ন্যাসীকে বিশ্বাস করে বসে। কিছুক্ষণের মধ্যে সেই বৃদ্ধের প্রাণবায়ু বেরিয়ে যায়। সন্ন্যাসী বললেন, বাবা, বৃদ্ধ ইহজগৎ ছেড়ে চলে গেল। তখন সেই সন্ন্যাসীই বৃদ্ধের মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে গেলেন এবং তাঁর দেহ সৎকারের ব্যবস্থা করলেন। তারপর তিনি হিম্মতলালকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর আশ্রমের দিকে যাত্রা করলেন। পথ পরিক্রমায় হিম্মতলালের শরীর ক্লান্ত। তারা যখন সন্ন্যাসীর আশ্রমে পৌঁছাল তখন প্রায় সন্ধ্যা।

হিম্মতকে স্নান-আহার সেরে বিশ্রাম নিতে বললেন সন্ন্যাসী। আশ্রমে পৌঁছানোর কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি একটি বাক্স হাতে আবার কোথায় বেরিয়ে গেলেন। হিম্মতলালের সেই সন্ন্যাসীর ঘরেই থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। সারা দিনের ক্লান্তি আছে। তবু সে ঘুমাতে পারছে না।

সন্ন্যাসীর ফিরতে রাত হয়ে গেল। এসেই তিনি হিম্মতের খবর নিতে এলেন।

সন্ন্যাসী ঘরে ঢুকতে হিম্মত জিজ্ঞাসা করে, আপনি কোথায় গিয়েছিলেন? সন্ন্যাসী বলেন, ঐ গাঁয়ে। ওরা খুব গরীব। ওদের কেউ অসুস্থ হলে আমাকে ডাকতে আসে। আমি যাই, সাধ্যমতো ওষুধ দিই। তুমি ঘুমিয়ে পড়। সকালে তোমার বাড়ির দিকে রওনা দেব।

সকাল হলো। হিম্মতও তৈরি হয়ে নিল। আশ্রমে তখন প্রার্থনা সঙ্গীত চলছে। হিম্মত আশ্রমের ঠাকুরঘরে হাজির হলো। সেখানে প্রার্থনারত ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীদের দেখে তার খুব ভাল লাগল। সেখান থেকে ফিরে এসে সে সেই সন্ন্যাসীকে বলল, মহারাজ, আমি এই আশ্রমে থাকব। সন্ন্যাসী বিস্ময়ে বলে উঠলেন, সেকি রে! তুই তোর বাড়ি যাবি না? বাবা-মা কত কাঁদছে তোর জন্য। হিম্মত বলে, না। আমাকে জোর করে পৌঁছে দিয়ে এলেও আমি পরে চলে আসব।

হিম্মত আশ্রমে থেকে গেল। ঐ সন্ন্যাসী তার পড়াশোনার ব্যবস্থা করলেন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমের নানা রিলিফের কাজে হিম্মত যেতে লাগল। এক সময় সেও হয়ে উঠল ঐ আশ্রমের এক সন্ন্যাসী।

একদিন লিমডিতে ভূমিকম্পের রিলিফের কাজে তাকে আসতে হলো তার জন্মভূমিতে। আশ্রমের ত্রাণশিবির খোলা হয়েছে। আহতদের আনা হচ্ছে সেখানে। তাদের চিকিৎসার দায়িত্বে হিম্মত ওরফে স্বামী আনন্দ। হঠাৎ এক আহত বৃদ্ধ শিবিরে হাজির হলে হিম্মত ছুটে যায়। তাঁকে যত্ন করে শোয়ায় এবং সেবাযত্নে সুস্থ করে তোলে। কয়েক দিন থাকার পর বৃদ্ধ শিবির ছেড়ে যাওয়ার সময় স্বামী আনন্দের খোঁজ নেন। স্বামী আনন্দ হাজির হয় তাঁর সামনে। সে বৃদ্ধকে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিতে গেলে বৃদ্ধ শিউরে ওঠেন। তখন স্বামী আনন্দ বলে, বাবা, আমি হিম্মত, আশীর্বাদ করুন যেন সেবার আদর্শে অবিচল থাকি। বৃদ্ধের দু'চোখ বেয়ে বয়ে চলে আনন্দধারা।

তথ্যসূত্র : ডিকশনারি অফ ন্যাশানাল বায়োগ্রাফি, ভলিউম ১, পৃঃ ৫৫-৫৬।

দাদুমণির চিঠি

শুকতারার বন্ধুরা,

ভালো আছো তো সকলে?

শুকতারার নতুন বছর শুরু হলো এই মাস থেকে। ৫৫ বছরে পা দিলো তোমাদের প্রিয় পত্রিকা। শুকতারা তার বন্ধুদের জানাচ্ছে নতুন বছরের প্রীতি, শুভেচ্ছা আর অভিনন্দন। নতুন বছরে শুকতারা আরও ভালো, আরও সুন্দর হবে, তোমরা যা চাও—সব পাবে।

সে যাই হোক, শীত শেষ হয়ে গেল। বসন্ত দ্বারে কড়া নাড়ছে। শীতের রুক্ষতা কাটিয়ে প্রকৃতি আবার নিজেকে সাজাতে বসেছে। আম গাছে বোল ধরেছে। তার মিষ্টি গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসে। শিমুল, পলাশ, মাদার ফুল ফুটবে ফুটবে করছে। আর কিছুদিনের মধ্যেই কৃষ্ণচূড়া গাছগুলো লালে লাল হয়ে যাবে। রাধাচূড়ায় ঝুলছে হলুদ ফুলের ঝুরি। গাছের পাতার আড়ালে বসে কোনো অলস দুপুরে হঠাৎ ডেকে উঠবে কোকিল। এই মাসেই তো দোল হয়ে থাকে। এই সবের মধ্যে তারই তোড়জোড়। রোদের তেজ বেড়ে গেছে। তবু সকাল-সন্ধ্যেয় একটু শিরশিরে ভাব। এই সময়টা তোমরা একটু সাবধানে থেকো। বড্ড অসুখ-বিসুখ করে। এখন তো সন্ধ্যের পর আকাশ পরিষ্কার। এই মাসের আকাশটা চিনে নাও। ছায়াপথ আছে আকাশের উত্তর-পশ্চিম কোণে। উত্তর-পূর্ব আকাশে দেখতে পাবে সপ্তর্ষিমণ্ডলকে। মীন রাশি পশ্চিম আকাশ থেকে ধীরে ধীরে চোখের আড়ালে চলে যাচ্ছে। পুব আকাশে দেখতে পাবে সিংহ রাশিকে। সিংহ রাশির উত্তর-ফাল্গুনী ও পূর্ব-ফাল্গুনী নক্ষত্রের নাম থেকেই এ মাসের নাম ফাল্গুন।

অনেকদিন তোমাদের বাগান বা টবের গাছের খোঁজ নেওয়া হয়নি। কত বড় হলো সব গাছ-টাছগুলো? ফুল ফুটেছে? গাঁদা, চন্দ্রমল্লিকা খুব ফুটেছে তাই না! আর গোলাপ? সব খবর দেবে। আর গাছ-গাছালির যত্ন করবে। গাছ আমাদের সব থেকে বড় বন্ধু। দূষিত কার্বন ডাই-অক্সাইড টেনে নিয়ে আমাদের অক্সিজেন দেয়। গরমের সময় ছাতার মতো ছায়া দেয়। পাতা নেড়ে ঝিরঝিরে হাওয়া দিয়ে আমাদের সব ক্লান্তি দূর করে দেয়। সেই বন্ধুদের দিকটা তো আমাদের দেখা উচিত। তাই না?

এবার তোমাদের চিঠির উত্তর দেওয়া যাক। জানি তোমরা সকলে চিঠির উত্তর সময় মতো পাও না বলে দাদুমণির ওপর রাগ করো। দাদুমণি তো সকলের চিঠির উত্তর দিতে চায়। কিন্তু জায়গা কই! থাক ওসব কথা।

শারদীয়া মিত্র (প্রযত্নে—সঞ্জয় মিত্র, পলতা জলকল, ব্যারাকপুর)

উত্তর ঃ পুজোর সময় মা দুর্গার হাতের অস্ত্রগুলো শুকতারার লেখার সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছো জেনে খুব ভালো লাগছে। তোমাদের পাতা তো তোমারও পাতা। তাই না।

সহেলী সেনগুপ্ত (বি-৫/১৬০, কল্যাণী, নদীয়া-৭৪১ ২৩৫)

উত্তর ঃ তোমার যা মনে হবে তাই আঁকো না। ভালো হলেই ছাপা হবে। বাঁটুলকে সবাই ভালোবাসে। শুধু বিচ্ছু দুটো বাদে।

শম্ভু সরকার (গ্রাম ও পোঃ-বাকুলিয়া, জেলা-হুগলী-৭১২ ৫১২)

উত্তর ঃ শারদীয়া শুকতারা তোমার ভালো লেগেছে জেনে আমরা উৎসাহিত হয়েছি। নতুন সংযোজন 'ধাঁধা হেঁয়ালি খামখেয়ালি' তোমার দারুণ লেগেছে—অনীশ দেবকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। যে কেউ যে কোনো ভাবে চিঠি, গল্প, কবিতা ইত্যাদি পাঠাতে পারেন। শুকতারা আষাঢ় আর কার্তিক মাসে ভৌতিক সংখ্যা হয়। এবার কার্তিক মাসে পুজো সংখ্যা হওয়ায় অগ্রহায়ণ মাসে ভৌতিক সংখ্যা বেরিয়েছিল। 'বাঁটুল দি গ্রেট' দুটো পেয়ে সবাই খুশি হয়েছে। যে ঠিকানায় চিঠি পাঠিয়েছো ঐ ঠিকানাতেই গল্প পাঠাতে পারো।

কমলেশ কুমার (একাদশ শ্রেণী, বৈদ্যপুর রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠ)

উত্তর ঃ তোমার পাঠানো নববর্ষের কার্ড পেয়েছি। খুব সুন্দর কার্ড। ভালো থেকো।

অমিত কুমার রায় (প্রযত্নে-পি.সি. রায়, গ্রাম-বিনলা, পোঃ-থলিয়া, জেলা-হাওড়া-৭১১ ৪০১)

উত্তর ঃ পুজো সংখ্যা খুব ভালো লেগেছে জেনে আমরা খুশি হয়েছি। তুমি অনেককে চিঠি দিয়েছো—কেউ উত্তর দেয়নি। এমনটা তো হবার কথা নয়। শুকতারার বন্ধুরা তো এমন নয়। দেখো হয়তো তোমার চিঠি পৌঁছয়নি। আবার লেখো। আমাকেও জানিও।

শুভঙ্কর চক্রবর্তী (গ্রাম-তামালতলা, পোঃ-আজিমগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ-৭৪২ ১২২)

উত্তর ঃ এই দেখো চিঠির উত্তর পেলে। আর অভিমান নেই তো! শুকতারার বন্ধুদের তুমি চিঠি দাও, দেখবে তারাও তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে।

আজ তাহলে এই পর্যন্তই। ভালো থেকো সকলে। অনেক আদর আর ভালোবাসা নাও। জয়হিন্দ।

—তোমাদের দাদুমণি

তোমাদের পাতা

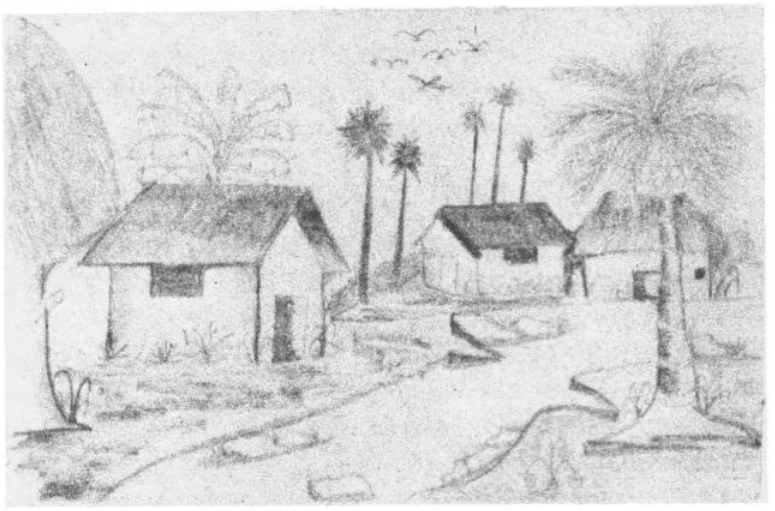

চন্দ্রকান্ত দত্ত, বয়স দশ, চতুর্থ শ্রেণী, লতাপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়, পুরুলিয়া

বসন্তের উৎসব

শীত এল, শীত গেল
বসন্ত এল ঘরে,
সকালবেলা কোকিল পাখি
কুহু কুহু গান করে।

বসন্তকালে দোলযাত্রা,
সবার গায়ে রং,
কেউ আবার সং সেজে
দেখায় নানা ঢং।

বিকেলবেলা আবিরখেলা
মাথা রঙে ভর্তি,
মা-বাবারাও আবির খেলে
সবার মনে ফুর্তি।

ধীরে ধীরে বসন্ত যায়
গ্রীষ্ম আসে ঘরে,
সবাই করে অপেক্ষা
কখন বসন্ত আসবে ফিরে।

অনিন্দিতা বসাক,
বয়স দশ, পঞ্চম শ্রেণী,
করিমপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়,
নদীয়া

পাতাল রেল

মাটির নিচে সাঁই-সাঁই-সাঁই
ছুটছে পাতাল রেল!
আয়রে খোকা, আয়রে খুকু
দেখবি কি তার খেল!
চল না দেখি কেমন করে
পেটের ভেতর মানুষ ভরে
বাজিয়ে বাঁশি ছুটছে জোরে
হার মানে সব 'মেল'!
মাটির নিচে সাঁই-সাঁই-সাঁই
ছুটছে পাতাল রেল!

মাটির নিচে সাঁই-সাঁই-সাঁই
ছুটছে পাতাল রেল!
উপরে আর যায় না চলা
লাইফ হলো হেল!
উপরে রোজ একই খেলা
বাস-মিনিবাস, টেম্পো-ঠেলা
ধুঁকছে জ্যামেই সারা বেলা
হয় বুঝি হার্টফেল!
মাটির নিচে সাঁই-সাঁই-সাঁই
ছুটছে 'পাতাল রেল'!

দেবশঙ্কর বণিক চৌধুরী, বয়স চোদ্দ, নবম শ্রেণী,
বিজয়গড় বিদ্যাপীঠ উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুল, কলকাতা-৩২

শীতের শুরু

শীতের শুরু বলতে গেলে
ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া,
গরম জামা পরা আর—
খিচুড়ি রেঁধে খাওয়া।
পরীক্ষা তো শেষ এবার
যাওয়া কোথায় যায়?
বললে পরে বড়রা সব
ধমক দেয় হায়।

শিউলির দিন শেষ, গাঁদায়
করছে বাগান আলো,
যে যাই বলো সময়টা মোর
লাগে **খুবই ভালো**।

সুমিতা ভট্টাচার্য,
বয়স তেরো, অষ্টম শ্রেণী,
কামাখ্যা বিদ্যালয়,
গুয়াহাটি, অসম

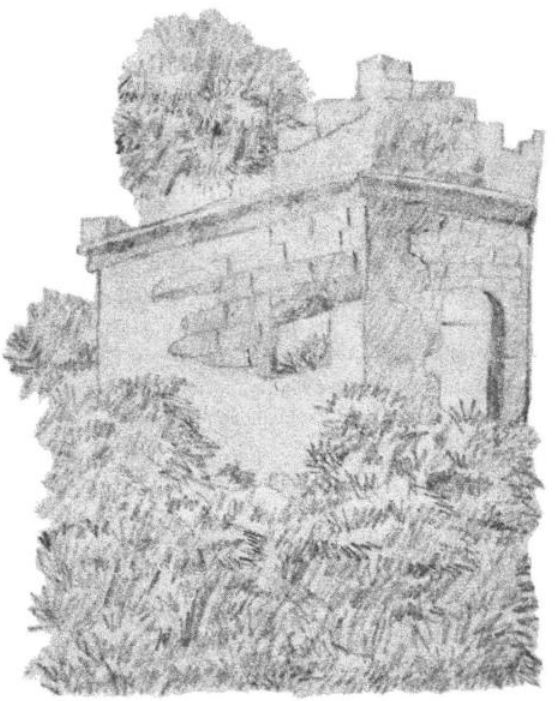

অনামিকা মজুমদার, বয়স নয়, চতুর্থ শ্রেণী,
বর্ধমান পৌর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

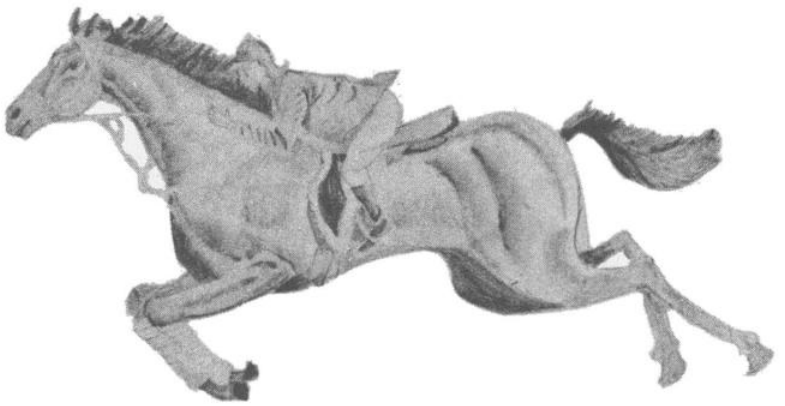

নবমিতা রায়, বয়স ষোল, একাদশ শ্রেণী, ডায়াসেশন গার্লস স্কুল, কলকাতা

মন করে আনমনা

মেঘ পরীরা নিয়েছে ছুটি
কাজ নেই আজ ওদের
সবুজ পাতা রুক্ষ বড়ই
ঘুম পেয়েছে রোদের।
লেবু, পালং, বীট ও কপির
পূর্ণ এখন ডালা
এমন দিনেই মনে পড়ে
চড়ুইভাতির পালা।
শূন্য এখন ফুলের বাগান
নেই তো ডাকাডাকি
কোন সুদূরে গেছেই উড়ে
ছোট্ট তাতার পাখি!
সকাল বেলায় চোখে পড়ে
ক্ষুদ্র শিশিরকণা
হাজার খুশি হৃদয় জুড়ে
মন করে আনমনা!!

কমলেশ কুমার,
বয়স ষোল, একাদশ শ্রেণী,
বৈদ্যপুর রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠ,
বর্ধমান

টাইগার

চন্দনের ছ' বছরের জন্মদিনে চন্দনের মেসো তাকে একটি সুন্দর বাচ্চা অ্যালসেশিয়ান প্রেজেন্ট করলেন। সেইসময় চন্দনের মায়ের কিছুটা আপত্তি থাকলেও পরে তা দূর হয়ে যায়। চন্দন কুকুরটির নাম রাখল টাইগার। টাইগারকে দেখতে খুব সুন্দর। বাচ্চাটা ক্রমে ফ্ল্যাটের সবার প্রিয় হয়ে উঠল। সে আপন মনে একটা লাল বল নিয়ে খেলা করত।

টাইগারের খাওয়া খুব বেশি নয়। সকালবেলায় দুধ-বিস্কুট খেয়ে চন্দনের সঙ্গে পার্কে ঘুরে আসে। দুপুরবেলায় খায় ভাত আর মাংস। আবার বিকেলবেলায় দুধ বিস্কুট খেয়ে চন্দনের সঙ্গে মাঠে যায়। রাত্রে খায় ভাত আর মাংস। এখন ওর বয়স পাঁচ। তাই ওর একটি জন্মদিন করা হলো। ফ্ল্যাটবাড়ির সবাইকে নেমন্তন্ন করা হয়েছিল। এই পাঁচ বছরেই ওর চেহারা দুর্দান্ত হয়েছে।

এবার ওর একটা কীর্তির কথা বলি। রাত তখন দুটো কি তিনটে। এমন সময় চারটে চোর ঢুকল চন্দনদের ফ্ল্যাটে। টাইগার চোরগুলোর উপস্থিতি টের পেয়ে গেল, ফলে ও খুব জোরে চিৎকার করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে গেল চন্দনের। সে পাশে রাখা খিলটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল। চন্দন প্রচণ্ড সাহসী, বুদ্ধিমান ও ক্যারাটে জানা ছেলে।

চন্দন এসে দেখে টাইগার অন্ধকারের মধ্যে তিনটে চোরকে কুপোকাত করে ফেলেছে। ওদের সর্দারের হাতে বন্দুক। টাইগার রাগে গর্-গর্ করতে করতে চন্দনের বাঁ-পাশে দাঁড়াল। যেই সর্দার চন্দনকে টিপ করে মারতে গেছে অমনি টাইগার ঝাঁপিয়ে পড়ল চন্দনের ওপর। ফলে গুলি গিয়ে লাগল টাইগারের পায়ে। টাইগার বিকট চিৎকার করে উঠল। চন্দন দেরি না করে ক্যারাটের স্টাইলে লাফিয়ে উঠে সর্দারের মুখে মারল এক লাথি। ততক্ষণে বাড়ির অন্য লোকেরা এসে চারটে চোরকে ধরে ফেলেছে। ওঁদের মধ্যে একজন ছিলেন দারোগা, তিনি চোরগুলোকে গ্রেফতার করলেন। টাইগারের সৌভাগ্য ফ্ল্যাটবাড়ির চারতলায় এক পশুর ডাক্তার ছিলেন। তিনি সাবধানে গুলি বার করে ভাল করে পায়ে ব্যান্ডেজ করে দিলেন। ঈশ্বরের অশেষ করুণায় টাইগার এখন ভাল হাঁটতে, দৌড়াতে ও খেলতে পারছে।

শাক্য সিংহ,
বয়স তেরো, অষ্টম শ্রেণী,
কৃষ্ণনাথ কলেজ স্কুল,
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

অচ্যুত পাল, বয়স বারো, সপ্তম শ্রেণী, নারায়ণ দাস বাজুর মেমোরিয়াল মাল্টিপারপাস স্কুল, কলকাতা

বিষয় ঃ বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে ভারতের স্থান ঃ হিন্দু স্কুল, কলকাতা

আমরা বলছি

[বিদ্যালয়-পরিচিতি—হিন্দু স্কুল কলকাতার অন্যতম প্রাচীন শিক্ষায়তন। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রথম প্রতিষ্ঠা হয় ১৮১৭ সালের ২০ জানুয়ারি। অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে এই বিদ্যালয়ের পথপরিক্রমা আজও অব্যাহত। ব্রিটিশ শাসকদের দীর্ঘ শাসনকালে এদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রসারের প্রয়োজনে হিন্দুরা আগ্রহী হয়ে উঠলে, রাধাকান্ত দেবের সাহায্যে ডেভিড হেয়ার একটি ইংরেজি স্কুল স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু এই স্কুল বাঙালীদের শিক্ষার চাহিদার অনুপাতে যথেষ্ট ছিল না। সেকথা মাথায় রেখে রাজা রামমোহন রায়, বর্ধমানের মহারাজা, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, রসময় দত্ত, রাধাকান্ত দেব প্রমুখ বিদগ্ধ ব্যক্তিত্ব হিন্দু পরিবারের ছেলেদের জন্য একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেন। এইভাবে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৫৪ সালের ১৫ জুন হিন্দু কলেজ বর্তমানে প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপ পায় আর জুনিয়র বিভাগটি হিন্দু স্কুল নামে অভিহিত হয়। একসময় এই বিদ্যালয়কে 'বাংলার ইটন' বলা হতো।—হরিসাধন চন্দ।]

প্রথম

অধ্যয়ন ব্যতীত নাচ, গান, খেলাধূলা, অঙ্কন, চারুকলা সমস্ত কিছুই শিক্ষার্থীর চিত্তচাঞ্চল্যের কারণ—এরূপ ভ্রান্ত ধারণার অবসান হয়েছে। শিক্ষার্থীকে মনে-প্রাণে সর্বাঙ্গীণভাবে গড়ে তুলতে অধ্যয়নের সমান্তরালে এসেছে খেলাধূলার প্রয়োজনীয়তা। এর ফলে একদিকে অধ্যয়নের সংস্পর্শে বুদ্ধিবৃত্তির সমূহ বিকাশ সাধন হয়, অপরপক্ষে শরীরচর্চা, সময়নিষ্ঠা, নিয়মানুবর্তিতা, সপ্রতিভতা, সৌভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে ওঠে। তাই শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক অর্থাৎ সার্বিক বিকাশে খেলাধূলার ভূমিকা অপরিহার্য। পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত রাষ্ট্রে এইরূপে শিক্ষাদানে সুফল লক্ষ্য করা গেছে। শিক্ষার্থীরাও নিজেদের প্রতিভার সুবিচার করার সুযোগ পাচ্ছে।

খেলাধূলার মাধ্যমে মানুষের হৃদয়ের মেলবন্ধন ঘটে। পৃথিবীতে শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি হয়। তাই রয়েছে বিভিন্ন ক্রীড়াঙ্গনের আসর। সেই আসরগুলিতে বিশ্বের উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলি বরাবরই নিজেদের সুনাম অক্ষত রেখে এসেছে। বহু ক্ষুদ্র রাষ্ট্রও তাদের পাশে নিজেদের নাম যুক্ত করেছে। কিন্তু ১০০ কোটি মানুষের দেশ ভারতবর্ষের গরিমা খেলাধূলাতে এখনও ম্লান। বিশ্বক্রীড়া প্রতিযোগিতাগুলির আসরে আমাদের ব্যর্থতা ও অনগ্রসরতার চিত্র বড়ই করুণ। ওলিম্পিকে ব্যক্তিগত ইভেন্টে গত ৪৪ বছরের খরা অব্যাহত থাকত যদি না ১৯৯৬ আটলান্টা ওলিম্পিকে লিয়েন্ডার পেজ অগাধ মনোবল এবং অসীম ধৈর্যের সঙ্গে লড়াই করে টেনিসে ব্রোঞ্জ না জিততে পারতেন। ২০০০-এ সিডনি ওলিম্পিকে অবশ্য কর্ণাম মালেশ্বরী মহিলাদের ওয়েট লিফটিংয়ে ব্রোঞ্জজয়ী হয়ে ভারতের মুখোজ্জ্বল করেন। কিন্তু ১০০ কোটি ভারতবাসীর কাছে বিশ্ব ক্রীড়াজগতের কি এটাই প্রত্যাশা যেখানে সুরিনামের মতো ক্ষুদ্র দারিদ্র্যপীড়িত দেশ ব্যক্তিগত ইভেন্টে (সাঁতার) ৪টি স্বর্ণপদক লাভ করে? দলগত ইভেন্টে অতীতে ওলিম্পিক হকিতে ভারত বেশ কয়েকবার সাফল্যের মুখ দেখলেও বর্তমানে হকিতে ভারতের নাম যত কম বলা যায় ততই মঙ্গল। গত এশিয়াডে ভারত নবম স্থান অধিকার করেছে। বঙ্গললনা জ্যোতির্ময়ী সিকদার অ্যাথলেটিকসে দুটি সুবর্ণপদক বিজয়ী হয়ে এশিয়াডে ভারতের সুনাম রক্ষা করেছেন। কবাডিতেও ভারত পরপর তিনবার সোনাজয়ী হয়েছে। কিন্তু কোরিয়া, জাপানের মতো দেশ যেখানে এশিয়াডে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে সেখানে ভারতের স্থান নবম।

ফুটবলে ভারতের ইতিহাস বড়ই বেদনাদায়ক। আন্তর্জাতিক স্তরে খেলায় একবার মাত্র মারডেকা কাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়া ছাড়া আর কোনো বিশেষ খ্যাতি ফুটবলে ভারতের সম্মানের ঝুলিতে সংগৃহীত হয়নি। বিগত ১৭ বছরের ফুটবল বিশ্বকাপের মূলপর্বে যোগ্যতা অর্জন করা তো দূর অস্ত, প্রাক বিশ্বকাপের প্রথম রাউন্ড অতিক্রম করাই ভারতের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। অথচ ক্রোয়েশিয়ার মতো যুদ্ধবিগ্রহে বিধ্বস্ত একটি দেশ ১৯৯৮ ফুটবল বিশ্বকাপে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। ক্রিকেটে ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে ভারত বিশ্বজয়ী হলেও সাম্প্রতিক ক্রিকেটে ভারতের সাফল্য অতিশয় দুর্ভাগ্যজনক—১০টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান অষ্টম। বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনের উন্মুক্ত প্রান্তরে ভারতবর্ষের মতো ঐতিহ্যবাহী দেশের অবদান কি এই হওয়া উচিত?

অনগ্রসরতার এই চরম দৃশ্য কিন্তু ভারতবর্ষের সর্বক্ষেত্রে লক্ষণীয় নয়। জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, সংস্কৃতি, চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে ভারত বরাবরই উন্নতির স্বীকৃতি রেখে চলেছে।

খেলাধূলার ক্ষেত্রে এদেশের এমন চরম পিছিয়ে পড়ার কারণ হলো খেলাধূলা সম্বন্ধে বাস্তবসম্মত ও সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও পরিকাঠামোর একান্ত অভাব। বিদ্যালয় স্তর থেকে খেলাধূলা খাতা-কলমেই সীমাবদ্ধ। খেলার মাঠে তার কোনো বাস্তব রূপায়ণ নেই। এই সম্বন্ধে উদ্যোগ বা সামর্থ্য বিত্তবানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সকল শ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়েনি। দক্ষতা থাকলেও তারা বঞ্চিত। উপরন্তু আছে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, সুষম আহার, পোশাক-পরিচ্ছদ ও দরকারী সাজসরঞ্জামের অভাব। তাই দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া ভারতবর্ষে বরাবরই প্রথম শ্রেণীর পেশাদার খেলোয়াড়ের অভাব। এছাড়া আছে সরকারী অবহেলা ও রাজনীতি। তাই ভারতে প্রতিভার স্ফুরণের পরিবর্তে তা প্রায়শই অঙ্কুরে

বিনষ্ট হয়।

তবুও আমরা আশাবাদী যে ভারত ভুলত্রুটি শুধরে নিয়ে প্রতিযোগিতায় অন্যান্য দেশের সঙ্গে পাল্লা দেবে। বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে ভারতের উজ্জ্বল প্রতিষ্ঠা দিয়ে দেশবাসীকে এনে দেবে খ্যাতি ও মর্যাদা। নতুন প্রজন্মের কাছে ভারতবাসীর এই নতুন প্রত্যাশা।

ত্রিদিবেশ দিয়ান

একাদশ শ্রেণী

দ্বিতীয়

করতালি যেমন এক হাতে বাজানো যায় না, ঠিক সেইভাবে বলা যায়, আদর্শ একজন ছাত্র তৈরি করতে হলে, কেবল পড়াশুনা দিয়ে তা করা যায় না, তাকে করতালির দুটি হাতই ব্যবহার করতে হবে। অর্থাৎ লেখাপড়ার সমান্তরাল ভাবে খেলাধূলারও প্রয়োজন আছে। নইলে পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটবে না। অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে সার্বিক বিকাশের জন্য যে খেলাধূলা অপরিহার্য তা বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত রাষ্ট্রগুলিও অনুভব করেছে।

খেলাধূলার মাধ্যমে মানুষের হৃদয়ের মেলবন্ধন ঘটে। তাই বিভিন্ন ক্রীড়াঙ্গন গঠিত হয়েছে। সেই সমস্ত স্থানে উন্নত দেশগুলি বরাবরই তাদের সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছে। এমনকি বহু ছোট ছোট দেশ যেমন ক্রোয়েশিয়া, কোরিয়া প্রভৃতি দেশও তাতে যোগদান করেছে। কিন্তু এই ১০০ কোটি মানুষের বিশাল দেশ ভারতে খেলাধূলার অবস্থা খুবই খারাপ। বিশ্বের বিভিন্ন ক্রীড়া-প্রতিযেগিতায় ভারতের অংশগ্রহণ খুবই কম দেখা যায়। ওলিম্পকেও ভারতের স্থান অনেক পিছনে। দীর্ঘ ৪৪ বৎসর ভারতের কোনো পদক নেই। শুধু ব্যর্থতা। এই খরা আরো থাকত যদি না ১৯৯৬ সালে ব্যক্তিগত ইভেন্টে লিয়েন্ডার পেজ কঠোর পরিশ্রম ও মনোবলের দ্বারা টেনিসে ব্রোঞ্জ না জয় করতেন। যদিও ২০০০-এ সিডনি ওলিম্পিকে মহিলাদের মধ্যে কর্ণাম মালেশ্বরী ওয়েট লিফটিং-এ ব্রোঞ্জ জয় করেছিলেন। কিন্তু ১০০ কোটি মানুষের দেশ এই ভারতবর্ষের কাছে বিশ্ব ক্রীড়াজগতের কি এটাই কাম্য? ১৯৮৩ সালে ভারত বিশ্বজয়ী হলেও বর্তমান ক্রিকেটে ভারতের অবস্থা অতিশয় করুণ। ক্রিকেটে দশটি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান অষ্টম। তার উপর বেটিং কেলেঙ্কারিতে ভারত কলঙ্কিত। ফুটবলেও ভারতের অবস্থা অতিশয় দুর্ভাগ্যজনক। আন্তর্জাতিক স্তরে ভারত একবার মাত্র মারডেকা কাপ জয় করেছে। এছাড়া উল্লেখযোগ্য প্রায় কোনো কিছুই করতে পারেনি। বিশ্ব ফুটবল ক্রীড়ায় অংশগ্রহণ তো দূরের কথা, প্রাক-বিশ্বকাপের মূলপর্বেই যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। দলগত ইভেন্টে অতীতে ওলিম্পিকে বেশ কয়েকবার সাফল্য লাভ করলেও বর্তমানে হকিতে ভারতের স্থান অত্যন্ত বেদনাদায়ক। গত এশিয়াডে ভারত নবম স্থান অধিকার করেছিল। জ্যোতির্ময়ী সিকদার অ্যাথেলেটিকসে দুটি স্বর্ণপদকজয়ী হয়েছেন। মুষ্টিযুদ্ধেও ভারত একবার কৃতিত্ব দেখিয়েছে। কিন্তু ভারতের মতো ঐতিহ্যবাহী দেশের বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে কি এই অবদান হওয়া উচিত?

অর্ণব পালুই

নবম শ্রেণী

নানা স্বাদের বই

নীহাররঞ্জন গুপ্তর

কিরীটী ৪ ৪০.০০

৪টি রুদ্ধশ্বাস গোয়েন্দা কাহিনী এক সঙ্গে (নিশির ডাক, রক্তমুখী ড্রাগন, রাতের আতঙ্ক ও বিষের তীর)

সাদা কালো ৫৫.০০

আশাপূর্ণা দেবীর

গল্প ভালো আবার বলো ৪০.০০

শিবরাম চক্রবর্তীর

যত হাসি ততই মজা ৪০.০০

হাসির চোটে দম ফাটে ৫২.০০

হাসির ফোয়ারা ৪৫.০০ **হাসির টেক্কা** ৫৫.০০

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কেল্লা রহস্য ২০.০০ **সুড়ঙ্গ রহস্য** ২০.০০

ভাঙা বাড়ির রহস্য ২০.০০ **জঙ্গল রহস্য** ১৮.০০

ফর্মুলা রহস্য ২২.০০ **যাদুঘর রহস্য** ২৫.০০

বাতিঘর রহস্য ২৫.০০ **পাতালঘর রহস্য** ২০.০০

তীরন্দাজ ১৮.০০ **মুখোশ** ১৬.০০

চিত্তরঞ্জন মাইতির

রুরু ৩৫.০০

ডাঃ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর

ফাঁসি ২৫.০০ **অপারেশন এক্স** ৩০.০০

সুভাষ ধরের

বুদ্ধমূর্তির সন্ধানে ৩০.০০

রাধারমণ রায়ের

রণডাকাত ২৬.০০

দিলীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের

দুর্গ পাহাড়ে বন্দী ২০.০০

ভূতের গল্প

গৌরী দের

রোমাঞ্চকর ভূতের গল্প ২৪.০০ **ভূতেরা ভয়ঙ্কর** ২৬.০০

গা ছমছমে ভূতের গল্প ২২.০০

মানবেন্দ্র পালের

অশরীরী আতঙ্ক ৩৫.০০ **আতঙ্ক** ৩৫.০০

শিশির কুমার মজুমদারের

অমাবস্যার রাতে ২৫.০০

দেব সাহিত্য কুটীর সম্পাদিত

রাক্ষস খোক্কস ৪৫.০০ **ভূত পেত্নী রক্তচোষা** ৪০.০০

ভূত পেত্নী দত্যিদানা ৪৫.০০

অদ্ভুত যত ভূতের গল্প ২৬.০০

★ বিস্তারিত পুস্তক তালিকার জন্য লিখুন

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড

২১, ঝামাপুকুর লেন কলকাতা-৯

হাঁদা-ভোঁদার

উটকো বিপত্তি

এই, দ্যাখ্ তোকে ধরার জন্যে তোর ছবি দেওয়া পোস্টার সেঁটে বেড়াচ্ছি আর দশহাজার টাকা পুরস্কার সমেত তুই একেবারে আমার হাতের কাছে বসে আছিস।
লে হালুয়া! দেখতে আমি বটে কিন্তু ওর তো গোঁফ আছে!
সন্ধান চাই
তালা ভাঙা বিশারদ
সন্ধান দিলে দশহাজার টাকা পুরস্কার
গোঁফ তুলে ফেলতে কতক্ষণ, কালুয়া!
কিন্তু আমি তো কালুয়া নই।
নামে কি যায় আসে চেহারাই তো আসল। তোকে ধরার বাহাদুরী আর সঙ্গে পুরস্কারের দশহাজার টাকা আমার মুঠোর মধ্যে।
কিন্তু আমি ওকে প্রথম দেখেছি হাবিলদার সাহেব!
প্রথম দেখেছো তো কি হয়েছে, ওকে ধরেছি তো আমি।
কিন্তু আমি না দেখলে আপনি ধরতেন কি করে?
চ্যালার সঙ্গে দশহাজারের লড়াই বেঁধেছে, হাঁদা! যদি রেহাই পেতে চাস তো চল এই মওকায় সটকে পড়ি।
এবার দৌড়ে এই তল্লাট ছেড়ে চল, হাঁদা!
ভাগ্যিস ওদের মধ্যে পুরস্কার নিয়ে লড়াই হলো।
পরে-
তোকে কালুয়া বানিয়ে ফেলেছিলো আর কি। কিন্তু পুরস্কারটা তোকে বাঁচিয়ে দিলো, হাঁদা!
সন্ধান চাই
তালা ভাঙা বিশারদ
সন্ধান দিলে দশহাজার টাকা পুরস্কার
সত্যি, আমার চেহারা নিয়ে তালা ভাঙা কালুয়া আসার আর জায়গা পেলো না।

দুই বন্ধুর কাহিনী

সত্যপ্রিয় নন্দী

ঝুরী মালীর দুই বলদের নাম হীরা আর মোতি। দুটিই ভালো জাতের—দেখতে সুন্দর, কাজে চৌখস, হৃষ্টপুষ্ট শরীর। অনেকদিন একসঙ্গে থাকতে থাকতে দু'জনের মধ্যে ভাই-ভাইয়ের বন্ধুত্ব। দু'জনে পাশাপাশি শুয়ে-বসে নিজেদের মধ্যে মূক ভাষায় সুখ-দুঃখের আলোচনা করে। একে অন্যের মনের কথা কেমন করে জানতে পারে তা বোঝা মুশকিল। নিশ্চয়ই ওদের এমন কোনো গুপ্ত শক্তি আছে যা জীবশ্রেষ্ঠ মানুষের নেই। দু'জনে ওরা পরস্পরের গা চেটে আর শুঁকে নিজেদের ভালোবাসার পরিচয় দেয়। কখনও কখনও দু'জনে শিং-এ শিং লাগিয়ে একটু ঠেলাঠেলি করে—লড়াই-এর জন্য নয়, আনন্দ আর আত্মীয়তার পরিচয় দিতে। আমাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা যেমন দেখা হলে পরস্পরের মধ্যে চড়থাপ্পড় মেরে আনন্দ প্রকাশ করে সেইরকম।

যখন এই দুই বলদকে লাঙ্গলে বা গাড়িতে জোতা হয় আর ওরা ওদের শরীর দুলিয়ে-দুলিয়ে হাঁটে তখন ওদের দু'জনেরই চেষ্টা থাকে যেন তার নিজের ঘাড়ে বোঝাটা বেশি করে পড়ে। দুপুর বা সন্ধ্যায় যখন কাজ থেকে ওরা ছুটি পায় তখন দু'জনে দু'জনের গা চেটে নিজের নিজের ক্লান্তি মেটায়। জাবনার ডাবায় বিচালি আর খোলভুষি পড়লে দু'জনে একসঙ্গে খেতে শুরু করে আর একজন মুখ তুলে নিলে অন্যজনও মুখ তুলে নেয়। খাওয়া শেষ হলে দু'জনে একসঙ্গে শুয়ে পড়ে। এমনি ওদের দোস্তি।

বিশেষ কোনো কারণে ঝুরী বলদ দুটিকে দিন কয়েকের জন্য তার শ্বশুরবাড়িতে পাঠাল। বলদ দুটি আর কেমন করেই বা জানবে যে কেন ওদের পাঠানো হচ্ছে। ওরা ভাবল মালিক ওদের বিক্রি করে দিয়েছে। এমনভাবে ওদের বেচে দেওয়া ওদের একেবারেই ভালো লাগেনি। তাই ওদের দু'জনকে নিয়ে যেতে ঝুরীর শালা গয়ার দম বেরিয়ে গেল। পিছন থেকে তাড়া দেয় তো ওরা সামনে না গিয়ে ডাইনে-বাঁয়ে ছুটতে থাকে। গলার দড়ি ধরে সামনের দিকে টানে তো ওরা পা দাবিয়ে পিছনের দিকে জোর দেয়। লাঠির বাড়ি মারে তো ওরা দু'জনে শিং নিচু করে গোঁ গোঁ ডাক ছেড়ে তেড়ে আসে। ঈশ্বর যদি ওদের ভাষা দিতেন তাহলে ওরা ঝুরীকে জিজ্ঞাসা করত, 'তুমি আমাদের, এই দুই গরীব বেচারীকে তাড়িয়ে দিচ্ছ কেন? আমরা তো তোমার সেবা করতে কোনো কসুর করিনি। আমাদের তাগদের বেশি কাজের যদি তোমার দরকার ছিল তাহলে আমাদের দিয়ে অন্য কাজ করিয়ে নিতে পারতে। আমরা তোমার কাজ করতে করতে মরতেও প্রস্তুত ছিলাম। আমরা কোনোদিনই খাওয়ার জন্য কোনো গোলমাল করিনি। তুমি যা আমাদের খেতে দিয়েছো তাই আমরা মাথা নিচু করে খেয়েছি। তাহলে এই নিষ্ঠুরের হাতে তুমি আমাদের বিক্রি করে দিলে কেন?'

সন্ধ্যার সময় ওরা দু'জনে নতুন জায়গায় এসে পৌঁছাল। দিনে ওদের কিছু খাওয়া হয়নি, তবু জাবনার ডাবায় যখন ওদের বাঁধা হলো ওরা কিন্তু তাতে মুখ দিল না। ওদের মন তখন ব্যথায় কাতর। যেটাকে এতদিন ওরা নিজের জায়গা বলে মনে করত সেটা চলে গেছে। এই নতুন বাড়ি, নতুন গাঁ, নতুন মানুষজন ওদের কাছে সবই যেন কেমন অন্যরকম লাগছে। দু'জনে নিজেদের মূক ভাষায় পরামর্শ করল, তারপর পরস্পর চোখের ইশারা করে শুয়ে পড়ল। যখন গ্রামের লোকেরা সব ঘুমিয়ে

পড়ল তখন ওরা দু'জনে জোরে টান দিয়ে গোঁজ থেকে দড়ি ছিঁড়ে ফেলে নিজেদের বাড়ির দিকে চলতে শুরু করল। দড়ি খুব শক্তই ছিল, ভাবা যায়নি কোনো বলদ সে দড়ি ছিঁড়তে পারে। কিন্তু ঐ সময় যেন দু'জনের শরীরে দু'গুণ শক্তি এসেছিল। জোরে একটা টান দিতেই দড়ি ছিঁড়ে গেল।

ঝুরী সকালে উঠে দেখল তার বলদ দুটি গোয়ালের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। দু'জনেরই গলায় খানিকটা করে দড়ি ঝুলছে। ওদের হাঁটু পর্যন্ত কাদা আর দু'চোখে অভিমানপূর্ণ ভালোবাসার দৃষ্টি।

ঝুরী বলদ দুটিকে দেখে স্নেহে আকুল হয়ে উঠল। সে দৌড়ে গিয়ে ওদের গলা জড়িয়ে ধরে চুমু খেল। ঝুরীর বাড়ির ও গ্রামের অন্যসব ছেলেমেয়েরা জমা হয়ে গেল আর তারা তালি বাজিয়ে ওদের স্বাগত জানাল। অভূতপূর্ব না হলেও গ্রামে এটা ছিল বিশেষ এক মহত্ত্বপূর্ণ ঘটনা। ছেলে-মেয়েরা ঠিক করল এই দুই পশুবীরকে অভিনন্দন জানানো দরকার। তারা নিজের নিজের বাড়ি থেকে কেউ রুটি, কেউ গুড়, কেউ দানা, কেউ ভুষি নিয়ে এসে ওদের উপহার দিল। কিন্তু ঝুরীর স্ত্রী বলদ দুটিকে দেখে জ্বলে উঠল। বলল, 'কিরকম নেমকহারাম দেখেছো! ওখানে একদিনও কাজ করল না। পালিয়ে এল।'

নিজের বলদের ওপর এরকম অভিযোগ শুনতে ঝুরীর খারাপ লাগল। সে প্রতিবাদ করে বলল, 'নেমকহারাম হবে কেন? ওদের বোধহয় ওরা খেতে-টেতে দেয়নি তাই—'

স্ত্রী ঝেঁঝে উঠল, 'থামো, তুমি শুধু হেলেদের (চাষের বলদ) খাওয়াতে জানো, আর অন্য সবাই জল খাইয়ে রেখে দেয়!'

ঝুরীও রেগে বলল, 'খেতে পেলে পালাবে কেন?'

'পালাবে কেন? তুমি বুদ্ধুর মতো যেমন করো, ওরা তো তেমন হেলেদের গায়ে হাত বোলায় না। ওরা খাওয়ায় আর কষে কাজও আদায় করে। এ দুটো এক নম্বর কুঁড়ে কামচোর। তাই পালিয়ে এসেছে। এবার ওরা দেখুক দানাভুষি কেমন পায়! শুকনো বিচুলি ছাড়া ওদের আর কিচ্ছু দেব না। খায় খাক না হয় না খাক।'

এই বলে ঝুরীর স্ত্রী মুনিষকে কড়া হুকুম দিয়ে গেল যেন ওদের শুধু শুকনো বিচুলি ছাড়া আর কিছু না দেয়।

বলদেরা ডাবায় মুখ ডুবিয়ে দেখল খোলভুষির নামগন্ধ নেই, একটুও রস নেই। খাবে কি করে?

মুখ তুলে তারা আশাভরা দৃষ্টিতে বাড়ির দরজার দিকে তাকিয়ে রইল।

ঝুরী চুপিচুপি মুনিষকে বলল, 'একটু খোল দিয়ে দে না।'

'না, বৌদি আমায় মারবে।'

'লুকিয়ে দিবি তো।'

'না দাদা, এর জন্যে তোমাকেও গালমন্দ শুনতে হবে।'

॥ ২॥

পরের দিন ঝুরীর শালা আবার বলদদের নিতে এল। এবার ওদের গাড়িতে জুতে নিল। দু'চারবার মোতি গাড়িকে রাস্তার গর্তে ফেলতে চাইল কিন্তু হীরা সামলে নিল। তার সহ্যগুণ বেশি। সন্ধ্যার পর ঘরে পৌঁছে ঝুরীর শালা ওদের দু'জনকে মোটা দড়িতে বেঁধে গতকালের শয়তানীর মজা দেখাল। আর ওদের ডাবায় শুকনো বিচুলি ঢেলে দিল। দুই বন্ধুর এমন অপমান আর কোনোদিন হয়নি। ঝুরী কখনও তাদের হালকা কাঠি দিয়ে মারেনি। ওর জিভের টকটক আওয়াজেই ওরা ছুটে চলে। এখানে ওরা প্রচুর মার খেয়েছে। সম্মানহানির ব্যথা তো ছিলই তার ওপর কপালে জুটল শুধু শুকনো বিচুলি। ডাবার দিকে ওরা চোখ তুলে তাকালও না।

পরের দিন গয়া দুই বলদকে লাঙ্গলে জুতল। ওরা ঠিক করল পা ওঠাবে না। গয়া ওদের পিটোতে পিটোতে ক্লান্ত হয়ে গেল। কিন্তু তবু ওরা ওদের পা তুলল না। একবার যখন ঐ নিষ্ঠুর হীরার নাকের ওপর পাঁচনের ঘা বসাল তখন মোতি আর রাগ চেপে রাখতে পারল না। লাঙ্গল নিয়ে দৌড়াল। লাঙ্গল, দড়ি, জুয়াজোত সব ভেঙে ছিঁড়ে একাকার হয়ে গেল। দু'জনের গলায় লম্বা দড়ি না থাকলে ওদের সেদিন ধরাই যেতো না।

হীরা মূক ভাষায় মোতিকে বলল, 'পালানো সম্ভব নয়।'

মোতি উত্তর দিল, 'ও তোমার জান নিয়ে নিচ্ছিল।'

'এখন আরও পিটুনি হবে।'

'হয় হোক। বলদের জন্ম যখন নিয়েছি তখন মার খেতেই হবে।'

'ঐ দেখ গয়া দু'জন লোক নিয়ে আসছে।'

'ওদের দু'জনের হাতেই লাঠি। যদি বলো তো ওদের একটু মজা দেখাই। লাঠি নিয়ে আসা বার করে দিই।'

হীরা বোঝাল, 'না ভাই দাঁড়িয়ে থাক।'

'আমাকে মারলে আমি কিন্তু ওদের গুঁতিয়ে ফেলে দেব।'

'না। আমাদের জাতের ওটা ধর্ম নয়।'

মোতি রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে দাঁড়িয়ে রইল। গয়া আর সেই লোক দু'জন এসে ওদের ধরে নিয়ে চলল। ভাগ্য ভালো এসময় ওরা মারধর করল না, তাহলে মোতি বদলা নেওয়ার জন্য তৈরি ছিল। ওর চোখের দৃষ্টি দেখেই গয়া আর তার সঙ্গীরা বুঝতে পেরেছিল যে এসময় মারধর না করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

আজও ওদের জুটল শুকনো বিচুলি। দু'জনেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। গয়ার বাড়ির লোকেরা খাওয়া-দাওয়া করতে লাগল। এমন সময় ছোট্ট একটা মেয়ে দু'খানা রুটি নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে ওদের দু'জনের মুখে দিয়ে চলে গেল। একখানা রুটিতে ওদের খিদে কি শান্ত হয়! তবু মনের মতো সামান্য একটু খাবার মিলল। তাহলে এখানেও সজ্জন কেউ থাকে। পরে ওরা জেনেছিল ঐ মেয়েটির মা মারা গেছে। ওর সৎমা ওকে খুব মারে। সেই জন্যই ওদের দুঃখ ও অনুভব করতে পেরেছে। দু'জনে দিনভর লাঙ্গল টেনে আর ডাণ্ডা খেয়ে ক্লান্ত হয়ে ফিরত। বিকালে ঐ এক জায়গায় বেঁধে দেওয়া হতো আর রাতে সেই মেয়েটি ওদের দু'খানা রুটি খাইয়ে যেত। এই ভালোবাসার গুণেই বোধহয় দু-এক গাল শুকনো বিচুলি চিবিয়েও ওরা দুর্বল হলো না বরং দু'জনের চোখ আর শরীরের প্রতিটি লোমে বিদ্রোহের সৃষ্টি হলো।

একদিন মোতি বলল, 'হীরা ভাই আর তো সওয়া যায় না।'

'তাহলে কি করতে চাস?'

'দু-চারজনকে শিং দিয়ে তুলে ফেলে দিই।'

'কিন্তু জানিস তো ঐ মিষ্টি মেয়েটি যে আমাদের রোজ রুটি খাওয়ায় সে বাড়ির মালিকের মেয়ে। মালিককে যদি মেরে ফেলিস তাহলে ও তো অনাথ হয়ে যাবে।'

'তাহলে মালকিনকে (মালিকের স্ত্রী) মেরে ফেলি। ও তো মেয়েটিকে মারে।'

'কিন্তু ভুলে যাচ্ছিল কেন স্ত্রী জাতির ওপর শিং চালানো মানা।'

'আঃ, তুমি তো আমায় কিছুই করতে দেবে না। তাহলে চল আজ দড়ি ছিঁড়ে আমরা দু'জনে ভেগে পড়ি।'

'হ্যাঁ, এটা করা চলে। তবে এত মোটা দড়ি ছিঁড়বো কি করে?'

'এর একটা উপায় আছে। এসো প্রথমে আমরা দড়িকে খানিকটা চিবিয়ে নিই। তারপর এক ঝটকায় ছিঁড়ে ফেলব।'

রাতে মেয়েটি রুটি খাইয়ে চলে যাবার পর দু'জনে দড়ি চিবাতে শুরু করল। কিন্তু মোটা দড়ি মুখের মধ্যে ঠিক ঢুকছিল না। তবু বেচারিরা বারবার চেষ্টা করতে লাগল।

হঠাৎ বাড়ির দরজা খুলে সেই মেয়েটি বেরিয়ে ওদের কাছে এল। ওরা দু'জনে মাথা নামিয়ে লেজ তুলে ওর হাত চাটতে লাগল। সে ওদের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলল, 'আমি খুলে দিচ্ছি। তোমরা চুপি চুপি পালিয়ে যাও। নইলে এরা তোমাদের মেরে ফেলবে। আজ ঘরে কথা হচ্ছিল যে তোমাদের নাক ফুটো করে দড়ি পরাবে।'

সে ওদের গলার গলাম খুলে দিল। কিন্তু ওরা দু'জন চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

মোতি নিজেদের ভাষায় হীরাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কি, এখন আমরা যাই না কেন?'

হীরা বলল, 'যেতে তো পারি। কিন্তু ভেবে দেখেছিস কাল এই অনাথ মেয়েটার কি বিপদ হবে! সবাই একে সন্দেহ করবে।'

হঠাৎ সেই মেয়েটি চেঁচাতে শুরু করল, 'দাদা, দাদা, পিসের বাড়ির হেলে দুটো পালাচ্ছে। শিগ্রি এসো, শিগ্রি এসো।'

গয়া হন্তদন্ত হয়ে বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে হেলেদের ধরতে চলল। হীরা-মোতি তখন ছুটতে শুরু করেছে। গয়াও ওদের পিছনে দৌড়াল। ওরা ছোটার তেজ বাড়িয়ে দিল। গয়া চিৎকার শুরু করল। তারপর আরও কিছু লোককে সঙ্গে নেওয়ার জন্য গাঁয়ের দিকে ফিরল। দুই বন্ধুর এবার পালাবার ভালো সুযোগ হলো। তারা সোজা দৌড়াতে লাগল। ওরা কিন্তু ওদের বাড়ির রাস্তা চিনতে পারল না। যে রাস্তা দিয়ে ওরা এসেছিল সেটা ওরা হারিয়ে ফেলল।

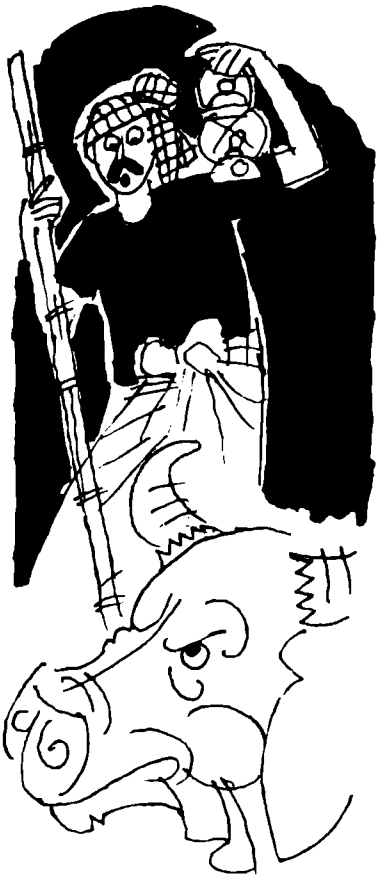

নতুন নতুন গাঁয়ের ভিতর দিয়ে ওরা ছুটতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে ওরা এক ক্ষেতের ধারে দাঁড়িয়ে গিয়ে কি করবে ভাবতে লাগল।

হীরা বলল, 'আমরা রাস্তা ভুল করেছি রে।'

মোতি বলল, 'তুমি তো মিছিমিছি ছুটলে। ওকে তো ওখানেই শেষ করে দিলে হতো।'

'ওকে মেরে ফেললে অন্য লোকেরা কি আমাদের ছেড়ে দিত? তাছাড়া ও অন্যায় করতে পারে তা বলে আমরা অন্যায় করতে যাব কেন?'

দু'জনেরই তখন প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। ক্ষেতভরা মটর গাছ। ওরা খেতে শুরু করল। মাঝে মাঝেই চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল কেউ আসছে কিনা। যখন পেট বেশ ভরে গেল তখন দু'জনে অনুভব করল ওরা স্বাধীন। আনন্দে ওরা লাফ-ঝাঁপ শুরু করল। প্রথমে দু'জনে ঢেঁকুর তুলল। তারপর শিং-এ শিং লাগিয়ে এ-ওকে ঠেলতে লাগল। মোতি হীরাকে কয়েক কদম পিছনে ঠেলে নিয়ে গেল। সে একটা গর্তে পড়ল। এতে হীরারও রাগ হয়ে গেল। গর্ত থেকে সামলে উঠে সেও মোতির দিকে ছুটে গেল। মোতি দেখল খেলা ঝগড়ার দিকে যাচ্ছে। তাই সে ইচ্ছা করেই একপাশে সরে গেল।

॥ ৩ ॥

আরে, ঐ যে একটা ষাঁড় হাঁক দিতে দিতে এই দিকেই আসছে। সে সামনে এসে পড়ল। দু বন্ধু একধারে সরে দাঁড়াল। ষাঁড় তো নয় যেন একটা হাতি। ওর সঙ্গে লড়তে গেলে নির্ঘাত মৃত্যু। কিন্তু না লড়েও তো উপায় নেই। সে তো ওদের দিকেই এগুচ্ছে। কি ভয়ঙ্কর মূর্তি।

মোতি বলল, 'এ তো ভীষণ বিপদ হলো। আমাদের এখন প্রাণ বাঁচানো দায়। কিছু একটা উপায় খুঁজতে হয়।'

হীরা চিন্তাক্লিষ্ট স্বরে বলল, 'ও এখন নিজের অহঙ্কারে মত্ত। কোনো অনুনয়-বিনয়ই শুনবে না।'

'আমরা পালাই না কেন?'

'পালিয়ে যাওয়া কাপুরুষতা।'

'তাহলে এখানে কি আমরা মারা পড়ব? আমি বাবা পালাচ্ছি।'

'আর ও যদি তোর পিছনে দৌড়য় তখন?'

'তাহলে জলদি কোনো উপায় বের কর।'

'উপায় একটাই হলো দু'জনে একসঙ্গে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া। আমি আগে তেড়ে যাই, পিছনে তুই তেড়ে আয়। দু'জনের মার একসঙ্গে পড়লেই দেখবি ও ভাগবে। ও যেমনি আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে ঠিক তখুনই তুই পাশ থেকে ওর পেটে শিং চালিয়ে দিবি। এতে হয়তো আমাদের প্রাণের ঝুঁকি আছে কিন্তু এছাড়া এখন আর কোনো পথ নেই।'

জীবন হাতে নিয়ে দুই বন্ধু লড়াই শুরু করল। ষাঁড়টারও এরকম মিলিত শত্রুর সঙ্গে লড়াই করার অভিজ্ঞতা ছিল না। একক শত্রুর সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করাই তার অভ্যেস। সে যখন হীরার ওপর ঝাঁপাল তখন মোতি পিছন থেকে তেড়ে এল। সে যখন মোতির দিকে ঘুরল তখন হীরা ওর দিকে ছুটে এল। ষাঁড়টা চাইছিল এক এক করে দুই শত্রুকে কাৎ করতে। কিন্তু ওরা তাকে সে সুযোগ দিল না। ষাঁড়টা যখন

তার ছুঁচলো শিং দিয়ে হীরাকে একেবারে খতম করে ফেলে আর কি, ঠিক সেই সময় মোতি পাশ থেকে এসে শিং দিয়ে তার পেটে জব্বর এক খোঁচা দিল। ষাঁড়টা রেগে গিয়ে যেই তার দিকে ফিরল অমনি হীরা পাশ থেকে ওর ওপর শিং চালিয়ে দিল। শেষকালে বেচারি চোট পেয়ে পালাতে শুরু করল আর দুই বন্ধু অনেক দূর পর্যন্ত ওর পিছন পিছন ছুটে ওকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল। শেষকালে ষাঁড়টা যখন হাঁপিয়ে গিয়ে মাটিতে পড়ে গেল তখন ওরা ওকে ছাড়ল।

জয়ের আনন্দে মশগুল দুই বন্ধু দুলকি চালে চলতে লাগল।

মোতি বলল, 'আমার ইচ্ছা ছিল বেটাকে একেবারে শেষ করে দিই।'

হীরা ধমক দিয়ে বলল, 'পড়ে যাওয়া শত্রুর ওপর কখনও শিং চালাতে নেই।'

'ওসব ফালতু কথা। শত্রুকে এমন মার মারতে হবে যেন আর সে উঠতে না পারে।'

'যাক এখন চিন্তা কর আমরা বাড়ি কি করে পৌঁছাবো।'

'এসো আগে কিছু খেয়ে নিই। তারপর ভাবা যাবে।'

সামনেই আবার মটরের ক্ষেত। মোতি তাতে নেমে পড়ল। হীরা মানা করল কিন্তু সে শুনল না। সবে দু'চার গ্রাস গালে দিয়েছে ঠিক তখনই দু'জন লোক লাঠি নিয়ে দৌড়ে এসে দুই বন্ধুকে ঘিরে ফেলল। হীরা ছিল জমির আলের ওপর, তাই সে পালাতে পারল। মোতি ছিল সেচ দেওয়া ক্ষেতের মধ্যে। তার ক্ষুর তখন কাঁচা মাটির মধ্যে ঢুকে গেছে, তাই সে পালাতে পারল না। সে ধরা পড়ে গেল। দূর থেকে হীরা দেখল যে সাথী বিপদে পড়েছে। যা হবার তা দু'জনেরই হোক এই ভেবে সে ফিরে এল। লোক দু'জন তখন ওকেও ধরে ফেলল। পরদিন সকালে দুই বন্ধুকে ওরা সরকারী খোঁয়াড়ে জমা দিয়ে দিল।

॥ ৪ ॥

দুই বন্ধু জীবনে এই প্রথম এমন দুর্ভোগের মধ্যে পড়ল যে সারাদিনে তাদের এক মুঠো খাবারও জুটল না। তারা বুঝে উঠতে পারল না এই খোঁয়াড়ের মালিক কেমন ধরনের লোক। এর চেয়ে গয়া তো অনেক ভালো ছিল। এই খোঁয়াড়ে বেশ কয়েকটা মোষ, ছাগল, ঘোড়া আর গাধা রয়েছে কিন্তু কারও কিছু খাবার মিলছে না। সারা দিন ওরা মড়ার মতো মাটিতে পড়ে আছে।

ওদের মধ্যে এক একজন এমন দুর্বল হয়ে পড়েছে যে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পর্যন্ত পারছে না। সারাদিন দুই বন্ধু খোঁয়াড়ের ফটকের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। কিন্তু খাবার নিয়ে কেউ এল না। তখন ওরা দেওয়ালের নোনতা মাটি চাটতে লাগল। কিন্তু তাতে কি আর পেট ভরে?

রাত্রেও যখন কোনো খাবার মিলল না তখন হীরার মনে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল। মোতিকে সে বলল, 'আর এখানে থাকা যায় না রে।'

মোতি মাথা নিচু করে বলল, 'আমার তো মনে হচ্ছে আমি আর বাঁচব না।'

'এত সহজে ভেঙে পড়লে চলবে না ভাই। এখান থেকে পালাবার কোনো উপায় বার করতে হবে। আয়, আমরা খোঁয়াড়ের দেওয়াল ভেঙে ফেলি।'

'আমার দ্বারা এখন আর কিছু হবে না।'

'ছিঃ তুই না ক্ষমতার বড়াই করিস।'

'আমার সব অহঙ্কার শেষ হয়ে গেছে ভাই।'

খোঁয়াড়ের দেওয়াল কাঁচা মাটির। হীরার মজবুত শরীর। সে তার ছুঁচালো শিং দেওয়ালে ঢুকিয়ে দিয়ে চাড় দিল। মাটির একটা চাপড়া খসে পড়ল। তখন ওর সাহস বেড়ে গেল। দৌড়ে ছুটে এসে দেওয়ালে শিং-এর ধাক্কা দিতে লাগল। তার প্রতিটি ধাক্কাতেই একটু একটু মাটি ধসে পড়তে লাগল। ঠিক এই সময়েই খোঁয়াড়ের চৌকিদার লণ্ঠন নিয়ে বন্দী জানোয়ারদের হাজিরা নিতে ঢুকল। হীরার এই অসভ্য আচরণ দেখে সে তো অবাক। তার ডাণ্ডা দিয়ে উত্তম মধ্যম পিটিয়ে ওকে একটা মোটা দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে গেল।

মোতি শুয়ে শুয়ে বলল, 'শেষে তো মার খেয়ে মরলে। কিছুই তো হলো না।'

'নিজের শক্তিতে লড়ে একবার দেখলাম।'

'এমন লড়াই-এ লাভ কি হলো? শেষকালে তো বাঁধা পড়ে গেলে।'

'লড়ে যাবই। যত বাঁধবে বাঁধুক।'

'তাতে জীবন নিয়ে টানাটানি হবে।'

'কুছ পরোয়া নেই। মরতে একদিন হবেই। একবার ভেবে দেখ্ দেওয়ালটা যদি

দেব সাহিত্য কুটীর

প্রতি বছর মহালয়ার দিন একটি করে পূজাবার্ষিকী বের করত। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর এই বছর থেকে মহালয়ার দিন আবার পূজাবার্ষিকী বেরুচ্ছে

তবে নতুন নয়

৪৫ বছর আগের সাড়া-জাগানো বার্ষিকী

জয়যাত্রা ৯০.০০

যাঁদের লেখা আছে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত
প্রবোধ কুমার সান্যাল
প্রেমেন্দ্র মিত্র
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
সজনীকান্ত দাস
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
বুদ্ধদেব বসু
আশাপূর্ণা দেবী
বনফুল
যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
প্রমথনাথ বিশী
সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
মনোজ বসু
প্রভাবতী দেবী সরস্বতী
হেমেন্দ্র কুমার রায়
সুনির্মল বসু
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
নরেন্দ্র দেব
নীহাররঞ্জন গুপ্ত
পি. সি. সরকার
বিধায়ক ভট্টাচার্য
পরিমল গোস্বামী
কুমুদরঞ্জন মল্লিক
শিবরাম চক্রবর্তী
এস ওয়াজেদ আলি
নবনীতা দেব
ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য
স্বপনবুড়ো
গজেন্দ্র কুমার মিত্র
ইন্দিরা দেবী
বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র
ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়
ধীরেন্দ্রলাল ধর
বিশু মুখোপাধ্যায়
এবং আরও অনেকে

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

ভেঙে যেত তা হলে কতগুলো প্রাণী বাঁচত। এতগুলো ভাই এখানে আটকে রয়েছে। কারও শরীরে প্রাণ নেই বললেই চলে। আর দু'চারদিন এরকম থাকলে সব কটা মরে যাবে।'

'হ্যাঁ, এ তো ঠিক কথা। আচ্ছা দাঁড়াও, এবার আমি একবার তাগদ লাগিয়ে দেখি।'

মোতি দেওয়ালের সেই জায়গাটাতেই শিং দিয়ে আঘাত করল। কিছুটা মাটি খসতেই তার হিম্মৎ বেড়ে গেল। আবার সে শিং লাগিয়ে এমন জোরে ঠেলা দিল যেমন সে অন্য বলদের সঙ্গে লড়ার সময় দেয়। এভাবে প্রায় দু' ঘণ্টার জোর চেষ্টার পর দেওয়ালটা উপর থেকে প্রায় দু' হাত ভেঙে পড়ল। তখন সে দু'গুণ শক্তি দিয়ে আবার একটা ধাক্কা মারল আর সেই ধাক্কায় আধখানা দেওয়াল ধসে গেল। দেওয়ালটা ভেঙে পড়তেই আধমরা হয়ে পড়ে থাকা জানোয়ারগুলো ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল। ঘোড়া তিনটে তক্ষুণি লাফ দিয়ে বেরিয়ে গেল। তারপর ছাগলগুলোও পালাল। এরপর মোষগুলোও বেরুল কিন্তু গাধা দুটো যেমনকে তেমন এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে রইল।

হীরা ওদের জিজ্ঞাসা করল, 'তোরা দু'জন যাচ্ছিস না কেন?'

একটা গাধা বলল, 'যদি আবার ধরা পড়ে যাই!'

'তাতে কি। এখন তো পালাবার সুযোগ পাচ্ছিস।'

'আমাদের ভয় করছে। আমরা এখানেই থাকব।'

অর্ধেক রাত কেটে গেল। গাধা দুটো তখনও তেমনি দাঁড়িয়ে রইল। আর মোতি তখন তার বন্ধুর দড়ি ছেঁড়ার চেষ্টায় নিরত। যখন সে দড়ির কাছে হার মানল তখন হীরা বলল, 'এবার তুই যা। আমায় এখানেই পড়ে থাকতে দে। কেউ আবার তোকে দেখে ফেলবে। তখন মুশকিল হবে।'

চোখের জল ফেলতে ফেলতে মোতি বলল, 'আমায় তুমি এমন স্বার্থপর ভাব? আমরা দু'জনে এতদিন একসঙ্গে রয়েছি আর এই বিপদের মধ্যে তোমায় ফেলে আমি পালিয়ে যাব?'

হীরা বলল, 'তোকে কিন্তু সাংঘাতিক মার খেতে হবে। সবাই বুঝে যাবে এ তোরই শয়তানী।'

মোতি গর্বের সঙ্গে বলল, 'যে অপরাধের জন্যে তোমার গলায় দড়ি পড়েছে সেই অপরাধে আমায় যদি পিটুনি খেতে হয় তো তাতে ক্ষতি নেই। একটা কাজ তো হলো, ন-দশটা প্রাণী তো প্রাণে বাঁচল। ওরা সবাই আমায় আশীর্বাদ করবে।' এই বলে মোতি শিং-এর গুঁতো মারতে মারতে গাধা দুটোকে খোঁয়াড়ের বাইরে তাড়িয়ে দিয়ে নিজের বন্ধুর পাশে বসে পড়ল।

ভোরবেলায় খোঁয়াড়ের মালিক চৌকিদার আর এক কর্মচারীকে সঙ্গে নিয়ে খোঁয়াড়ে ঢুকল। ব্যাপার দেখে তো তাদের চক্ষু চড়কগাছ। তারা ভীষণ শোরগোল লাগিয়ে দিল। তারপর মোতিকে প্রচণ্ডভাবে প্রহার করে একটা মোটা দড়িতে বেঁধে রেখে চলে গেল।

॥ ৫ ॥

এক সপ্তাহ দুই বন্ধু এইরকম বাঁধা অবস্থায় পড়ে রইল। কেউ এক মুঠো খাবারও ওদের দিল না। শুধু দিনে একবার জল দিয়ে যেতো। এতেই ওদের প্রাণটা কোনোরকমে টিকে রইল। দু'জনেই এত দুর্বল হয়ে গেল যে ওদের উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা রইল না। চামড়ার ওপর হাড়পাঁজরা সব বেরিয়ে পড়ল। একদিন খোঁয়াড়ের বাইরে ডুগডুগি বাজতে লাগল আর দুপুরের মধ্যে পঞ্চাশ-ষাট জন লোক সেখানে জমা হলো। তাদের দুই বন্ধুকে বাইরে আনা হলো। সেই লোকগুলো এসে তাদের দেখতে লাগল আর দেখে মুখ ভারী করে চলে গেল। এই মরা হেলে দুটোকে কে কিনবে? হঠাৎ একটা লম্বা দাড়িওয়ালা লোক এল। তার চোখ দুটো লাল আর চেহারাটা দেখতে ভয়ঙ্কর। সে তাদের দুই বন্ধুর পাঁজরের হাড় টিপতে টিপতে খোঁয়াড়ের মালিকের সঙ্গে কথা বলতে লাগল। ওর চেহারা দেখেই দুই বন্ধুর অন্তরাত্মা সব বুঝতে পেরে আতঙ্কে কেঁপে উঠল। ও কে আর কেনই বা তাদের পরীক্ষা করছে তা বুঝতে ওদের কোনো অসুবিধা হলো না। দু'জনে দু'জনের দিকে ভয়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে মাথা নামিয়ে নিল।

হীরা বলল, 'গয়ার বাড়ি থেকে পালিয়ে এলাম। কিন্তু এবার আর জান বাঁচবে না।'

মোতি অশ্রদ্ধার ভঙ্গিতে বলল, 'ভগবান নাকি সকলকে দয়া করে। কই তার তো আমাদের ওপর দয়া আসছে না।'

'ওরে ভগবানের কাছে আমাদের মরা-বাঁচা দুই-ই সমান। যেতে দে, কটা দিন তো ওর কাছে থাকব। ভগবান একবার গয়ার বাড়িতে সেই মেয়েটির রূপ ধরে আমাদের বাঁচিয়েছিলেন। দেখা যাক এবার কি করেন।'

'দেখে নিও এই লোকটা আমাদের গলায় ছুরি চালাবে।'

'তাতে চিন্তা কি রে! আমাদের মাংস, চামড়া, শিং, হাড় সব কিছুই কোনো-না-কোনো কাজে লেগে যাবে।'

নিলাম হয়ে যাবার পর দুই বন্ধু সেই দাড়িওয়ালার সঙ্গে চলতে লাগল। দু'জনেরই শরীর কাঁপছিল। বেচারিদের তখন পা তোলারও ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু ভয়ের তাড়নায় টলমল করতে করতেই ওদের হাঁটতে হচ্ছিল। চলন একটু ঢিমা হলেই দাড়িওয়ালা তাদের পিঠে ডাণ্ডা মারছিল। পথে গাই-বলদের একটা পালকে ওরা সবুজ মাঠে চরতে দেখল। ওদের সবাই চকচকে সুন্দর আর খুশিতে ডগমগ। ওরা কেউ কেউ লাফাচ্ছে আর কেউ বা আনন্দে শুয়ে শুয়ে জাবর কাটছে। কত সুখের ওদের জীবন, কিন্তু ওরা কত স্বার্থপর। ওদের কারও চিন্তা হচ্ছে না যে ওদেরই দুই ভাই কসাই-এর হাতে পড়ে মরতে চলেছে।

হঠাৎ ওদের দু'জনেরই মনে হলো রাস্তাটা যেন চেনা চেনা লাগছে। হ্যাঁ, এই রাস্তা দিয়েই তো গয়া ওদের নিয়ে গিয়েছিল। এই তো সেই ক্ষেত, ঐ তো সেই বাগান, ঐ তো সেই গ্রাম—সব মিলে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গেই ওদের চলার গতি বেড়ে গেল। শরীরের সব ক্লান্তি, দুর্বলতা যেন উবে গেল। সত্যি সত্যিই ওরা নিজেদের এলাকায় এসে গেছে। এই তো সেই কুয়ো—এই কুয়ো থেকেই তো চরকি টেনে ওরা জল তুলতে আসে।

মোতি বলল, 'আমরা বাড়ির কাছে এসে গেছি।'

হীরা বলল, 'ভগবানের দয়া।'

'আমি তো এবার ঘরের দিকে ছুটব।'

'এ কি যেতে দেবে?'

'একে আমি গুঁতিয়ে ফেলে দেব।'

'না, না, তার দরকার নেই। দৌড়ে বাড়ির দিকে চল। এখান থেকে আর আমরা আগের দিকে যাব না।'

ওরা এবার উন্মত্ত হয়ে বাচ্চা বাছুরের

মতো লাফাতে লাফাতে বাড়ির দিকে দৌড়াল। ঐ তো আমাদের বাড়ি। দু'জনে দৌড়াতে দৌড়াতে নিজেদের জাবনা খাওয়ার চালায় এসে দাঁড়িয়ে গেল। দাড়িওয়ালা ওদের পিছন পিছন ছুটে এল।

ঝুরী দরজার সামনে বসে রোদ পোয়াচ্ছিল। সে দৌড়ে এসে আনন্দে বার বার ওদের গলা জড়িয়ে ধরতে লাগল। আনন্দে দুই বন্ধুরও চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়ল। ওরা ঝুরীর হাত চাটতে লাগল। দাড়িওয়ালা এসে ওদের দড়ি ধরল।

ঝুরী বলল, 'এ হেলে তো আমার।'

'তোমার হেলে কিসের! আমি এদের খোঁয়াড় থেকে নিলেমে কিনেছি।'

'আমি বুঝতে পারছি তুমি এদের চুরি করে আনছো। এখন চুপচাপ চলে যাও। আমি বেচলে তবে বিক্রি হবে। আমার হেলেকে নিলেম করার কারুর অধিকার নেই।'

'আমি থানায় রিপোর্ট করব।'

'তা করগে। এরা আমার হেলে। এর প্রমাণ হলো ওরা আমার বাড়িতে এসে দাঁড়িয়েছে।'

দাড়িওয়ালা রেগে চোখ পাকিয়ে জোর করে হেলেদের টেনে নিয়ে যেতে এগিয়ে এল। এবার মোতি শিং চালাল।

দাড়িওয়ালা পিছু হটল। মোতি ওর দিকে এগিয়ে গেল। প্রাণের ভয়ে দাড়িওয়ালা দৌড়াল। মোতিও ওর পিছনে ছুটল।

গাঁয়ের বাইরে এসে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে ও দাড়িওয়ালাকে দেখতে লাগল। দাড়িওয়ালা দূরে দাঁড়িয়ে গালাগালি আর ধমক দিতে দিতে ওর দিকে পাথর ছুঁড়তে লাগল। আর বিজয়ী যোদ্ধার মতো মোতি ওর রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে রইল। গাঁয়ের লোকেরা এই তামাশা দেখে হেসে আর বাঁচে না। শেষকালে হার মেনে দাড়িওয়ালা চলে গেল। তখন মোতি গর্বের সঙ্গে নিজেদের বাড়িতে ফিরে এল।

হীরা ওকে বলল, 'আমি ভয় পাচ্ছিলাম তুই রেগে বুঝি লোকটাকে মেরেই ফেলবি।'

'ও যদি আমায় ধরতে আসত তাহলে নির্ঘাৎ ওকে শেষ করে দিতাম।'

'ও আর আসবে না।'

'আসুক না। দেখি কেমন করে আমাদের নিয়ে যায়।'

এরপরই ওদের জাবনার ডাবায় বিচালি, খোলভুষি, দানা পড়ল আর দুই বন্ধু তাড়াতাড়ি খেতে শুরু করল।

ঝুরী ওদের দু'জনের গায়ে হাত বুলাতে লাগল আর বিশ-পঁচিশ জন ছেলেমেয়ে এই দৃশ্য দেখতে দাঁড়িয়ে রইল। ব্যাপারটা যেন গাঁয়ে একটা উৎসবের হাওয়া তুলে দিল।

এই সময় মালকিন (বাড়ির গিন্নী, ঝুরীর স্ত্রী) এসে দু'জনের কপালে চুমু খেল।

আনন্দে দুই বন্ধুর মন ভরে গেল।

(অমর কথাশিল্পী মুন্সী প্রেমচন্দের "দো বয়েলো কী কথা" অবলম্বনে)

ছবি ঃ সমীর সরকার

The New Edition of A. T. Dev's

STUDENT'S FAVOURITE DICTIONARY

(Eng. To Beng. & Eng.)

- The foremost dictionary of Current English to Bengali thoroughly revised, illustrated and expanded.
- New demy size.
- Over 40,000 entries in this edition.
- Up-to-date coverage of new words.
- Encyclopaedic appendices covering language and literature, mythological characters, biographies, quotations, world gazetteer, Greek and Russian alphabet, weights and measures, mathematical formulas, abbreviations

Dev Sahitya Kutir (P) Ltd., 21, Jhamapukur Lane, Calcutta - 700 009

চিঠিপত্র

(মতামতের দায়িত্ব সম্পাদকের নয়)

পুরস্কৃত সেরা চিঠি

চোর

তখন রাত প্রায় দেড়টা। বাথরুমে যাবো বলে সবে বিছানা ছেড়ে উঠেছি। হঠাৎ লাগোয়া ছোট ঘর থেকে খুটখাট আওয়াজ শুনে এগিয়ে গেলাম। ঘর অন্ধকার। বাইরের আলোয় অস্পষ্টভাবে দেখতে পেলাম কাচের আলমারির পাল্লা দুটো খোলা, কে যেন তার সামনে দাঁড়িয়ে আলমারি থেকে বাসনপত্তর নামাচ্ছে। বাবা-মা তাঁদের ঘরে অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। ভয়ে আমার বুক ঢিপ ঢিপ করে উঠল। দরজার পাশে রাখা খিলটা শক্ত করে ধরে কাঁপা হাতে খিলটা তুলে ধরেছি চোরটাকে পেছন থেকে মারবো বলে। আচমকা চোরটা আমার দিকে ঘুরল। আমি অবাক হয়ে দেখলাম, হাড় কাঁপানো শীতের রাত্রে আমার বন্ধু বিল্টুর বাবার ঘর্মাক্ত, ভয়ার্ত মুখ।

আমাকে দেখে বিল্টুর বাবা হাত জোড় করে কাঁদতে লাগলেন। তারপর তাঁর মুখ থেকে যা শুনলান তাতে আমি থতমত খেয়ে গেলাম। ক্লাস এইট থেকে নাইনে ওঠার পর আর্থিক চাপে বিল্টুর লেখাপড়া বন্ধ করে দেবেন ভেবেছিলেন উনি। কিন্তু বিল্টু লেখাপড়ায় খুব ভালো। পড়াতে গেলে বই কেনা, মাইনের টাকা কোথা থেকে যোগাড় করবেন। ওঁর মিল যে বন্ধ। ছেলের ভবিষ্যতের কথা ভেবে বাধ্য হয়ে তিনি এই পথে পা বাড়িয়েছেন।

সব শুনে আমি বললাম, কাকু বাসনগুলো আলমারিতে তুলে গুছিয়ে রাখুন। আমরা দেখছি বিল্টুর পড়াশোনার ব্যাপারে কী করা যায়। তবে একটা কথা, আজকের এই ঘটনা কেউ যেমন কোনোদিন জানবে না, তেমনি আপনিও কোনোদিন কিছু প্রকাশ করবেন না।

পরদিন খেলার মাঠে বই ও স্কুলের মাইনে সহ ব্যাগটি হারানোর কথা জানাতে বেশ ভালো ওজনের চড় খেয়েছিলাম বাবার কাছে।

তথাগত মুখার্জি (নবম শ্রেণী)

(৪৮ এ, দেশবন্ধু রোড, আলমবাজার, কলকাতা-৭০০ ০৩৫)

তিতলিপুরের জঙ্গলে

পৌষ সংখ্যা হাতে পেয়ে মনটা আনন্দে নেচে উঠল। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ধারাবাহিক রহস্য উপন্যাস 'তিতলিপুরের জঙ্গলে' প্রথম কিস্তি থেকেই জমে উঠেছে। দেখতে দেখতে শুকতারার বয়েস হয়ে গেল ৫৫ বছর ফিরে দেখা বিভাগে রহস্য রোমাঞ্চ সাহিত্যের যাদুকর হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'কালো দস্তানা' পড়ে দারুণ লেগেছে।

জ্যোৎস্না সরকার

(বেথুয়াডহরি, ঘোষপাড়া, নদীয়া)

ভালো লেগেছে

শারদীয়া সংখ্যায় শক্তিপদ রাজগুরুর 'পটলাকে নিয়ে প্রবলেম', চিত্তরঞ্জন মাইতির 'ভাইবোন', অদ্রীশ বর্ধনের 'পাহাড়ী ময়নার অট্টহাসি', সুভাষ ধরের 'লস্করহাটের দুই শয়তান', নিরঞ্জন সিংহর 'যুদ্ধবাজরা নিপাত যাক', ডাঃ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 'এম বি বি এস' খুব ভালো লেগেছে। শুকতারায় কমপিউটারের ওপর লেখা পেলে খুশি হবো।

রোহিত বেরা

(প্রযত্নে—দেবেন্দ্রনাথ নায়ক,
পোঃ ও গ্রাম—বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর)

লোহার শরীর, রুপোর মন

পৌষ সংখ্যায় সব গল্পই ভালো লেগেছে। সব থেকে ভালো লেগেছে তুষার আহাসানের 'লোহার শরীর, রুপোর মন' গল্পটি।

মিতা রায়চৌধুরী

(পোঃ ও গ্রাম—রানীনগর,
থানা—ইসলামপুর, জেলা—মুর্শিদাবাদ)

দারুণ লাগল

সম্প্রতি শুকতারা পড়লাম। দারুণ লাগল। আমিও শুকতারার বন্ধু হতে চাই। হাঁদা-ভোঁদা, বাঁটুল, ভৌতিক গল্প, ছড়া, শব্দমালা, প্রশ্নোত্তর, সেরা চিঠি, কার্টুন ইত্যাদি আমার খুব ভালো লেগেছে। কোন ঠিকানায় চিঠি দেবো জানাবেন।

সুমন চক্রবর্তী

(২৪৩/২, অশোকনগর, পোঃ আশোকনগর
উঃ ২৪ পরগনা—৭৪৩ ২২২)

[শুকতারায় চিঠি-টিঠি যে ঠিকানায় পাঠাবে তা হলো—সম্পাদক শুকতারা, ২১ ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা—৭০০ ০০৯]

আরও কমিকস চাই

শারদীয়া শুকতারা পড়ে মন ভরে গেছে। সব গল্প আর উপন্যাসই ভালো লেগেছে। তবে কমিকস আর একটু বেশি থাকলে ভালো হতো।

আসমান তাহের

(পোঃ ও গ্রাম—দেবীপুর, মেদিনীপুর)

গোয়েন্দা সংখ্যা

শুকতারার গোয়েন্দা সংখ্যা দারুণ লেগেছে। সব থেকে ভালো লেগেছে 'একটি রহস্যময় রাত' গল্পটি।

প্রীতম চ্যাটার্জি

(প্রযত্নে—অশোক চ্যাটার্জি, ৩৮/১/৮, দক্ষিণ
বাকসাড়া রোড, বকুলতলা,
পোঃ—বাকসাড়া, হাওড়া—৭১১ ৩০৬

সেরা চিঠি

'সেরা চিঠি' প্রতিযোগিতায় শুকতারার পাঠক-পাঠিকারা যে কোনো বিষয়ের ওপর (রাজনীতি বাদ দিয়ে) চিঠি লিখতে পারে। সেরা চিঠিটি শুকতারায় ছাপা হবে এবং তার জন্যে একাশত টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। আনুমানিক একশো শব্দের মধ্যে চিঠি লিখতে হবে। যত খুশি চিঠি পাঠানো যেতে পারে। কিন্তু প্রত্যেকটি চিঠির সঙ্গে নিচের কুপনটি থাকা চাই। কুপন ছাড়া কোনো চিঠি গ্রাহ্য হবে না। সেরা চিঠি মনোনয়নের ব্যাপারে শুকতারার সম্পাদকমণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। চিঠি পাঠাতে হবে সম্পাদক শুকতারার নামে। খামে বা ইনল্যান্ডের ওপরে 'সেরা চিঠি' লিখে দিতে হবে।

আমি শুকতারার 'সেরা চিঠি' প্রতিযোগিতায় আমার মনোনীত বিষয় নিয়ে চিঠি পাঠাচ্ছি। চিঠির মতামত সম্পূর্ণ আমার।

স্বাক্ষর (পুরো নাম) .....

সম্পূর্ণ ঠিকানা .....

ফিরে দেখা

ট্রাপিজের খেলা

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

[শুকতারার বয়স ৫৫ বছর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে আরম্ভ করে বাংলার যশস্বী সাহিত্যিকদের প্রায় সকলেই শুকতারায় লিখেছেন। 'ফিরে দেখা' বিভাগে আমরা শুকতারার পাতা থেকে এক এক করে তুলে আনবো বাংলা শিশুসাহিত্যের কিছু মণি-মাণিক্য। শুকতারার শারদীয়া সংখ্যা থেকে শুরু হয়েছে এই পর্ব। এই সংখ্যায় ছাপা হচ্ছে শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের লেখা গল্প 'ট্রাপিজের খেলা'। গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল শুকতারার পঞ্চম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় অর্থাৎ ফাল্গুন ১৩৫৮ বঙ্গাব্দে। সঃ শুকতারা]

প্রকাণ্ড তাঁবু পড়েছে খেলার মাঠের পাশে।

সার্কাসের তাঁবু।

বাঘ, সিংহ, হাতী, ঘোড়া—কত রকমের কত জানোয়ার এসেছে। কত রকমের কত খেলোয়াড় এসেছে!— এসেছে স্বাস্থ্যবান সুন্দর কত মানুষ!

দলে দলে ছেলেরা ছুটেছে সেই দিকে।

ছেলেদের উৎসাহই যেন সব চেয়ে বেশি!—জানোয়ার দেখবার উৎসাহ।

সার্কাসের খেলা হবে তাঁবুর ভেতর। চারিদিকে কত রঙ-বেরঙের আলো জ্বলবে। টিকিট না কিনে ভেতরে ঢুকতে পারবে না কেউ।

তার চেয়ে বড় কথা—জন্তু-জানোয়ার দেখতে টিকিট কিনতে হবে না।

কিন্তু সেখানেও এক বিপদ। একে তো বিদ্‌কুটে গন্ধে নাকে কাপড় দিতে হয়, তার ওপর খুঁটি পুঁতে নারকেলের দড়ি বেঁধে দূরে একটা বেড়া দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাছে গিয়ে যে ভাল ক'রে দেখবে তার উপায় নেই।

ছেলেদের মধ্যে একটু বড় যারা—তাদের মধ্যে রীতিমত তর্ক সুরু হয়ে গেছে।

—বিলিতি সার্কাস দেখেছিস?

—না।

—তবে আর কি দেখলি? তাদের ছিল দশটা ইয়া বড় বড় হাতী, আর দশটা সিংহ। কেশরওয়ালা সিংহ, দেখলে মনে হয় বিলেতের জঙ্গল থেকে এই মাত্তর ধরে' আনলে।

একজন প্রতিবাদ করলে ঃ— সিংহের কেশর থাকে না, কেশর থাকে সিংহীর।

আর-একজন বললে ঃ বিলেতের জঙ্গলে সিংহ পাওয়া যায় না। সিংহ থাকে আফ্রিকার জঙ্গলে।

—তুই গেছিস্ কোনোদিন বিলেত?

—বিলেতে যাবার দরকার হয় না। বই-এ পড়েছি।

এই নিয়ে তুমুল তর্ক, প্রথমে কথা-কাটাকাটি, তারপর হাতাহাতি, তারপর সেকথা গিয়ে উঠলো ইস্কুলের হেডমাষ্টারের কানে। হুকুম হয়ে গেল, ছেলেরা বিনা প্রয়োজনে কেউ সেখানে যাবে না।

সার্কাসের মালিক দেখলেন—বিপদ হলো তাঁরই। কারণ, ছেলেরাই সার্কাস দেখতে বেশি ভালবাসে। তারাই তার বড় খরিদ্দার।

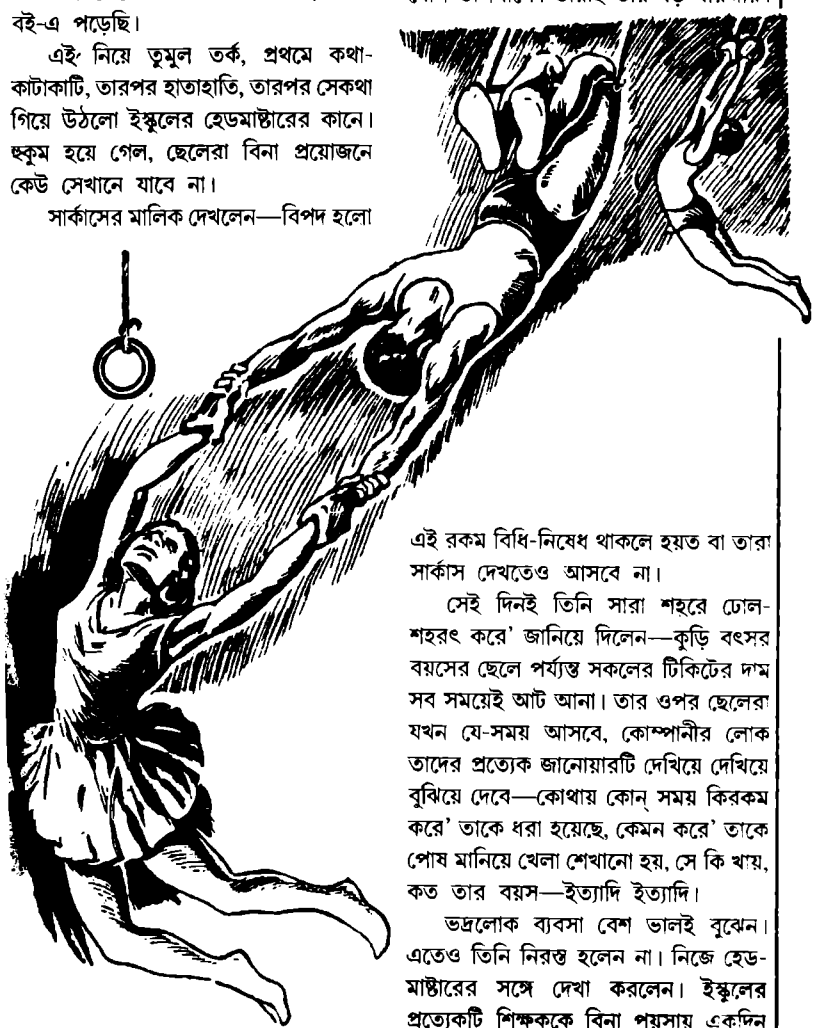

এই রকম বিধি-নিষেধ থাকলে হয়ত বা তারা সার্কাস দেখতেও আসবে না।

সেই দিনই তিনি সারা শহরে ঢোল-শহরৎ করে' জানিয়ে দিলেন—কুড়ি বৎসর বয়সের ছেলে পর্য্যন্ত সকলের টিকিটের দাম সব সময়েই আট আনা। তার ওপর ছেলেরা যখন যে-সময় আসবে, কোম্পানীর লোক তাদের প্রত্যেক জানোয়ারটি দেখিয়ে দেখিয়ে বুঝিয়ে দেবে—কোথায় কোন্ সময় কিরকম করে' তাকে ধরা হয়েছে, কেমন করে' তাকে পোষ মানিয়ে খেলা শেখানো হয়, সে কি খায়, কত তার বয়স—ইত্যাদি ইত্যাদি।

ভদ্রলোক ব্যবসা বেশ ভালই বুঝেন। এতেও তিনি নিরস্ত হলেন না। নিজে হেড-মাষ্টারের সঙ্গে দেখা করলেন। ইস্কুলের প্রত্যেকটি শিক্ষককে বিনা পয়সায় একদিন

সার্কাস দেখবার জন্য নিমন্ত্রণ করে' এলেন। বলে এলেন ঃ এখান থেকে চলে যাবার আগে একদিন রবিবার দিনের বেলা শুধু শিক্ষক ও ছাত্রদের বিনামূল্যে খেলা দেখাবার ব্যবস্থা করবেন।

হেড-মাষ্টারমশাই সেই দিনই একটা সার্কুলার লিখে প্রত্যেক ক্লাসে পাঠিয়ে দিলেন। —আজ থেকে সার্কাস-গ্রাউণ্ডে যাবার সর্ব্বপ্রকার বাধা-নিষেধ প্রত্যাহার করে' নেওয়া হ'লো।

নবম শ্রেণীর ছাত্র সুজিতের আনন্দ যেন আর ধরে না!

একে তো সার্কাস দেখবার টিকিটের দাম আট আনা করে' দেওয়া হয়েছে, তার ওপর যখন খুশী সেখানে সে যেতে পারবে।

সুজিতকে চেনে না—সেরকম ছেলে ইস্কুলে এক রকম নেই বললেই হয়। সব সময়েই দেখা যায়—লাল রঙের জামা গায়ে, পায়ে একজোড়া চটি আর হাতে একটি চাকু-ছুরি। বাঁশের কঞ্চি, এক টুক্‌রো কাঠ, নয়তো পেন্সিল, আর হাতের কাছে কিছু না পেলে নিজের আঙুলের নখ—দেখা যায় সে কাটছেই।

তার কথার ওপর কথা যে বলবে—মার সে খাবেই। সে যা বলবে, তা যেন বেদবাক্য—অকাট্য! এম্‌নি তার স্বভাব।

এক ক্লাস থেকে আর এক ক্লাসে উঠতে সে যেন কিছুতেই চায় না! সুজিতের সঙ্গে নীচের ক্লাস থেকে পড়েছে এমন-সব সহপাঠীদের মধ্যে দু'একজন বি-এ পাশ করেছে। সেকথা বললে সুজিত কিন্তু রাগ করে না—হাসে।

ক্লাসে কোনও ছেলে হয়ত পড়া বলতে পারেনি, কিংবা হয়ত দুষ্টুমি করেছে, তাকে শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন; তৎক্ষণাৎ ডাক পড়ে সুজিতের।

বাঁশের কঞ্চি কিংবা বেত নিয়ে সুজিত প্রস্তুত।

শিক্ষকের হাতের কাছে সেটি পৌঁছে দিতে তার মুহূর্ত্ত বিলম্ব হয় না!

ছেলেটি মা'র খাবে, কাঁদবে, সুজিত একাগ্র দৃষ্টিতে তাই দেখবে আর হাসবে। সে যে তার কি আনন্দের হাসি, নিজের চোখে না দেখলে তা বুঝানো সম্ভব নয়।

এইখানেই সুজিত সকলের চেয়ে স্বতন্ত্র!

প্রত্যহ দেখা যায়, সুজিত আট আনা দিয়ে টিকিট কিনে সার্কাস দেখছে।—সেই লাল জামা, পায়ে চটি, হাতে ছুরি!

সার্কাস কোম্পানীর যে-লোকটি টিকিট বিক্রি করে, তার সঙ্গে ভাব করতে সুজিতের মোটেই দেরি হয়নি। প্রত্যহ ঠিক একই জায়গার একখানি টিকিট সে সুজিতের জন্য রেখে দেয়। দূর থেকে লাল জামা দেখবামাত্র সে তার টিকিটখানি ঘুলঘুলির পথে বাড়িয়ে ধরে। হাসতে হাসতে টিকিট নিয়ে সুজিত তার নির্দ্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে বসে।

টিকিট কেনবার জন্য সুজিতকে কোনোদিন কিউ-এ দাঁড়াতে হয় না।

সুজিতকে কেউ যদি প্রশ্ন করে ঃ রোজ রোজ একই খেলা দেখতে তোর ভাল লাগে?

সুজিত বলে ঃ না।

—তবে যাস্ কেন?

—কেন যাই? বলে' সুজিত সে-প্রশ্নের যা জবাব দেয়, সে-ও এক বিচিত্র!

তাঁবুর মাথার ওপর মোটা মোটা দড়ি দিয়ে কয়েকটি লোহার 'রড্' আর 'রিং' ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। দু'জন বেশ বলিষ্ঠ পুরুষ আর একটি মেয়ে—এই তিনজনে ওই রড্ আর রিং ধরে' ট্রাপিজের খেলা দেখায়। কত রকমের কত খেলা!—অপূর্ব্ব! অদ্ভুত!

এক প্রান্তের রিং ধরে' ঝুলতে ঝুলতে অপর প্রান্তের 'রিং'টাকে গিয়ে যখন ধরে, মেয়েটিকে মাঝখানে রেখে দু'দিকে দু'জন যখন একটিমাত্র হাতের ওপর ভর দিয়ে শূন্যে ঘুরপাক খায়, বিমুগ্ধ বিস্ময়ে তখন নির্বাক হয়ে যেতে হয়!

দৈবাৎ কোনোদিন যদি চোখের নিশানা বেফাঁস্ হয়ে গিয়ে একবার ফস্‌কে যায় তো—বাস্, আর দেখতে হবে না! তিনজনেই তাল্‌গোল্ পাকিয়ে ওই অত দূর থেকে একেবারে নীচে!

সুজিত বলে ঃ আমি শুধু সেই জন্যেই যাই!

—কি জন্যে?

—ওদের পড়ে যাওয়া দেখতে।

একদিন-না-একদিন হাত ফস্‌কে পড়বেই।

কিন্তু পড়লো না একদিনও।

খেলা যারা দেখায় তাদের চোখের নিশানা অভ্রান্ত, না আমাদের সুজিতের দুর্ভাগ্য, কে-জানে?

রোজ রোজ সেই একই খেলা দেখে দেখে এমন হ'লো যে সুজিতের খেলা দেখার আর কোনও আনন্দই রইলো না।

সুজিত প্রতিজ্ঞা করে' বসলো—আর সে দেখবে না।

দশবার দেখেছে পাঁচটাকা খরচ করে'। পড়বার হ'লে এর মধ্যে একদিন নিশ্চয়ই পড়তো।

সুজিত সেদিন অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাড়ীতে বসে রইলো। কাজ কি রাস্তায় বেরিয়ে? যদি লোভ সম্বরণ করতে না পেরে টিকিট কিনে বসে!

কিন্তু হা ভগবান! এ কি করলে তুমি?

পরের দিন সকালে উঠেই শুনলে, গত কাল যখন সার্কাসের খেলা দেখানো হচ্ছিল, তখন নাকি একটা ভয়ঙ্কর রকম দুর্ঘটনা ঘটে গেছে!

সুজিত তার নিজের কানটাকেই যেন বিশ্বাস করতে পারলে না! কি এমন দুর্ঘটনা ঘটেছে জানবার জন্য বাড়ী থেকে সে বেরিয়ে পড়লো।

একটা দুর্ঘটনা যে ঘটেছে সেকথা সত্য, কিন্তু কি ঘটেছে তার সঠিক সংবাদ কেউ দিতে পারলে না।

সুজিত ঢুকলো একটা চায়ের দোকানে।

দোকান একেবারে সরগরম! এই আলোচনাই হচ্ছিল সেখানে।

একজন প্রত্যক্ষদর্শী বললে ঃ আমি নিজে দেখেছি।

চায়ের কাপটি হাতে নিয়ে সুজিত তার সুমুখে গিয়ে বসলো।

সে তখন বলে চলেছে ঃ বাঘের খেলা শেষ হবার পর, দু'জন ছোক্‌রা আর তাদের মাঝখানে একটি মেয়ে হাত-ধরাধরি করে' এসে দাঁড়ালো।

সুজিত বলল ঃ ট্রাপিজের খেলা দেখাবার জন্যে?

লোকটি বললে ঃ হ্যাঁ। তাঁদের মধ্যে সব-চেয়ে যিনি ভাল খেলা দেখান—ফর্সা গায়ের রং, ইয়া চওড়া বুকের ছাতি, চমৎকার চেহারা!

সুজিত যেন তাকে তার চোখের সামনে দেখতে পেলে। বললে ঃ তারই 'এক্সিডেণ্ট'?

—হ্যাঁ, তাঁরই। সবাইকে নমস্কার করে' হাসতে হাসতে লাফিয়ে তিনি ধরলেন পূর্বদিকের রিংটা, তারপর বারকতক সেইখানে পাক্ খেয়ে রিংটা দুলিয়ে দিয়ে বোধহয় তিনি ধরতে চেয়েছিলেন তাঁবুর একেবারে শেষে পশ্চিম দিকে যে রিং ঝুলছিল সেই রিংটা। ধরতে গিয়ে তাঁর হাতের তাক্ গেল ফস্‌কে ছিট্‌কে, গিয়ে পড়লেন গ্যালারির নীচে। হৈ হৈ করে' সব উঠে পড়লো। চারিদিকে লোক জড়ো হয়ে গেল। ভিড় ঠেলে সার্কাসের

লোকেরা তক্ষুণি তাঁকে ধরাধরি করে' ভেতরে নিয়ে চলে গেল। সার্কাস ভেঙ্গে গেল।

সবাই তাকে ধরে' বসলো ঃ লোকটার কি হ'লো শেষ পর্য্যন্ত দেখলেন না?

সে বলল ঃ লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল, দেখতে আর গেলুম কই! শুনলাম, তক্ষুণি তাঁকে সরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেছে। কেমন আছেন কে জানে?

সুজিতের চা খাওয়া বোধহয় হ'লো না। হাত থেকে চায়ের কাপ্‌টা সেইখানে নামিয়ে দিয়েই বলে উঠলো ঃ এতক্ষণ মরে' গেছে।

সুজিতের আফ্‌শোষের আর বাকি কিছু রইলো না। যা দেখবার জন্যে সে এক-আধবার নয়, রীতিমত পয়সা্ খরচ করে' দশ-দশবার সার্কাস দেখলে, আর যেদিন যাওয়া বন্ধ করলে, সেই দিনই এক্সিডেন্ট!

সুজিত তৎক্ষণাৎ ছুটলো সরকারি হাসপাতালে।

শহর যেমন ছোট, তার হাসপাতালও তেমনি।

সেখানে যাওয়ামাত্র সুজিত দেখলে, একটি ছোট্ট ঘরের ভেতর সেই ভদ্রলোক শুয়ে আছেন। লাল কম্বলে মোড়া তাঁর সর্ব্বশরীর। শিয়রের কাছে ছোট্ট একটি টুলের ওপর বসে আছে সেই মেয়েটি। এই মেয়েটিকে সুজিত প্রতিদিন দেখেছে ট্রাপিজের খেলা দেখাতে। যিনি পড়ে গিয়ে আহত হয়েছেন, এই মেয়েটি তাঁর প্রতিদিনের খেলার সঙ্গিনী। জীবনের সঙ্গিনী কিনা তাই-বা কে জানে?

সুজিতের মনে হ'লো যেন মেয়েটি সারারাত ধরে' তাঁর শুশ্রূষা করেছে। চোখে ঘুম যেন এখনও লেগে রয়েছে!

ঘরের দোর পর্য্যন্ত সুজিত এগিয়ে গেল। যিনি শুয়ে আছেন তিনি ঘুমুচ্ছেন। সুজিত জিজ্ঞাসা করলে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে ঃ উনি—কেমন আছেন?

মেয়েটি নীচের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছিল, হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে দেখলে সুজিতকে। তার প্রশ্নের কোনও জবাব না দিয়ে সুজিতের দিকে মেয়েটি একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো। ধীরে ধীরে সেখান থেকে উঠে তার কাছে এলো। এসেই বললে ঃ হ্যাঁ তুমি! তুমিই নিশ্চয়। এই লাল জামা, এই মুখ! তোমাকে রোজ আমি দেখেছি খেলা দেখাবার সময়। রোজ টিকিট করে' গ্যালারির ঠিক একই জায়গায় তুমি বসতে—না?

সুজিত বললে ঃ হ্যাঁ।—কিন্তু ওঁর কি হয়েছে? কেমন আছেন উনি?

মেয়েটি বললে ঃ ওঁর ডান হাতটা গেছে ভেঙ্গে। হাতটা বোধহয় চিরদিনের মত অকেজো হয়ে গেল।

সুজিত বুঝতে পারছিল না—ওর হাত ভাঙ্গার সঙ্গে তার রোজ সার্কাস দেখতে যাওয়ার কি সম্বন্ধ!

এরা তাহ'লে তাকে বেশ ভাল করেই লক্ষ্য করেছে!

সুজিত মনে মনে খুব আনন্দিত হলো। জিজ্ঞাসা করলে ঃ এখন কেমন আছেন উনি?

মেয়েটি বললে ঃ ভাল আছেন। ভেবেছিলাম, হাতটা বোধহয় কেটে ফেলতে হবে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে—তা আর হবে না। কিন্তু জানো—তোমার অবশ্য কোনও দোষ নেই—ওঁর ওই হাত ভাঙ্গার জন্য তুমিই দায়ী।

সুজিত অবাক হয়ে মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। বললে ঃ আমি?

মেয়েটি বললে ঃ হ্যাঁ। পড়ে গিয়েই উনি অচেতন হয়ে গিয়েছিলেন। জ্ঞান ফিরে এলো এই হাসপাতালে। তখন উনি বললেন ঃ খেলা দেখাবার সময় গ্যালারিতে রোজ ঠিক একই জায়গায় লালরঙের জামা পরে একটি ছেলেকে উনি দেখতেন। কাল সে ছেলেটিকে উনি দেখতে পেলেন না। বাস্, চোখের দৃষ্টি এক সেকেণ্ডের জন্য অন্য দিকে যেই চলে গেল—হাতের নিশানা গেল ফস্‌কে। রিংটা ধরতে পারলেন না। উনি পড়ে গেলেন।—তুমি রোজ যেতে, কাল শুধু যাওনি—না?

সুজিত বললে ঃ হ্যাঁ।

মেয়েটি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে ঃ কাল যদি যেতে, ওঁর এই একসিডেণ্টটা হ'তো না।

কিন্তু কেন সে যায়নি, সেকথা বলা চলে না।

একসিডেণ্ট তারই জন্য হয়েছে শুনে কেমন যেন একটা বিজাতীয় আনন্দে সুজিতের সমস্ত মন ভরে' গেল। আবার তেমনি আফ্‌শোষও তার কম হ'লো না—পড়াটা সে নিজের চোখে দেখতে পেলে না বলে'।

সুজিত বোধহয় এই কথাই ভাবছিল। হঠাৎ কেমন যেন অন্যমনস্ক হ'য়ে গিয়ে মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করে' বসলো ঃ হাতটা কখন কাটবে?

মেয়েটি বললে ঃ কাটতে বোধহয় হবে না।

সুজিত কেমন যেন হতাশ হয়ে গিয়ে বললে ঃ হবে না?

মেয়েটি শুধু 'না' বলে ঘরের ভেতরে চলে গেল।

সুজিতকেও ফিরতে হ'লো বাধ্য হয়ে। কিন্তু এতদূর থেকে পড়েছে গ্যালারির ওপর—হাতটা গেছে ভেঙ্গে, অথচ ভেতরের হাড় ভাঙ্গেনি—এও কি কখনও সম্ভব?

হাড়ের কুচি ভেঙ্গে ভেতরে থেকে যাবে? তা কখনও হয় না। ডাক্তার নিশ্চয়ই কাটবে, কেটে বের করে' দেবে ভাঙ্গা হাড়ের টুকরো।

এখানকার ডাক্তার তেমন বড় ডাক্তার নয়, তার ওপর কাটাকুটির যন্ত্রপাতিও এখানে সেরকম নেই, তাই বোধহয় কাটার কথাটা ডাক্তার চেপে যাচ্ছে।

সুজিত সারা পথ শুধু এই কথাই ভাবতে ভাবতে এলো। সে যেন তার চোখের সামনে দেখতে পেলে, টেবিলের ওপর শুইয়ে লোকটাকে অজ্ঞান করে' ফেলা হয়েছে, তারপর করাত দিয়ে হাতটি তার কাটছে। চারিদিকে রক্তের নদী বয়ে যাচ্ছে। ওই মেয়েটি বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে.....

সুজিতের পরিচিত একজন লোক পেরিয়ে যাচ্ছিল সেই পথ দিয়ে। সুজিতকে দেখেই সে বলে' উঠলো ঃ কি হ'লো সুজিত? আপন মনেই হাসতে হাসতে যাচ্ছো কেন?

সুজিত বুঝতেই পারেনি যে সে হাসছে। 'কিছু না।' বলে' সে চলে গেল।

মনে-মনে কল্পনায় যে ছবি এঁকে সুজিত আনন্দ পাচ্ছিল, তার ছায়া পড়েছে তার মুখে। তা হবেও-বা। ইংরেজি একটা বই-এ পড়েছিল ঃ Face is the index of mind.

কথাটা সত্য কি-না দেখবার জন্যে রাস্তার মোড়ে পানের যে দোকানটা ছিল, সেইখানে গিয়ে সে দাঁড়ালো। দোকানে বড় একটা আর্শীতে তার মুখের ছায়া পড়েছে।—নাঃ, পরের মন্দ ভাবা উচিত নয়।

দোকানদার জিজ্ঞাসা করলে ঃ কি দেখছো?—কোথায় গিয়েছিলে—সক্কাল-বেলা?

সুজিত তৎক্ষণাৎ বললে ঃ হাসপাতালে। জানো তো সার্কাসে খেলা দেখাতে গিয়ে একটা লোক পড়ে গিয়েছিল.....

—কেমন আছে সে?

সুজিত বললে ঃ ওর আর থাকাথাকি কি? মরার মতন পড়ে আছে। হাতটা কেটে ফেলতে হবে। বাস্, হাতটা কাটলে কি আর বাঁচবে? মরে যাবে।

আর্শীতে তাকিয়ে দেখলে, সুজিতের মুখখানা আনন্দে আবার উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

বিজ্ঞানের খবর

সন্দীপ সেন

আবর্জনা নয় সম্পদ

ডিম খাওয়ার পর তার খোলাটা সচরাচর আবর্জনা হিসেবে ফেলে দেওয়া হয়। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা বলছেন এভাবে আমরা অপচয় করছি মূল্যবান সম্পদের। কারণ ডিমের খোলা হলো বিশুদ্ধ ক্যালসিয়াম কার্বনেটের ভাণ্ডার। ক্যালসিয়াম কার্বনেট এবং এর উৎস চুনাপাথর দুশোর বেশি নানারকম গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারিক বস্তু তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। টুথপেস্ট থেকে সিমেন্ট এ সব উৎপাদনেই দরকার ক্যালসিয়াম কার্বনেট। সিমেন্ট শিল্পে ৯০ শতাংশ, ইস্পাত শিল্পে প্রায় ৬ শতাংশ, রাসায়নিক শিল্পে ৩ শতাংশ এবং চিনি ও কাগজ শিল্পে ১ শতাংশ—এভাবে যৌগটির ব্যবহার হয়। আর এই ব্যবহারের জন্য চুনাপাথর প্রকৃতি থেকে নিতে নিতে তার ভারসাম্য নষ্ট হতে চলেছে। ভারতের দেরাদুন, মুসৌরি প্রভৃতি অঞ্চলে এই ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার জন্য বিভিন্ন ক্ষয়ক্ষতিও আরম্ভ হয়েছে। তবু সম্পূর্ণভাবে এই খনিজ উত্তোলন বন্ধ করা যাবে না। তবে ডিমের খোলা যদি ব্যবহার করা হয় তবে ভারসাম্য অনেকটাই রক্ষা করা যাবে। কারণ ডিমের খোলায় বিশুদ্ধ ক্যালসিয়াম কার্বনেটের পরিমাণ ৯২ শতাংশ সেখানে চুনাপাথরে মাত্র ৫১ শতাংশ। গত বছরেই কেবলমাত্র আমাদের দেশে ১৭,৩২,৫০০ মেট্রিক টন ডিম উৎপাদিত হয়েছিল যার থেকে প্রায় ১৭,৩২,২৫০ মেট্রিক টন ডিমের খোলা নষ্ট হয়েছে। সম্পদের কী অপচয়! তাই আর ডিম খেয়ে খোলা নষ্ট নয়। সেগুলো সংগ্রহ করে যথাযোগ্য জায়গায় পৌঁছে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। হয় তো বা তার থেকে উপার্জনও হবে।

দানবীয় ক্ষুধা

বিস্বাদ বা খুব খারাপ কিছু না হলে ছত্রাক প্রায় সব জিনিসই খায়। তা বলে কমপ্যাক্ট ডিস্ক বা CD তাও খেয়ে ফেলতে হবে। হ্যাঁ, এরকমই ঘটেছে। মাদ্রিদের ন্যাশনাল সায়েন্স মিউজিয়ামের ভিক্টর কার্ডেনার হঠাৎ একদিন দেখলেন যে তাঁর একটা CD বিবর্ণ, স্বচ্ছ এবং তা থেকে আর কিছুরই মর্মোদ্ধার করা যাচ্ছে না। এই CD-টাই তিনি মধ্য আমেরিকার বেলিজ-এ নিয়ে গিয়েছিলেন একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে। গবেষকরা কারণ খুঁজতে খুঁজতে দেখলেন সেখানেই একধরনের ছত্রাকের রেণু CD-র সংস্পর্শে এসে পড়েছিল। DNA পরীক্ষায় জানা গেল মূর্তিমানের নাম জিওট্রিকাম ক্যান্ডিডাম। সাধারণভাবে এই ছত্রাকটি উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহে পরজীবীরূপে বাস করে এবং মানুষের শ্বাসনালীতে সংক্রমণ ঘটায়। এখন দেখা যাচ্ছে যে এর খিদে এত দানবীয় যে পলিমার ও অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরি CD-ও খেয়ে ফেলছে। অতএব এবার থেকে CDগুলোও সাবধানে রাখতে হবে।

আলু কিংবা টমেটো—খাদ্য নয় বস্ত্র!

এ বছরের পুজোয় নাহয় তোমার বন্ধু টেক্কা দিল হালফ্যাশানের পোশাকে। কিন্তু আগামী বছর তুমি গিয়ে বন্ধুকে বলতে পারবে, এই দেখ একেবারে হালফ্যাশানের আলু সিল্কের কাপড়। বন্ধুর চোখ টেরা হয়ে যাবে যদি না সে ইতিমধ্যে টমেটো সিল্ক কিনে থাকে। না না গল্প নয়। এক বিশেষ ধরনের মাকড়সার জিন আলু এবং টমেটো গাছে ঢুকিয়ে দিয়ে প্রচুর পরিমাণে সিল্ক প্রোটিন বা সেরিটিন তৈরির চেষ্টা হচ্ছে যা দিয়ে বয়ন উপযোগী শক্ত, মসৃণ, উজ্জ্বল সুতো তৈরি করা যাবে। যে সুতো রেশমের মতোই চিকিৎসার কাজেও ব্যবহার করা যাবে।

বিজ্ঞানী ইউ ডো কারাড এবং তাঁর সতীর্থরা জার্মানীর Institute for Pflanzenetik and Kultur Pflanzen for Schung-তে গবেষণা করে শতকরা প্রায় নব্বই ভাগ সাফল্য ইতিমধ্যে পেয়ে গেছেন। তাঁরা সোনালী সুতোর জাল বোনা এক ধরনের মাকড়সার জালবোনা সুতোর জিনোম উদ্ভিদদেহে জিনপ্রযুক্তির সাহায্যে প্রবেশ করিয়ে উদ্ভিদের প্রোটিনের মধ্যে শতকরা দু'ভাগ সিল্ক প্রোটিন উৎপাদনে সক্ষম হয়েছেন। তাঁরা এই শতকরা পরিমাণ আরো বাড়িয়ে সুতো উৎপাদন লাভজনক করার গবেষণায় এখন রত।

সবাই বিশ্বকাপের জন্য তৈরি হচ্ছে—আমরা ?

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

আগামী বছর বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। বিশ্বের প্রায় সব দেশই সেদিকে তাকিয়ে নিজের নিজের দলকে ইতিমধ্যেই গড়ে পিটে নিয়েছে। এই বছর তারা যত ম্যাচ খেলবে সবগুলোই হবে তাদের প্রস্তুতি পর্বের অনুশীলনী খেলা। কেউ যদি খেলতে না পারে, তার জায়গায় কে খেলবে কিংবা সেও যদি কোনো কারণে বিশ্বকাপে খেলার অনুপযুক্ত হয় তাহলে কে খেলবে—সবই তারা ঠিক করে ফেলেছে। ছোট্ট একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হয়ে যাবে। কোনো কারণে অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডাম গিলক্রিস্ট যদি খেলতে না পারেন তাহলে তাঁর জায়গায় খেলবেন রায়ান ক্যাম্পবেল। তিনিও যদি খেলতে না পারেন তাহলে তাঁর স্থান নেবেন ওয়েড স্কমবে।

অস্ট্রেলিয়া যে পরবর্তী বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতার জন্যে সব দিক দিয়ে তৈরি তা আমরা জানি। কিন্তু নিউজিল্যান্ড—ওদের নিয়ে কেউ এতো দিন তেমনভাবে মাথা ঘামাতো না। সে পরিস্থিতি আর নেই। সম্প্রতি নিউজিল্যান্ডের খেলা দেখে শুধু অস্ট্রেলিয়া নয়, দক্ষিণ আফ্রিকাও চিন্তিত হয়ে পড়েছে। অস্ট্রেলিয়াকে পর পর দুটি ম্যাচে হারিয়ে নিউজিল্যান্ড বুঝিয়ে দিয়েছে, আগামী বছরের বিশ্বকাপে তারাই হবে জায়েন্ট কিলার। শুধু তাই নয়, শেষ চার দলের মধ্যে থেকে নিউজিল্যান্ড যে আর সন্তুষ্ট থাকতে চায় না তার প্রমাণ ইতিমধ্যেই দিয়েছে। ব্যাটিং, বোলিং আর ফিল্ডিং—এই তিনটি বিভাগেই তারা দিয়েছে দক্ষতার পরিচয়। তাদের নিয়ে এতোদিন যারা মাথা ঘামাতো না, তারা কিন্তু এখন রীতিমতো চিন্তায় পড়েছে।

অস্ট্রেলিয়া যেমন বিশ্বকাপের জন্যে তৈরি, দক্ষিণ আফ্রিকাও তেমন প্রস্তুত সব চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে। তাদের সব থেকে বড় সুবিধে, খেলা হবে দক্ষিণ আফ্রিকায়। অস্ট্রেলিয়ার মতো দক্ষিণ আফ্রিকাও কিন্তু নিজের মাঠে দুর্ধর্ষ। অস্ট্রেলিয়ার মতো দলও হিমশিম খেয়ে যায় তাদের সঙ্গে লড়তে নেমে। দেশের মাঠে বিশ্বকাপ জেতার জন্যে দক্ষিণ আফ্রিকার খেলোয়াড়রা মরিয়া। তবে হ্যানসি ক্রোনিয়ের সময় দলের মধ্যে যে তেজীভাব ছিল তা খানিকটা কমে গেছে বলে মনে হয়। যদিও শন পোলক দক্ষ দলনেতা। বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতার কথা মনে রেখে কেউ কেউ তো এখনই হ্যানসি ক্রোনিয়েকে ফিরিয়ে আনার কথা বলছেন। ক্রোনিয়েকে আবার দলনেতার পদে ফিরিয়ে আনা হয়তো সম্ভব নয়, কারণ ম্যাচ গড়াপেটার ব্যাপারে তিনি শাস্তি পেয়েছেন। কিন্তু কথাটা তো উঠেছে। তবে তাঁরা অনেক বেশি চিন্তিত ছিলেন ড্যারিল কুলিনানের বদলি খেলোয়াড় খুঁজতে। নিল ম্যাকেনজির মধ্যে তাঁরা কুলিনানের বদলি খেলোয়াড় হবার সব গুণ খুঁজে পেয়েছেন। তবে দেশের মাঠে খেলা বলে তাঁরা অনেকটাই নিশ্চিন্ত।

চিন্তিত সৌরভ।

এই ব্যাপারে ভারত কিন্তু যেখানে ছিল সেখানেই রয়ে গেছে। চাঁদু বোরদের নেতৃত্বে ভারতীয় নির্বাচকরা বেশি সময় ব্যয় করছেন দলনেতা হিসেবে সৌরভ গাঙ্গুলিকে রাখা হবে কী হবে না তাই নিয়ে। সৌরভের ব্যাটে রান নেই। সেইটাই সমস্যা। এই মুহূর্তে দলনেতা হিসেবে গোটা ভারতে সৌরভের চেয়ে যোগ্য কেউ নেই একথা কিন্তু সকলেই মেনে নিয়েছেন। কিন্তু দলনেতা যে বছরের পর বছর অফ ফর্মে থাকবেন এটাও তো মেনে নেওয়া যায় না। কিন্তু নির্বাচকমণ্ডলী এবং একদল সাংবাদিক সৌরভের ওপর অহেতুক চাপ সৃষ্টি করে তাঁকে টেনশনে ফেলে দিচ্ছেন। ঐ অবস্থায় ব্যাট করা যে কত কঠিন তা যাঁরা খেলেন বা খেলেছেন তাঁরাই বুঝবেন। যে সময় একজন খেলোয়াড়ের দরকার সহানুভূতি ও সহযোগিতা সেই সময় তাঁর ওপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। মানসিক অশান্তি নিয়ে আর যাই হোক ব্যাট করা যায় না।

গত চ্যালেঞ্জার ট্রফির সময় তিনজন দলনেতাকে দল পরিচালনা করতে দেখা গেছে। কিন্তু অনিল কুম্বলে আর ভি.ভি.এস. লক্ষ্মণের

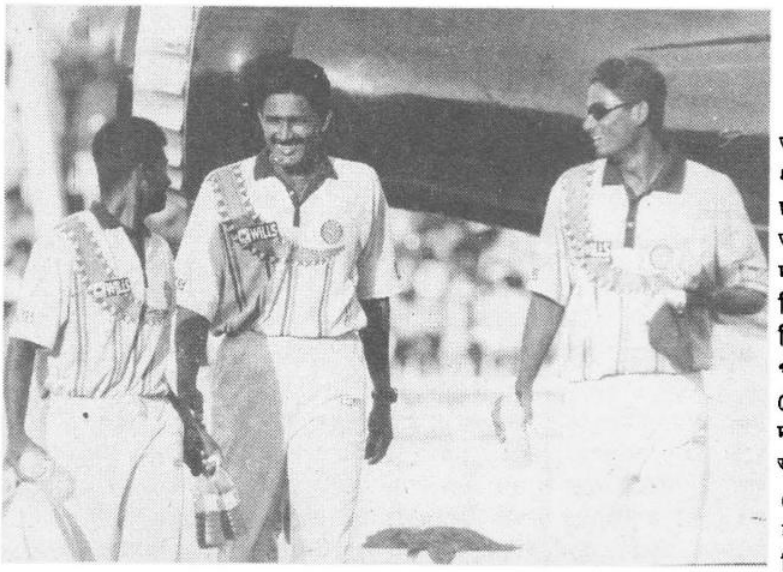

অনিল কুম্বলে সৌরভের দিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন।

মধ্যে আগ্রাসী মানসিকতা একটুও দেখা যায়নি। লক্ষ্মণ তো রীতিমতো রক্ষণাত্মক মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। সেদিক দিয়ে কুম্বলে কিছুটা ভালো, কিন্তু সৌরভ গাঙ্গুলির মতো আক্রমণাত্মক মনোভাব তাঁর নেই। যদিও বাঙ্গালোরের মানুষের ধারণা, দলনেতার দায়িত্ব পেলে কুম্বলেও ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন। অনিল কুম্বলে ক্রিকেট বোঝেন, তাঁর অনুভূতিও তীক্ষ্ণ। কিন্তু শুধু তাই দিয়ে তো আর যোগ্য দলনেতা হওয়া যায় না। তবে এ কথা ঠিক যে, অনিল কুম্বলে আর লক্ষ্মণের মধ্যে ক্লিয়ার ইনস্ট্যান্স কম। তাই সব দিক দেখে মনে হয় সৌরভ গাঙ্গুলিরই বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা পর্যন্ত ভারতীয় দলের দলনেতার পদে থাকা উচিত। তা ছাড়া একদিনের ক্রিকেটের ধকল তো কম নয়।

সৌরভ গাঙ্গুলি কোনোদিনই ঐরকম ভাবে ক্লান্তি প্রকাশ করেননি। প্যাভিলিয়ানে বসে নিজের আউট হয়ে যাওয়া নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেছেন আর ভেবেছেন দলের কথা। স্ট্র্যাটেজির কথা। কিন্তু সৌরভের ব্যাটে যদি রান না আসে তাহলে হয়তো শেষ পর্যন্ত তাঁকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে হবে রাহুল দ্রাবিড়কে। দলনেতা হিসেবে সৌরভ কিন্তু কোনোদিনই বাঙালী বা বাংলার খেলোয়াড়দের ব্যাপারে পক্ষপাতিত্ব দেখাননি। দ্রাবিড় কী তা পারবেন? মনে হয় না। তাই মনে হয়, সব দিক চিন্তা করে সৌরভ গাঙ্গুলিকেই পরবর্তী বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা পর্যন্ত দলনেতার পদে রাখাই ভালো। তবে তার আগে দরকার সৌরভের ব্যাটে রান আসা।

তা বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় ভারতীয় দলটি কেমন হবে? শচীন তেন্ডুলকর আর সৌরভ গাঙ্গুলি দুর্দান্ত ওপেনিং ব্যাটসম্যান জুটি। এঁরা দুজনে মিলে ভারতকে জয়ের পথে পৌঁছে দেবার ক্ষমতা রাখেন। তিন নম্বর ব্যাটসম্যান হিসেবে ভি. ভি. এস লক্ষ্মণই হবেন যোগ্যতম খেলোয়াড়। তাঁর জায়গাটা কেড়ে নিতে পারেন দীনেশ মঙ্গিয়া। চার নম্বরে বীরেন্দ্র শেহবাগ আসবেন। তবে তাঁকে তাঁর খেলার উন্নতি করতে হবে। ব্যাটিং-এর ধার বাড়াতে হবে। পাঁচ নম্বরে রাহুল দ্রাবিড়, ছয় নম্বরে যুবরাজ সিং সঠিক খেলোয়াড়। তবে যুবরাজকে তাঁর যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে দলে ঢুকতে হবে। সাত নম্বরে অলরাউন্ডার হিসেবে সঞ্জয় বাঙ্গারকে সকলের পছন্দ। কিন্তু তিনি এখনো যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেননি। পুরোনো বলে তিনি অবশ্য ভেল্কি দেখাতে পারেন। উইকেটরক্ষক হিসেবে দীপ দাশগুপ্ত আর অজয় রাতরার মধ্যে পাল্লা ভারী অজয়ের দিকে। অন্তত একদিনের খেলায়। টেস্টে অবশ্য দীপ যোগ্য উইকেটরক্ষক। এরপর হরভজন সিং, অনিল কুম্বলে আর শরণদীপ সিং দলে আসবেন তবে হরভজন আর শরণদীপের মধ্যে কে খেলবেন তা নির্ভর করবে পিচ ও পরিস্থিতির ওপর। মিডিয়াম পেসার হিসেবে শ্রীনাথের সহযোগী হবেন অজিত আগারকার কিংবা টিনু জোহানান।

তবে বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতার এখনও এক বছরের ওপর দেরি আছে। এর মধ্যে অনেক কিছু বদলে যেতে পারে। তবে এই মুহূর্তে বিশ্বকাপের জন্যে দল গড়া হলে যাঁদের খেলার সম্ভাবনা সব থেকে বেশি তাঁরা হলেন—

সৌরভ গাঙ্গুলি (দলনেতা), শচীন তেন্ডুলকর, দীনেশ মঙ্গিয়া, ভি. ভি. এস লক্ষ্মণ, বীরেন্দ্র শেহবাগ, রাহুল দ্রাবিড়, সঞ্জয় বাঙ্গার, অজয় রাতরা, অনিল কুম্বলে, হরভজন সিং, জাভাগল শ্রীনাথ, অজিত আগারকার, টিনু জোহানান ও যুবরাজ সিং।

এবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক ১৯৭৫ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় ভারতের পারফরমেন্সের ওপর :

সাল	স্থান	খেলা	ভাঃ জয়	ভাঃ পরা	পরিত্যক্ত	সাফল্য (শতকরা)
১৯৭৫	ইংলন্ড	৩	১	২	০	৩৩.৩৩
১৯৭৯	ইংলন্ড	৩	০	৩	০	০.০০
১৯৮৩	ইংলন্ড	৮	৬	২	০	৭৫.০০
১৯৮৭	ভারত, পাকিস্তান	৭	৫	২	০	৭১.৪২
১৯৯২	অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড	৮	২	৫	১	৩১.২৫
১৯৯৬	ভারত, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান	৭	৪	৩	০	৫৭.১৪
১৯৯৯	ইংলন্ড	৮	৪	৪	০	৫০.০০
মোট		৪৪	২২	২১	১	৫১.১৩

উইকেট দখলের পর হরভজন সিংকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন খেলোয়াড়রা।

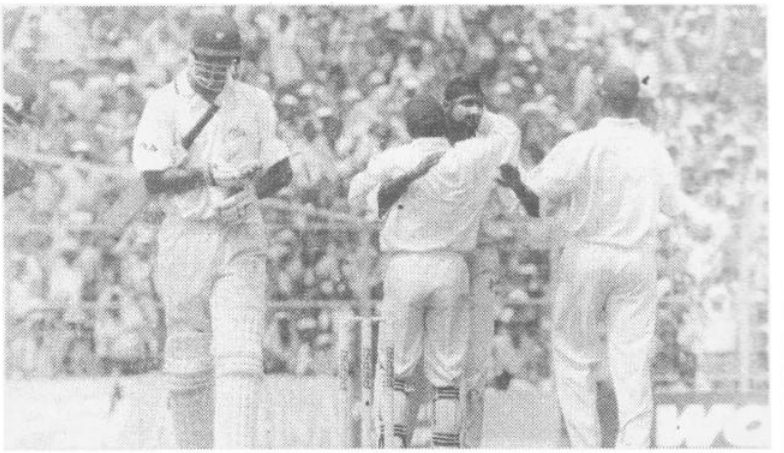

লড়াই যাদের সম্বল

শিবপুরের রিজার্ভ পুলিশ লাইনের মুষ্টিযুদ্ধের রিং সকাল-সন্ধ্যেয় গমগম করে। অনেক ছেলেমেয়ে সেখানে অনুশীলন করে। একটা ছেলে রোজ বিকেলে এসে রিং-এর পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। তার দু' চোখে শেখার আগ্রহ। কিন্তু পোশাক-আশাকই বুঝিয়ে দেয়, ছেলেটি দারিদ্র্যসীমার নিচের স্তরের সন্তান। তাই কেউ এগিয়ে যায় না তার সঙ্গে কথা বলতে। সেও বলে না।

ব্যাপারটা চোখ এড়ায়নি হাওড়া জেলা মুষ্টিযুদ্ধ সংস্থার কোচ তপন বসুর। প্রথম দিন থেকেই ছেলেটির সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহল। সেদিন তাই এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কি বক্সিং শিখবে?

হ্যাঁ। আপনি আমায় শেখাবেন?

কেন শেখাবো না! তবে তার আগে তোমার বাবা-মার অনুমতি নিতে হবে যে। তোমার নাম কি?

বাবা তো নেই! অধেশ! অধেশকুমার সিংহ।

ঠিক আছে তোমার মার সঙ্গেই কথা বলব।

সেদিন সন্ধ্যের পর তপনবাবু গিয়ে হাজির হলেন পুলিশ লাইনের পাশের বস্তির এক ঝুপড়িতে।

মা তপনবাবুকে দেখে কপাল চাপড়ান। বলেন, ওর বাবা বেঁচে থাকলে কি আর ওঁদের এই অবস্থা হয়! বছর পাঁচেক আগে শিবপুর জুটমিলের কর্মী অধেশের বাবা চন্দ্রভান মারা যান। ফলে বেঁচে থাকার জন্য অধেশকে কাজে নেমে পড়তে হয়েছে।

অধেশের মর্নিং স্কুল। সকাল বেলায় স্কুলে যায়। ক্লাশ এইটের পড়া এমন কিছু কমও নয়। কিন্তু পড়ার সময়ই পায় না। ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তার সময় বাঁধা। ভোর ছটায় শালিমার হিন্দি হাই স্কুলে চলে যায়। স্কুল থেকে ফিরেই সে যায় শিবপুর জুটমিলের পাশে ছোট একটি গুমটিতে। সেখানে সে পুরনো কাগজ বেছে নেয়। দুপুর তিনটে পর্যন্ত সে কাগজ বাছে। সেখান থেকে অনুশীলন সেরে বাড়ি ফিরতে প্রায় রোজই ৬টা বেজে যায়।

অনূর্ধ্ব ১২ বছরের বিভাগে সে নাম দিলো এবং রাজ্য চ্যাম্পিয়ান হয়ে গেল। রাজ্য চ্যাম্পিয়ান হবার কিছু পরেই সে জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায়ও ব্রোঞ্জের পদক পেয়েছে। অধেশ চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল তার আন্তরিক প্রচেষ্টা আর ঐকান্তিক ইচ্ছার জন্যে। সকাল বেলায় স্কুল। স্কুল থেকে কাগজ, শিশিবোতল বিক্রির দোকানে পুরনো খবরের কাগজ বাছার কাজ। তারপর অনুশীলন। স্কুলের পড়া রাত্তির বেলায়। গত চার-পাঁচ বছর অধেশের এই রুটিন। সে রুটিনের কোনো পরিবর্তন আজও হয়নি। রাজ্য চ্যাম্পিয়ান ছেলেটির পাশে কেউ এসে দাঁড়াননি। কেউ বাড়িয়ে দেননি সাহায্য ও সহযোগিতার হাত। শুধু তপনবাবু লেগে আছেন। অধেশকে রাজ্য চ্যাম্পিয়ান করেছেন। তাঁর লক্ষ্য এবার আরও বড়, আরও কঠিন—তিনি চাইছেন অধেশকে জাতীয় চ্যাম্পিয়ান করতে। অধেশ ও তপন বসুর এই স্বপ্ন আজ না হয় কাল সফল হবেই। সেই দিনটির দিকে আমরাও তাকিয়ে থাকবো।

চমকে দিয়েছে দোলা

পুরো নাম দোলা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাড়ি বরানগরে। মহারানী কাশীশ্বরী কলেজের সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্রী। এই বছর দোলা ভারতের সেরা মহিলা তীরন্দাজ হয়েছে। সম্প্রতি কাশীপুর অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরি ক্লাবের মাঠে ২২তম জাতীয় তীরন্দাজ প্রতিযোগিতা হয়ে গেল। এই প্রতিযোগিতায় দোলার পারফরমেন্স সকলকে চমকে দিয়েছে। একটি-দুটি নয়—পাঁচ পাঁচটি সোনার পদক জিতে দোলা ভারত শ্রেষ্ঠত্বের খেতাব লাভ করেছে।

দোলার ভাগ্য ভালো, সে টাটায় কাজ পেয়ে গেছে। মাইনে আর বৃত্তির টাকা দিয়ে সে ধনুক কিনেছে। এক একটা ধনুকের দাম খুব কম করে সত্তর-আশি হাজার টাকা। তীর একটা একশ টাকা। বাংলার কেউ দোলার পাশে দাঁড়াননি। কিন্তু তার দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল টাটা। চাকরির সুবাদে দোলা হয়ে গিয়েছিল বাংলার বদলে বিহারের প্রতিনিধি। আর এবার থেকে ঝাড়খণ্ডের প্রতিনিধি।

দোলা ১১ বছর বয়সে তীরন্দাজ হবার লক্ষ্যে তীর ছুঁড়তে শুরু করে। প্রথমে সাব জুনিয়ার বিভাগে। ১৯৯২-৯৩ সালে সাব জুনিয়ার পর্যায়ে সে চ্যাম্পিয়ান হয়। তারপর সাব জুনিয়ার থেকে জুনিয়ার, আর এখন সিনিয়ার বিভাগের প্রতিনিধি দোলা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার নিয়ে টানা তিনবার সে জাতীয় চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। এবারের জাতীয় তিরন্দাজী প্রতিযোগিতায় দোলা মোট পাঁচটি সোনার পদক পেয়েছে। পেয়েছে ভারত সেরা মহিলা তীরন্দাজের সম্মান।

দোলা বন্দ্যোপাধ্যায়ের খুব ইচ্ছে এশিয় ক্রীড়া, ওলিম্পিকে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করে। সেইদিকে নজর রেখে দোলা এখন অনুশীলন করে যাচ্ছে। তবে ভয় একটাই, ধনুকটা না ভেঙে যায়। ভেঙে গেলে আর হয়তো কেনা হবে না। এত টাকা যোগাড় করা মুশকিল। দোলার বক্তব্য এশিয়াড থেকে সোনা জিতে আসতে না পারলে তাকে নাকি কেউ মনে রাখবে না। তাই এখন দোলা কোরিয়ান কোচ চুলিন সুইয়ের কাছে অনুশীলন করছে। তৈরি হচ্ছে পরবর্তী এশিয়াডের জন্যে।

বোলার পরিবর্তনের ফাঁকে টীমমেটদের সঙ্গে কথা বলছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

স্পোর্টস কুইজ

(প্রত্যেক প্রশ্নের সঙ্গে চারটি করে উত্তর দেওয়া আছে। তিনটি ভুল। একটি ঠিক। উত্তর ৪৫ পাতায়)

প্রশ্ন ঃ

১। ১৯২৮ থেকে কোন সাল পর্যন্ত ভারত টানা অর্থাৎ অবিচ্ছিন্নভাবে হকিতে সোনা জিতেছে ওলিম্পিকে?

- ১৯৬০
- ১৯৫৬
- ১৯৫৮
- ১৯৬১

২। কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত ক'বার একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচে ৫টি করে উইকেট পেয়েছেন?

- ২ বার
- ১ বার
- একবারও নয়
- ৩ বার

৩। ভারতের কোন টেনিস খেলোয়াড়ের বাবা প্রাক্তন ওলিম্পিক হকি খেলোয়াড় এবং মা নামকরা বাস্কেটবল খেলোয়াড়?

- মহেশ ভূপতি
- রমেশ কৃষ্ণণ
- লিয়েন্ডার পেজ
- আখতার আলি

৪। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলার নিষেধাজ্ঞা উঠে যাবার পর দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম কোন দেশের সঙ্গে টেস্ট খেলেছিল?

- ভারত
- ইংলন্ড
- অস্ট্রেলিয়া
- শ্রীলঙ্কা

৫। ক্রিকেট কোন দেশে প্রথম খেলা হয়েছিল?

- অস্ট্রেলিয়া
- দক্ষিণ আফ্রিকা
- ইংলন্ড
- নিউজিল্যান্ড

৬। ইংলন্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক ও বর্তমানের দুর্ধর্ষ টিভি ভাষ্যকার টনি গ্রেগের নামে ক্রিকেট মাঠের বিশেষ কোন জায়গাটা 'গ্রেগ পয়েন্ট' নামে পরিচিত?

- সিলি পয়েন্ট
- গ্যালি
- পয়েন্ট
- কভার পয়েন্ট

৭। খেলার মাঠ থেকে সব থেকে বেশি রোজগার কোন খেলোয়াড়ের?

- টাইগার উড
- মাইকেল জর্ডন
- মাইক টাইসন
- দিয়েগো মারাদোনা

৮। সব থেকে বেশি একদিনের ম্যাচ খেলেছেন কে?

- মহম্মদ আজহারউদ্দিন
- স্টিভ ওয়া
- ওয়াসিম আক্রাম
- ডেসমন্ড হেইন্স

৯। তিন তিনবার ছক্কা মেরে সেঞ্চুরি করেছেন কোন ভারতীয় ক্রিকেটার?

- কপিলদেব
- শচীন তেন্ডুলকার
- সৌরভ গাঙ্গুলি
- রাহুল দ্রাবিড়

১০। গল্ফ খেলার সময় খেলোয়াড়ের সঙ্গে যিনি ব্যাগ-ট্যাগ বয়ে নিয়ে যান তাঁকে কী বলা হয়?

- পোর্টার
- অ্যাসিসটেন্ট গল্ফার
- ক্যাডি
- পিওন

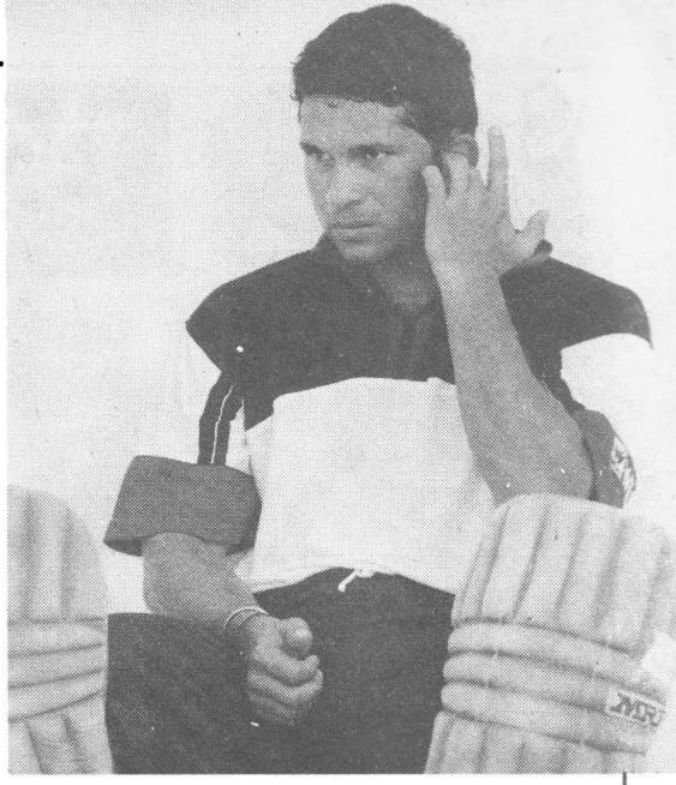

নেট প্র্যাকটিশের অবসরে শচীন তেন্ডুলকার।

উক্তি

টেস্টে আমি রান পাচ্ছি না ঠিকই, কিন্তু একদিনের খেলার স্ট্যাটিসটিক্স কী এ কথা প্রমাণ করে, ওয়ান ডে ম্যাচে আমি রান পাচ্ছি না।

সৌরভ গাঙ্গুলি

(সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে)

একদিনের ছটি ম্যাচে সৌরভই তো অধিনায়ক। দেখা যাক ও কেমন খেলে। তারপর না হয় নতুন অধিনায়কের কথা ভাবা যাবে।

চাঁদু বোরদে

(সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে)

সৌরভ বড় ব্যাটসম্যান। বিশেষ কোনো কারণে ও রান পাচ্ছে না। যে ছোটখাটো দুর্বলতা আছে সেগুলো শুধরে নিয়ে সে যে কোনো দিন নিজেকে ফিরে পেতে পারে। সেই দিনটির দিকে আমরা সাগ্রহে তাকিয়ে আছি।

নবজ্যোৎ সিং সিধু

(টিভিতে সৌরভের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে)

যে যাই বলুক, আমিও কম উল্টো-পাল্টা কথা বলিনি, তবু স্বীকার করতে আমার দ্বিধা নেই যে এই মুহূর্তে সৌরভ গাঙ্গুলিই ভারতের যোগ্যতম অধিনায়ক। একদিনের ক্রিকেটে ওর আর শচীনের জুটি আমাদের সব সময় চিন্তায় রাখে।

স্টিভ ওয়া

(ভারত থেকে ফিরে যাবার কিছুদিন পরে এক সাক্ষাৎকারে)

আমার ট্রেনিং-এ নিশ্চয়ই কোনো গলদ আছে, তাই দলের এই হাল। আমি কোচ থাকি না থাকি, ক্লাবের সম্মান তোমরা রাখার চেষ্টা কোর।

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

(জাতীয় ফুটবল লীগে পর পর তিনটি ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের পরাজয়ের পর খেলোয়াড়দের ডেকে এ কথা বলেছিলেন)

স্পোর্টস কুইজের উত্তর ঃ

১। ১৯৫৬
২। ২ বার
৩। লিয়েন্ডার পেজ
৪। ভারত
৫। ইংলন্ড
৬। সিলি পয়েন্ট
৭। মাইকেল জর্ডন
৮। মহম্মদ আজহারউদ্দিন
৯। শচীন তেন্ডুলকার
১০। ক্যাডি

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড

দেব সাহিত্য কুটীরের সব রকম বই-এর প্রাপ্তিস্থান ঃ

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

দেব লাইব্রেরী
১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

চক্রবর্তী চ্যাটার্জী অ্যান্ড কোং
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

বিংশ শতাব্দী
৭৫ সি, পার্ক স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০১৬

সিগ্যাল বুক সেন্টার
৩১, এস পি মুখার্জী রোড, ভবানীপুর, কলকাতা-৭০০ ০২৫

আই এস পি কে
৫১, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭১

উঠছে যারা

বীরু বসু

সরস্বতী মান্না

ওকে দেখলে কষ্ট হবে। মনে হবে কতদিন না খেয়ে আছে। তার চেয়েও বেশি কষ্ট হবে ওর বাসস্থান দেখলে। কোন্নগর বারোমন্দির ঘাট থেকে ওদের বাড়ির দূরত্ব খুব সামান্য। আশপাশে সুন্দর সুন্দর ঘরবাড়ি গড়ে উঠলেও ৪৬ জি. টি. রোড-এর ধারের যে ছোট্ট বাড়িটি দাঁড়িয়ে রয়েছে তা খুবই সামান্য। অভাব-অনটনে বাড়ির পরিবেশ পাল্টানো সম্ভব হয়নি। হবেই বা কী করে? বাবা রিষড়া বাক্‌খালে জি. টি. রোড-এর ধারে বসে মাছ বিক্রি করেন। তাও মাসে পনেরো দিন। বাকি দিনগুলি তাঁকে ঘরে বসেই কাটাতে হয়। তবুও নিজেকে অসহায় ভাবতে রাজী নন বাবা নিমাই মান্না। তাঁর আশা আগামী দিনে এর পরিবর্তন ঘটবে। কারণ খেলোয়াড় হিসেবে মেয়ে উঠে আসায় তিনি এখন নতুন স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন।

সম্প্রতি রাজ্য স্কুল মিটে চ্যাম্পিয়ন হতে পেরে দারুণ খুশি তেরো বছরের মেয়ে সরস্বতী মান্না। এর আগে বহুবার প্রতিযোগিতায় অংশ নিলেও চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি সে। এবারই প্রথম রাজ্য মিটে অংশ নিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে সরস্বতী। দক্ষিণ কলকাতার সোনারপুরে বসেছিল এবারের রাজ্য স্কুল জিমন্যাস্টিকসের আসর। পরিচালনায় সোনারপুর জিমন্যাসিয়াম। বারেন্দ্রপাড়ায় অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় সরস্বতী অংশ নিয়েছিল অনূর্ধ্ব ১৪ সাবজুনিয়র বিভাগে। চারটি বিভাগে অংশ নিয়ে দুটি বিভাগে স্বর্ণপদক লাভ করেছে সে। সরস্বতী সোনা জিতেছে আনইভন বার এবং বিম ব্যালেন্সে। প্রতিযোগিতায় সর্বোচ্চ পয়েন্ট সংগ্রহ করায় সেরা হওয়ার খ্যাতি অর্জন করে। ফলে হরিয়ানার আম্বালাতে অনুষ্ঠিত জাতীয় স্কুল গেমসে সুযোগ পেয়ে যায় কোন্নগর আশালতা বালিকা বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রীটি।

লেখাপড়া এবং খেলাধুলোয় সরস্বতীর উঠে আসার কাহিনীটি বড়ই করুণ। বৎসরান্তে স্কুলে ১৭৫ টাকা জমা দিতে হয়। পরীক্ষা বাবদ জমা দিতে হয় ৪০ টাকা। এই অর্থ মাকে ঘরে বসে হলুদের প্যাকেট ভরে রোজগার করতে হয়। যার মূল্য মাসান্তে তিনশো টাকা। খেলোয়াড় হিসেবে স্বীকৃতি পেলেও স্কুল থেকে কোনো রকম সাহায্য পায়নি সরস্বতী। তবুও ওর নিষ্ঠা, একাগ্রতা এবং বড় হওয়ার ইচ্ছা লড়াই করার পথ দেখিয়েছে তাকে। সরস্বতী লেখাপড়া ভালবাসে। ভালবাসে খেলতে। সে কারণেই দুপুরে স্কুল এবং বিকেলে ক্লাব এখন ওর নিত্যদিনের রুটিন।

লেখাপড়ার মতোই খুব অল্প বয়স থেকে জিমন্যাস্টিক শিখতে থাকে সরস্বতী। চার বছর বয়সে ভর্তি হয়ে যায় পাড়ার কিশোর ব্যায়াম প্রতিষ্ঠানে। প্রশিক্ষক হিসেবে পেয়ে যায় প্রাক্তন জাতীয় জিমন্যাস্ট সুতেজ সাত্বিককে। পরে নূতন চক্রবর্তী। তাতেই পরিণত হয়ে ওঠে আর্টিস্টিক জিমন্যাস্টিকসে। প্রথমে জেলা, পরে অঞ্চলভিত্তিক, তারপর রাজ্য জিমন্যাস্টিকসে সাফল্য পায় সরস্বতী। সাফল্যের চাবিকাঠি ওর নিবিড় অনুশীলন। অনুশীলনে কোনো কামাই নেই তার। ওর দিদি লক্ষ্মী মান্নাও জিমন্যাস্ট ছিলেন। দিদির কাছ থেকেই ক্লাবকে মনে-প্রাণে ভালবাসতে শিখেছে সরস্বতী। সরস্বতীর মা কল্পনাদেবী জানিয়েছেন খেলাধুলোয় ওর অভিভাবক হলেন জেঠু মোহিত পাল (কিশোর ব্যায়াম প্রতিষ্ঠানের সদস্য)। তিনি না থাকলে খেলোয়াড় হিসেবে সরস্বতীর উঠে আসাটা কষ্টকর হয়ে দাঁড়াতো। জিমন্যাস্টিক শিখতে গেলে যে ধরনের গেঞ্জি বা প্যান্টের প্রয়োজন হয় তা কেনার ক্ষমতা সরস্বতীর বাবা-মায়ের নেই। ফলে তাকে নির্ভর করতে হয় জেঠুর ওপর। এখন প্রশ্ন কত টাকা খরচ করে জেঠু সরস্বতীকে গেঞ্জি-প্যান্ট কিনে দেন। সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে ক্লাবে বসেই জানা গেল সেই রহস্যের কথা। যে সমস্ত খেলোয়াড়ের প্যান্ট এবং গেঞ্জি ছোট হয়ে যায় সেগুলো সংগ্রহ করাই হলো ক্রীড়াপ্রেমী মোহিত পালের আসল কাজ। এই ছোট হওয়া গেঞ্জি এবং প্যান্ট পরেই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় সরস্বতী। সাফল্য পেলে মোহিতবাবু খুশি হন। কিন্তু কতদিন এভাবে মোহিতবাবু আর টানতে পারবেন? এমন কোনো সংস্থা বা ক্রীড়াপ্রেমিক নেই যাঁরা অন্ততপক্ষে দুঃস্থ মেয়ে সরস্বতীর খেলাধুলোর ব্যাপারটা চালিয়ে যেতে পারেন? এতে আর কিছু হোক বা না হোক বাংলার জিমন্যাস্টিকসের মান কিন্তু বাড়বে। কারণ এবারের জাতীয় গেমসে ফুটবল, হকি, অ্যাথলেটিকস, সাঁতার এবং অন্যান্য খেলাগুলি যেখানে ব্যর্থ তখন জিমন্যাস্টিক বাংলাকে কতকগুলি পদক এনে দিয়েছে। কে জানে আগামী জাতীয় গেমসে হয়তো সরস্বতীই এই পদক বাংলাকে এনে দেবে।

শরীর গড়তে যোগ ও ব্যায়াম

তুষার শীল

কালীবর বেদান্তবাগীশ কর্তৃক ১২৯১ (বাংলা) সালে সঙ্কলিত ও অনুবাদিত 'পাতঞ্জল দর্শন ও যোগ-পরিশিষ্ট' গ্রন্থে বলেছেন আমরা সবাই যোগ করি তাই আমরা সবাই যোগী। কিন্তু যেহেতু নিজেদের অজান্তেই যোগের বিভিন্ন ক্রিয়া-কলাপ করে চলেছি তাই যোগ সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন করলে সাধারণত উত্তর দিয়ে থাকি, যোগ কী তা জানি না তো। কারণ হিসাবে উনি বলছেন আমরা মাঝে মাঝে বাহ্যজ্ঞানশূন্য ও তন্ময় হয়ে যখন কাজ করি, পাশ দিয়ে কেউ চলে গেলে এমনকি ঢাক-ঢোল বাজিয়ে গেলেও শুনতে পাই না, হাতি চলে গেলেও দেখতে পাই না। অর্থাৎ ঐ সময়টুকুতে একজন মানুষ যোগী হয়ে যান এবং বাহ্যজ্ঞান লোপ পাবার ফলেই ক্ষণকালের জন্য যোগী হয়েও তিনি তা বুঝতে পারেন না।

যাঁরা নিয়মিত সজ্ঞানে যোগ করেন তাঁরা বলেন উপরের ঘটনাটা যোগী স্বইচ্ছায় ঘটিয়ে থাকেন। যা যোগের ভাষায় ধ্যানের পর্যায়ে পড়ে। নির্দিষ্ট কাজ করার সময় মনকে সব কিছু থেকে প্রত্যাহার করে নিয়ে সেই কাজেই মন নিবিষ্ট রাখেন। এই 'প্রত্যাহার'ই হলো অষ্টাঙ্গ যোগের পঞ্চম অঙ্গ। এখন আজকের আসন ঃ

এটি একটি শরীর গরম করে নেওয়া পর্যায়ের (warm up) আসন। বজ্রাসনে বসে অর্থাৎ সামনের মেয়েটির ন্যায় হাঁটু মুড়ে পায়ের পাতা উল্টে দুই বুড়ো আঙুল পরস্পর লাগিয়ে মাটিতে পেতে বস। দুই হাত মাটির সমান্তরালে তুলে দাও সামনের দিকে কাঁধের সমান সমান। এখন ধীরে ধীরে শ্বাস নিতে নিতে হাত দুটিকে দু'পাশে নিয়ে যাও পিছনের মেয়েটির ন্যায়। পরমুহূর্তে ধীরে ধীরে শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে হাত দুটি আবার সামনে নিয়ে চলে এস। হাত মুঠি করে বা আঙুলগুলিকে ছড়িয়েও রাখতে পারো। এভাবে আট থেকে দশ বার অভ্যাস করো।

অনেক যোগী এটিকে পাশ্চাত্য প্রাণায়াম নামে অভিহিত করেছেন। যখন হাত পাশের দিকে নিয়ে যাবে, শ্বাস নেবার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা করবে ফুসফুসে যতটা সম্ভব বাইরের অক্সিজেন যুক্ত বায়ু শরীরে ঢুকিয়ে নিচ্ছ এবং যখন শ্বাস ছাড়ছ, কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ শরীর থেকে বার করে দিচ্ছ। এই অক্সিজেনই শরীরে রক্তের সঙ্গে মিশে গিয়ে পৌঁছে যায় কোষে কোষে এবং সাহায্য করে দহন ক্রিয়ায়। যোগায় শরীরের প্রয়োজনীয় তাপ, এনার্জি অর্থাৎ কাজ করার ক্ষমতা, কোষগুলিকে রাখে সজীব ও সক্রিয় আর ত্যাগ করে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও দূষিত পদার্থ যা রক্তের মাধ্যমে ফেরৎ আসে ফুসফুসে, কিডনিতে, ঘর্মগ্রন্থি ইত্যাদি নানান জায়গায়। তাই এই প্রাণায়ামরূপী ব্যায়ামটি করার সময় যদি এই উপকারিতাটি মনে রাখি এবং চিন্তা করি ব্যায়ামের সঙ্গে সঙ্গে এই কাজগুলি হচ্ছে তাহলে উপকার বেশি পাব।

এই প্রাণায়াম করলে ফুসফুসের সাহায্যকারী পেশীগুলির খুব ভালো ব্যায়াম হয়, বৃদ্ধি পায় ফুসফুসের বায়ুধারকত্ব ক্ষমতা। ফলস্বরূপ হাঁপানি রোগীরা খুব উপকার পায়। কাঁধ ও বুকের অতিরিক্ত চর্বি কমে যায়। যাদের বুকের মাংসপেশীর গঠন ভালো নয় বা বুকের গঠন খুবই ছোটো তারা নিশ্চয়ই এই ব্যায়ামটিতে উপকার পাবে। এটি দু-তিন ক্ষেপ অভ্যাস করবে। যাদের বজ্রাসনে বসতে অসুবিধা হবে বা হাঁটুতে ব্যথা আছে তারা দাঁড়িয়ে অভ্যাস করবে ছবির পিছনের মেয়েটির ন্যায়।

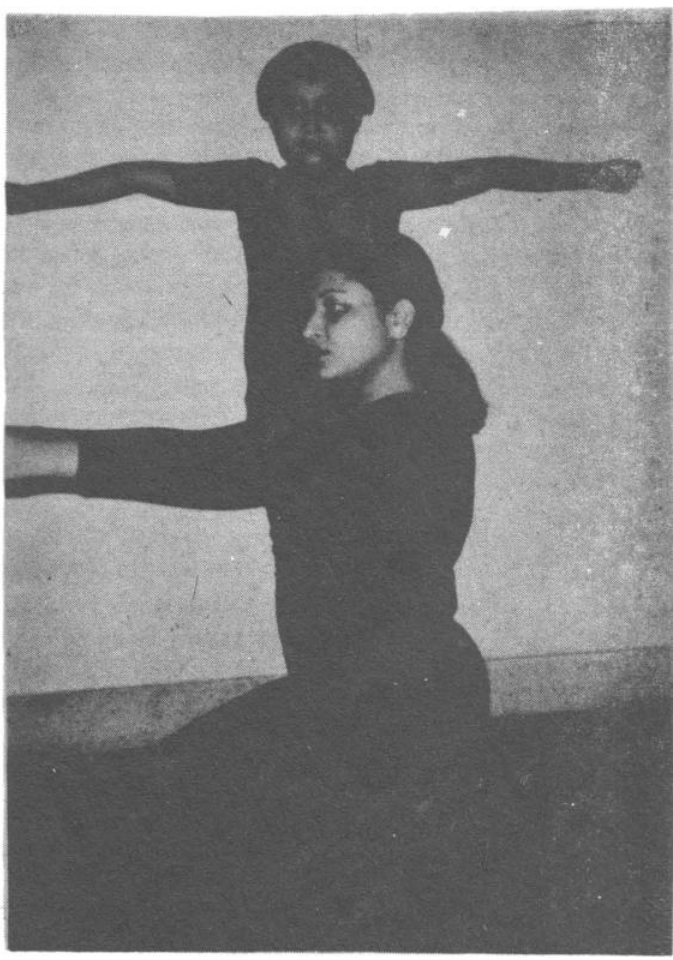

মনের জানলা

জগদিন্দ্র মণ্ডল

**[অধ্যাপক, ফলিত মনোবিজ্ঞান বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
প্রাক্তন ডিন (বিজ্ঞান) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়]**

প্রশ্ন ঃ আমি B.A. প্রথম বর্ষের ছাত্র (ইংরেজি অনার্স)। আমি নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলে। কয়েকটা টিউশনি করে পড়াশুনার খরচ নির্বাহ করি। কারো কাছে এজন্য কোনো সাহায্য চাই না। আমার সমস্যা হলো আমার বাবা-মা শিক্ষিত না হবার দরুন আমার বন্ধুবান্ধবের কাছে আমার সম্বন্ধে এমন সব মন্তব্য করেন (বিশেষত আমার মা) যাতে আমি খুবই আঘাত পাই। এছাড়া আমার মা আমার বন্ধুদের বাড়িতে টাকার বিনিময়ে কাজ করেন। এতে আমার খুবই আত্মসম্মানে লাগে। মাকে তাঁর দোষত্রুটি সম্বন্ধে বোঝাতে গেলে তিনি বুঝতে চান না। এজন্য আমার জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। বাঁচতে ইচ্ছে হয় না। দয়া করে আমাকে সুপরামর্শ দিয়ে বাধিত করুন।

নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

উত্তর ঃ তোমাকে প্রথমেই আমার আন্তরিক শুভকামনা জানাই, জানাই অভিনন্দন তোমার সদিচ্ছা, অধ্যবসায় ও উচ্চাভিলাষের জন্য। তুমি লিখেছ তুমি নিম্নবিত্ত ঘরের ছেলে, বাবা-মার লেখাপড়াও কম। তুমি নিজের পড়ার খরচ নিজের উপার্জিত অর্থে নির্বাহ কর। তোমার এই যে স্ব-নির্ভর হওয়ার প্রচেষ্টা—এর জন্য তোমাকে আমাদের অনেক উচ্চাসনে স্থান দিতে হয়। তোমার এই পরিচয়ই তো তোমার গৌরব ও ভূষণ, আর তোমার মতো ছেলেকে যে বাবা-মা কষ্ট করে হলেও বড় করে তুলেছেন, সামাজিক প্রতিকূলতার মধ্যেও লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষের মতো মানুষ করে তুলতে চাইছেন, সেই বাবা-মা কি কখনো ছোট হন? তোমার মা তোমার বন্ধুদের বাড়িতে টাকার বিনিময়ে কাজ করেন, এতে তোমার খুবই আত্মসম্মানে লাগে, লিখেছ। তোমার মা'র মতো মা কয়জন আছেন, পরিশ্রম করে সৎভাবে অর্থ উপার্জন করে, তোমার বাবাকে সাহায্য করছেন? সংসার প্রতিপালনে যৌথদায়িত্ব নিয়ে, সন্তানের বড় হয়ে ওঠার জন্য, কারো কাছে হাত না পেতে, ঘরে বাইরে কাজ করেন যে মা, তাঁকে মূল্য দিতে শেখো। তথাকথিত ঠুনকো মূল্যবোধের মাপকাঠিতে নিজেকে ছোট ভেবো না—নিজের মাকেও না। তোমার বাবা-মা লেখাপড়া কম জানেন, তুমি লেখাপড়া শিখে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তাঁদের লেখাপড়া শিখতে না পারার দুঃখ ঘোচাও। তোমার বড় হওয়াই, আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে আসল বড় হওয়া। ধনী বাবা-মা'র যে ছেলে পাঁচজন গৃহশিক্ষক রেখে লেখাপড়া শিখছে তার থেকে তোমার ও তোমার বাবা-মার কৃতিত্ব অনেক বেশি। আমাদের এই উন্নয়নশীল দেশে তোমার মতো অবস্থার ছেলেমেয়েই তো বেশি। তোমার মাকে তাঁর 'দোষত্রুটি' নিয়ে, বিনম্রভাবে বুঝিয়ে বল, ঠিক তিনি সামলে নেবেন। তোমার মা শিক্ষার সুযোগ না পেয়ে অশিক্ষিত হতে পারেন, শিক্ষার সুযোগ পেয়েও অনেকের মতো কুশিক্ষিত তো নন।

জীবনে সহজ হয়ে, স্ব-নির্ভর হয়ে, যথার্থ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠ—এই বাবা-মাকে নিয়েই তুমি মাথা উঁচু করে জীবনে বাঁচার মতো বেঁচে থাকবে। হতাশ হবে না।

প্রশ্ন ঃ শুকতারায় 'মনের জানলা' বিভাগে আপনার পরামর্শ দেখে আমি আশাবাদী যে আপনি আমার সমস্যা সমাধান করবেন। আমি বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র এবং ২০০২ সালের উচ্চমাধ্যমিকের পরীক্ষার্থী। আমি মাধ্যমিকে জীবনবিজ্ঞান, অঙ্ক ও ভৌতবিজ্ঞানে লেটার নিয়ে পাশ করেছি। জানি না কি কারণে আমি একাদশ থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষায় ফেল করি। যারা হাফইয়ার্লি পরীক্ষায় আমার থেকে কম নাম্বার পেয়েছে তারা পাশ করে গেছে, আমি পারিনি। আমার নিজেকে খুব দুর্বল মনে হচ্ছে, মনে হচ্ছে আমি সব বন্ধুর থেকে পিছিয়ে পড়েছি। আমি বাড়ির বাইরে বের হতে লজ্জা পাচ্ছি। কারণ পাড়াতে আমিই একমাত্র ছেলে যে মাধ্যমিকে ভাল ফল করেও, একাদশ শ্রেণীর পরীক্ষায় ফেল করেছে। এখন এই অবস্থায় আমি নিঃসঙ্গ অসহায় বোধ করছি। আমার মনে হচ্ছে আমি জীবন-যুদ্ধে হেরে গেছি। আমার মাঝে মাঝে আত্মহত্যা করার প্রবৃত্তি আসছে। আমি কি করবো দয়া করে জানাবেন। —উত্তর ২৪ পরগনা

উত্তর ঃ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভাল ফল করেছিলে—এটা তো খুবই আশার কথা। এটা মোটামুটি প্রমাণ করে যে তোমার মেধা আছে। কিন্তু একটা পরীক্ষায় ভাল ফল করেছ বলে, সব পরীক্ষায় ভাল ফল হতেই থাকবে এমন কোনো নিয়ম নেই। তুমি নিশ্চয়ই মাধ্যমিকে ভাল ফল করে, কিছুটা পরিতৃপ্তির মেজাজে উচ্চমাধ্যমিকে পড়াশুনায় ততটা মন দাওনি। তাছাড়া মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের পঠন-পাঠনের মধ্যে অনেক গুণগত তফাৎ আছে। মাধ্যমিক পরীক্ষা দশ বৎসর পড়ার পর পরীক্ষা দাও। উচ্চমাধ্যমিক দু' বৎসর পড়েই পরীক্ষা দিতে হয়। তাছাড়া উচ্চমাধ্যমিকের পাঠ্যসূচি সময়ের তুলনায় অনেক দীর্ঘ ও অপেক্ষাকৃত অনেকটাই কঠিন। সেই কারণে, উচ্চমাধ্যমিকে একটি দিনও অবহেলা করার নয়। তাছাড়া উচ্চমাধ্যমিকে পাঠ্যসূচির তুলনায় স্কুল বা কলেজে, পড়াবার সময় অপেক্ষাকৃত কম—ছুটি ইত্যাদিতে ঠিক ঠিক ক্লাসের সংখ্যা তুলনায় অপ্রতুল। সেইজন্য উচ্চমাধ্যমিকে নিজেকে অনেক অভিনিবেশ নিয়ে পড়তে হয় এবং সেটা একেবারে প্রথম থেকে। আমার ধারণা তুমি একাদশ শ্রেণীতে কিছুটা পরিতৃপ্তির মনোভাব নিয়ে দিন কাটিয়েছ। কিন্তু যেটুকু ক্ষতি হয়েছে তাকে পূরণ করার সময় এখনও আছে। তোমাকে এখন সব কিছু ছেড়ে অনেকটা সময় দিয়ে নিয়মিত পড়াশুনা করে যেতে হবে। তুমি তো মেধাবী ছাত্র—যেটা এখন চাই পরিকল্পিত ও সনিষ্ঠ পরিশ্রম। এর কোনো বিকল্প নেই। হতাশাকে প্রশ্রয় দেবে না। জীবনে জয়-পরাজয়, উত্থান-পতন আছে, থাকবেই। একটা পরীক্ষায়, সেটাও Final নয়, ফল খারাপ হয়েছে, মানে এটা তোমার পক্ষে একটা Warning যাতে Final পরীক্ষায় তুমি মাধ্যমিকের মতোই ভাল ফল করতে পার। ঘটনাটা যে Final পরীক্ষায় ঘটেনি এটাই মন্দের ভাল। মোটের উপর, এখন যে সময়টা আছে তাকে আত্মবিশ্বাস নিয়ে যথাযথ কাজে লাগাও। তুমি তোমার হৃতগৌরব জীবনে ফিরে পাবেই—পাবে।

বিভারানী সেন স্মৃতি-সাহিত্য প্রতিযোগিতার
প্রথম পুরস্কৃত গল্প

সততা

মানিকলাল মজুমদার

সেদিন বইয়ের র‍্যাক থেকে বিলু হঠাৎ একটা ক্যালেন্ডার আবিষ্কার করল। খুব সুন্দর ক্যালেন্ডার। নজরুল, রবীন্দ্রনাথ আর সুকান্ত—এই তিন কবির এক অপূর্ব মিলন। নিচে গোলাপকুঁড়ি সহ একটি ফুটন্ত গোলাপ। এত সুন্দর একটা ক্যালেন্ডার সেই দোকানদারের দেওয়া গোটানো অবস্থাতেই বইয়ের র‍্যাকে স্থান পেয়েছে। কারণ বিলুদের সাজানো-গোছানো ফ্ল্যাটে ক্যালেন্ডারের কোনো স্থান নেই। পরিষ্কার দেওয়ালে লন্ডনের একটা ব্রীজের বড় ছবি আর সাজানো বাগান-সহ একটি সুন্দর বাংলোর ছবি ছাড়া আর কিছু নেই। এমনকি কোনো বাঁধানো ফটো পর্যন্ত নয়। ওসব টাঙানো মায়ের বারণ। কারণ ওতে দেওয়াল নোংরা হয়ে যায়।

বিলুর কিন্তু ক্যালেন্ডারটা খুব ভাল লাগল। সে ঠিক করল টিফিন আর হাতখরচা বাবদ সে যে টাকা পায়, তা দিয়ে ক্যালেন্ডারটা বাঁধিয়ে নিজের পড়ার ঘরে রাখবে।

বাঁধাবার জন্য নিচের অংশটুকু কেটে বাদ দিতে যেতেই একটা জায়গায় তার চোখ আটকে গেল, যেখানে লেখা—'সততাই আমাদের একমাত্র মূলধন'। তার বাবা একজন ব্যবসায়ী। সুতরাং ক্যাপিট্যাল বা মূলধন শব্দটার সঙ্গে একটু-আধটু পরিচয় আছে। কিন্তু সততাটা কি জিনিস?

কাটা-ছেঁড়া আপাতত স্থগিত রইল, সততার মানে জানতে সে মায়ের কাছে হাজির হলো। বিলুর এই এক দোষ। সে যা দেখবে বা যা শুনবে, সেটা জানা না থাকলে, না জানা পর্যন্ত তার স্বস্তি নেই। এর জন্য বাবা-মা প্রায়ই তার উপর বিরক্ত হন। কিন্তু সেই বা কি করবে। না জানা পর্যন্ত যে তার ভাল লাগে না।

এদিকে মা সিনেমায় যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। সে মাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, মা সততা মানে কি গো? মা এখন ভীষণ ব্যস্ত। শোয়ের টাইম হয়ে যাচ্ছে। অতিকষ্টে দুটো টিকিট যোগাড় করা গেছে। যা ভিড়, বাব্বা! তবু তারই মধ্যে কাপড়ের আঁচল ঠিক করতে করতেই জবাব দিলেন, সততা মানে সত্যি কথা বলা, সৎ পথে চলা। বলেই টেবিল থেকে পার্সটা নিয়ে বেরোতে যাবেন, বিলু আবার প্রশ্ন করল, সত্যি কথা বুঝলাম, কিন্তু সৎ পথে চলাটা কিরকম মা?

মা এবার বিরক্ত হলেন। বললেন, বিলু তোর এই বাতিকটা এবারে ছাড় তো। সবসময়ই এটা কি, ওটা কি? বলেই তিনি বেরিয়ে গেলেন। বিলুর মনটা দমে গেল।

দাদু ব্যালকনিতে আরামকেদারায় শুয়ে একটা বই পড়ছিলেন। তিনি সমস্তই লক্ষ্য করছিলেন। মা চলে যেতেই দাদু ডাক দিলেন, দাদুভাই! এদিকে এস। বিলু কাছে যেতেই দাদু তাকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন, সততা মানে সত্যি কথা বলা, কাউকে না ঠকানো, কিছু চুরি বা চালাকি না করা, সকলের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা। মোট কথা সকল সত্যের মিলন হলো সততা, বুঝলে তো? বিলু হাসিমুখে মাথা নেড়ে জানাল সে বুঝেছে। দাদু বিলুর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, বড় হলে আরও ভাল করে বুঝতে পারবে।

বিলু এবার দাদুকে বলল, জান দাদু, কোনো কথা, যেটা আমি জানি না, সেটা না জানা পর্যন্ত আমার ভাল লাগে না। তাই তো বারবার জিজ্ঞেস করি। বাবা-মা রাগ করে। কিন্তু কি করব বল? এই বদ অভ্যাসটা যে ছাড়তে পারি না। দাদু এবারে বিলুর মুখটা তাঁর দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে তার চোখে চোখ রেখে বললেন, এটা তোমার মোটেও বদ অভ্যাস নয়, বরং এই অভ্যেসটা যেন চিরকাল থাকে এটাই চেষ্টা কোরো। তারপর রৌদ্রোজ্জ্বল দুপুরের নীল আকাশের

দিকে তাকিয়ে কতকটা স্বগতোক্তির মতো বললেন, বুঝলে দাদুভাই, অজানাকে জানাই জ্ঞান। আর জ্ঞান মানুষকে সত্যিকারের মানুষ করে তোলে। আকাশের দিক থেকে আবার বিলুর দিকে তাকিয়ে বললেন, এসব অবশ্য তুমি এখন অত বুঝবে না। বড় হলে এ কথাটা মনে রেখো।

আজ কয়েকদিন হলো বিলুদের কাজের মাসি টাকা চুরি করে পালিয়েছে। বছর সাত-আট ধরে সে তাদের বাড়িতে কাজ করছিল। খুব বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু সেই লোক যে কেন এরকম একটা কাজ করল কেউই ভেবে পেল না। বাবা বললেন, আজকাল আর কাউকে বিশ্বাস করা যাবে না। সততা বলে কোনো জিনিসই এখন আর নেই।

বিলু জ্ঞান হতেই তাকে দেখেছে তাদের বাড়িতে কাজ করতে। বিলুকে মাসি ভীষণ ভালবাসত। বিলুরও মাসিকে ভীষণ ভাল লাগত। বলতে গেলে সে মাসির-ই কোলে পিঠে মানুষ।

বাবার কাছ থেকে বিলু জানতে পেরেছে টাকাটা চুরি করার আগের দিন নাকি বাবার কাছে পাঁচশো টাকা চেয়েছিল। তার ছেলের ভীষণ অসুখ। বাবা প্রথমে একশো পরে দুশো টাকা দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মাসি তা নেয়নি। তার পাঁচশো টাকাই দরকার। পরের দিন বাবার মানিব্যাগটা টেবিলে ছিল। তাতে হাজার টাকার উপর ছিল। আর মাসি কখন কোন ফাঁকে সেই টাকাসুদ্ধ ব্যাগটা নিয়ে পালিয়ে গেছে। বাবা মাসির আগের বাড়িটা চিনতেন, কিন্তু এখন যে বস্তিতে থাকে তা চেনেন না। তাই কোনো কিছুই আর করা যায়নি। বাবা রেগে গিয়ে বলেছেন, ছেলের অসুখ, তাই বলে টাকা চুরি করবি! ছেলের অসুখটাও আবার মিথ্যে কিনা কে জানে! এদেরকে বিশ্বাস করাটাই কঠিন। আরও অনেক কিছু বলেছেন। বিলুর খুব খারাপ লাগছিল। তবু মনে মনে মাসির পক্ষও নিতে পারেনি। কেননা মাসিকে সমর্থন করা মানে অসতের পক্ষ নেওয়া। সে তা পারবে না।

এরপর প্রায় বছর খানেক পরের কথা। বিলুদের বাড়িতে এখন নতুন একজন মাসি কাজ করে। তবে এ ঠিকে ঝি। কাজ করে চলে যায়। যতক্ষণ থাকে সে, ততক্ষণ মা তাকে চোখে চোখে রাখেন। বাড়ির জিনিসপত্র, টাকা-পয়সা এখন সাবধানে রাখেন। বলা যায় না এ আবার কি চুরি করে নিয়ে যায়। সততার তো এখন যুগ নেই।

সেদিন রবিবার ছিল। সকাল তখন নয়টা কি সাড়ে নয়টা। কলিং বেলটা বেজে উঠল। মা দরজা খুলেই দু'পা পিছিয়ে এলেন। অন্তরের সমস্ত ঘৃণাভরে বললেন, তুই।

বাবার দাড়ি কামানো শেষ হয়ে গেছে। তিনি দরজার দিকে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলেন, কে? তারপর দেখে নিয়ে মার চেয়েও বেশি ঘৃণা আর বিস্ময় মিশিয়ে বললেন, তুই? আবার? কি চাস? এবারে দাদুও এগিয়ে গেলেন, সঙ্গে বিলুও।

বিলু অবাক হয়ে দেখল, দরজার বাইরে সেই পুরনো মাসি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল ঝরছে। বাবা আবার বললেন, আবার কি চুরি করতে চাস? মা বললেন, পুলিশে খবর দাও না। টাকা না পাওয়া যাক, শাস্তি তো দেওয়া যাবে।

পুলিশের কথায় মাসি চমকে উঠল। সে কান্নাভেজা কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, তার দরকার নেই বাবু। আমি আপনার সমস্ত টাকা নিয়ে এসেছি। ছেলেটার ভীষণ অসুখ ছিল। টাকার খুব দরকার ছিল। আপনার কাছে চাইলাম, দিলেন না। আর কোথা থেকেও যোগাড় করতে পারিনি। তাই পরের দিন যখন টাকা দেখলাম, ছেলেটার অসুস্থ মুখটা মনে পড়ল, আর মাথাটা কেমন হয়ে গেল। টাকাটা নিয়ে নিলাম। তখন আমার মাথার ঠিক ছিল না বাবু। আমি চুরি করেছি বটে, তবে সেটা লোভে নয়, প্রয়োজনে। বিশ্বাস করুন! তাই এক বছর অন্য লোকের বাড়িতে কাজ করে খেয়ে না খেয়ে আপনাদের এই টাকাটা জমিয়ে আজ নিয়ে এসেছি। টাকাটা ফেরত দিতে পেরে নিজেকে হাল্কা মনে হচ্ছে গো বাবু। বলে টাকা কটা বাবার পায়ের কাছে রেখে মাসি ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। মাসির ব্যবহারে সবাই এত অবাক হয়ে গেছে যে মাসি চলে যাবার কিছুক্ষণ পরেও কেউ কিছু বলতে পারল না আর নড়তেও পারল না।

বাবাই প্রথমে বললেন, টাকাটা আমার আগেই দেওয়া উচিত ছিল। মা বললেন, এখনও এমন লোক আছে, ভাবাই যায় না। বলে টাকা কটা তুলে নিয়ে রান্নাঘরের দিকে গেলেন। বাবা দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে নিজের কাজে মন দিলেন। দাদু চশমাটা খুলে কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখ দুটো মুছে নিয়ে বিলুর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, দাদুভাই, এই হলো সততা।

ঘোষণা

গৌরী বসু, ৪ রামলাল বসু লেন, বর্ধমান-৭১৩ ১০১, তাঁর প্রয়াতা মা কমলা বসুর নামে একটি স্মৃতি-সাহিত্য প্রতিযোগিতার প্রস্তাব দিয়েছেন। তাঁর প্রস্তাব মতো আমরা শুকতারার পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে 'কমলা বসু স্মৃতি-সাহিত্য প্রতিযোগিতার জন্য মৌলিক লেখা চাইছি।

'কমলা বসু
জন্ম : ৮ বৈশাখ ১৩৩৯
মৃত্যু : ৯ চৈত্র ১৪০৭

বিষয়বস্তু

মা ও তাঁর শিশু

লেখা পাঠাবার শেষ দিন ৭ চৈত্র। পুরস্কৃত লেখা দুটি শুকতারার আষাঢ় সংখ্যায় ছাপা হবে।

প্রথম পুরস্কার : ১০০ টাকা ● দ্বিতীয় পুরস্কার : ৫০ টাকা

বিভারানী সেন স্মৃতি-সাহিত্য প্রতিযোগিতার
দ্বিতীয় পুরস্কৃত গল্প

পরশমণি

শ্যামাশ্রী চৌধুরী

আদালত আজ লোকে লোকারণ্য। কয়েকমাস আগে ঘটে যাওয়া একটা ব্যাঙ্ক ডাকাতির বিচারের দিন। সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সাতষট্টি বছরের বৃদ্ধ এক ব্যক্তি। মুখে দারিদ্র্যের ছাপ স্পষ্ট, তবে তার মধ্যেও আছে একটা দৃঢ়তা ও সংযমের চিহ্ন। পাতলা চেহারা। পরনে ধুতি ও পাঞ্জাবি, চোখে ভারী পাওয়ারের চশমা। মাথা সামনের দিকে ঝুঁকে আছে। আসামীর কাঠগড়ায় বছর তিরিশের এক যুবক। সুপুরুষই বলা যায়। তবে চোখে-মুখে ক্লান্তি ও হতাশার ছায়া। তারও মাথা নিচু করা।

সাক্ষীকে শপথবাক্য পাঠ করানোর পর সরকারী উকিল প্রশ্ন করেন, 'আপনার নাম?'

সাক্ষী, 'শ্রী অলকেন্দু বসু।'

উকিল, 'পেশা?'

সাক্ষী, 'অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক।'

উকিল, 'আসামীকে আপনি চেনেন?'

সাক্ষী, 'হ্যাঁ, (একটু থেমে) আমার একমাত্র সন্তান সুখেন্দু।'

উকিল, '১০ই আগস্টের ঘটনাটি মহামান্য বিচারকের সামনে বলুন।'

সাক্ষী, '১০ই আগস্ট সকালে সুখেন্দু বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় এই বলে যে ও রানাঘাটে এক বন্ধুর বাড়ি যাবে। আমার স্ত্রী সুখলতা একটু আপত্তি করেছিল, কিন্তু ও তখন বলল যে রানাঘাটে ওরা একটা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছে। তাই ওকে যেতেই হবে।'

উকিল, 'হ্যাঁ, তারপর কি হলো?'

সাক্ষী, 'ও সকালে বেরিয়ে যাওয়ার পর আমি গিয়েছিলাম আমার প্রেসারের ওষুধটা কিনতে। ওষুধের দোকানে হঠাৎ বহুদিনের পুরনো বন্ধু নির্মলের সঙ্গে দেখা। একই শহরে থাকি অথচ প্রায় ৪০ বছর যোগাযোগ নেই।

ইউনিভার্সিটির সেই হারিয়ে যাওয়া দিনগুলোর গল্পে এতই মেতে উঠলাম যে কেউ আর কাউকে ছেড়ে আসতে পারছিলাম না। নির্মল বলল ও ব্যাঙ্কে টাকা তুলতে যাবে। ভাবলাম ওখানে গিয়েও কিছুক্ষণ কথা বলা যাবে। কেননা মাসের প্রথমদিক তাই ব্যাঙ্কে ভিড় থাকে। সবেমাত্র ব্যাঙ্কে পা দিয়েছি হঠাৎ দেখি চার-পাঁচজনের একটা দল ব্যাঙ্কের সিঁড়ি দিয়ে দ্রুতপায়ে নেমে আসছে। মুখ কাপড়ে ঢাকা। প্রত্যেকের হাতেই অস্ত্র আর ব্যাগ। তাদের মধ্যে একজনের দিকে তাকিয়েই আমি চমকে উঠলাম। সেও আমাকে দেখে মুহূর্তকাল থমকে দাঁড়িয়ে আবার দৌড়ে চলে গেল। ওরা সবাই উঠল একটা সাদা অ্যাম্বাসাডারে। আমি তখনও তাকিয়ে ছিলাম। মুখে একটা কাপড় ঢাকা দিলেই সন্তান নিজেকে আড়াল করতে পারে না বাবা-মায়ের

তিন সত্যসন্ধানী শান্তনু, জীমূতবাহন আর শেলী পুলিশ বটেশ্বরের হাত থেকে পালাতে গিয়ে ঢুকে পড়ল আধ-ভাঙা মিত্রবাড়িতে। একটা গাছের ডালে উঠল ওরা। তখনই দেখল দোতলার একটা ঘর বেশ পরিচ্ছন্ন ও সাজানো গুছোনো। ত্রয়ী সত্যসন্ধানীর মনে প্রশ্ন— ভাঙাচোরা বাড়ির এই ঘরে কে বা কারা থাকে? কেন থাকে? শুরু হল ত্রয়ীর অভিযান।

একটি ঘরের রহস্য ২৫

অনিল ভৌমিক

এই তিন সত্যসন্ধানীর আর একটি অভিযান

পোড়াবাড়ির রহস্য ২০

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রা) লিমিটেড

৬৮, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩ দূরভাষ : ২৪১ ২২৪৫

কাছে।'

কথা বলতে বলতে হাঁপিয়ে পড়েন অলকেন্দুবাবু। গলা আটকে যায় কান্নায়। নিজেকে সামলে নিয়ে বলে ওঠেন, 'আমি একজন শিক্ষক—মানুষ গড়ার কারিগর হয়েও নিজের একমাত্র সন্তানকে মানুষ করতে পারিনি। জজসাহেব, এ অপরাধ আমার।'

খানিকটা দম নিয়ে আবার বলতে থাকেন, 'চিরকাল সৎপথে থাকায় বাড়ি, গাড়ি, ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স আমার হয়নি। সুখেন্দু বেকার। দারিদ্র্য আমার সংসারে চিরকাল। তবে আমি হাজার প্রলোভনেও অন্যায়ের সঙ্গে আপোস করব না। আপনি সুখেন্দুকে যথাযোগ্য শাস্তি দিন, হে মহামান্য বিচারক।' কথাটা শেষ করে অলকেন্দুবাবু লুটিয়ে পড়েন নিচে।

বিচারে সুখেন্দু আর তার চার সঙ্গীর কয়েক বছরের জেল হয়। জেলে বসে সে মায়ের চিঠি পায়—

খোকা,

তোর বাবা সেই যে আদালতে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন, আর জ্ঞান ফেরেনি। যে মানুষটা সততাকে আদর্শ করে চিরকাল মাথা উঁচু করে বেঁচেছে, সেই মানুষটা এত বড় অপমান কি করে সহ্য করবে? ওরে, তোকে নিয়ে যে তার অনেক স্বপ্ন ছিল। এমনভাবে সব শেষ হয়ে গেল! ১০ই আগস্টে দুপুরে বাড়ি ফিরে শরীর খারাপ লাগছে বলে কিছু খেল না। তারপর দেখি তোর ছোটবেলার সব ছবিগুলো বারবার করে দেখছে, আর দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। আমি অবাক হয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করায় আমাকে বলে, 'লতা কখনও কি স্বপ্নের চিতা দেখেছ? আমি আজ তাই দেখে এলাম। আমার বুকের ভেতরটা দুমড়ে, মুচড়ে যাচ্ছে। তবে না, এত সহজে আমি হারব না; তুমি দেখে নিও।' খোকা, বিশ্বাস কর আমি তখনও বুঝতে পারিনি যে কতখানি সর্বনাশ আমার হয়েছে। বুঝতে পেরেছি কয়েকদিন পরে, যখন দু'দিন তুই বাড়ি ফিরলি না, পুলিশ এল বাড়িতে আর তোর বাবা থানায় গিয়ে জবানবন্দী দিয়ে এল। যে মানুষটার কাছে সততাই ছিল পরমধর্ম, জীবনের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন, তার ছেলে হয়ে তুই শেষে.....। ভাল থাকিস। ঈশ্বরের কাছে কামনা করি তোর মনের পরিবর্তন আসুক। ওরে, জীবনে সততার থেকে বড় যে আর কিছুই নেই, তা তোর বাবা জীবন দিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে গেল। তুই যখন ফিরবি জানি না তখন আমি বেঁচে থাকব কি না, কেননা মৃত্যু এখন আমার কাছে আশীর্বাদ।

ইতি—

হতভাগিনী মা

অন্ধকার কারাগারের কোনো এক রন্ধ্রপথ বেয়ে পড়ন্ত বিকেলের একটুকরো আলো এসে পড়েছে সুখেন্দুর মুখে। মায়ের চিঠিটা পড়া শেষ হলে সে উঠে দাঁড়ায়। বাবার যে সততার আদর্শকে এতদিন সে ঘৃণা করে এসেছে, সেই আদর্শই আজ তার চোখ খুলে দিয়েছে। মনের সেই চোখ দিয়ে যেন সে দেখতে পায় জ্বলন্ত চিতার লেলিহান শিখার মাঝে সাদা চাদরে গলা পর্যন্ত ঢাকা সত্যপথিক ঘুমন্ত অলকেন্দুবাবুকে। জীবনের চরম ও চূড়ান্ত সততার পরীক্ষায় সফলতার সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েও মুখে কাতর যন্ত্রণার ছাপ। অনুশোচনায় সুখেন্দুর চোখে বাঁধভাঙা বন্যার মতো অঝোরে জল আসে। তখন কি তার কানে বাজছিল বাবার অতিপ্রিয় সেই লাইনগুলো—

'সত্য যে কঠিন,
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম—
সেকখনো করে না বঞ্চনা।'

ছবি ঃ সুফি

এ ছাড়াও যাঁদের লেখা ভালো হয়েছে ঃ

তরুণ চন্দ্র দেবনাথ (বিজয়গড়, কল-৩২)।। শর্মিলা মিত্র (ইছাপুর, হাওড়া)।। রীতা রায় (উকিলপাড়া, জলপাইগুড়ি)।। সুস্মিতা দাস (নেতাজী সুভাষ আবাসন, পুরুলিয়া)।। সৌরভ কুমার ভূঞ্যা (মহিষাদল, মেদিনীপুর)।। রামপ্রসাদ দে (কোতুলপুর, বাঁকুড়া)।। রীতা লাহা (আসানসোল, বর্ধমান)।। সুব্রত সরকার (বামনগাছি, হাওড়া)।। দেবজ্যোতি পাল (ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর)।। অভিজিৎ দাস (বিধান শিশু সরণী, কল-৫৪)।।

প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই
ছাত্রছাত্রীরা লুফে নিয়েছে

বাগ্‌ধারা চলমান ভাষার সজীব অংশ। মানুষের মুখে মুখে তৈরি হয় যে-বাগ্‌ধারা ভাষা-সাহিত্যে তা-ই অমূল্য সম্পদ। শুধু সাহিত্যপ্রেমী ভাষারসিকরাই নন, বাগ্‌ধারার সৌন্দর্যে আপ্লুত এখন ছাত্রছাত্রীরাও। মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষাতেও বাগ্‌ধারা এখন অবশ্যপাঠ্য।

ভাষারসিক ও ছাত্রছাত্রীদের জন্যই প্রকাশিত হয়েছে।

বাগ্‌ধারা সংগ্রহ ২০

শৈলেন চক্রবর্তী

ভূমিকা জ্যোতিভূষণ চাকী

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রা) লিমিটেড

বিশেষ পুরস্কার

এখন তোমরা আরো পুরস্কার পাচ্ছো। আমাদের লেখক ও বৈজ্ঞানিক ডঃ ডি. চন্দ্র তাঁর প্রয়াত পুত্র দেবাশিসের নামে স্মৃতি-সাহিত্য প্রতিযোগিতার সেরা পাঁচজন লেখককে তাঁর লেখা বই পুরস্কার হিসেবে দেবেন।

এ মাসের পুরস্কার প্রাপকরা ঃ মানিকলাল মজুমদার, শ্যামাশ্রী চৌধুরী, তরুণ চন্দ্র দেবনাথ, শর্মিলা মিত্র ও রীতা রায়।

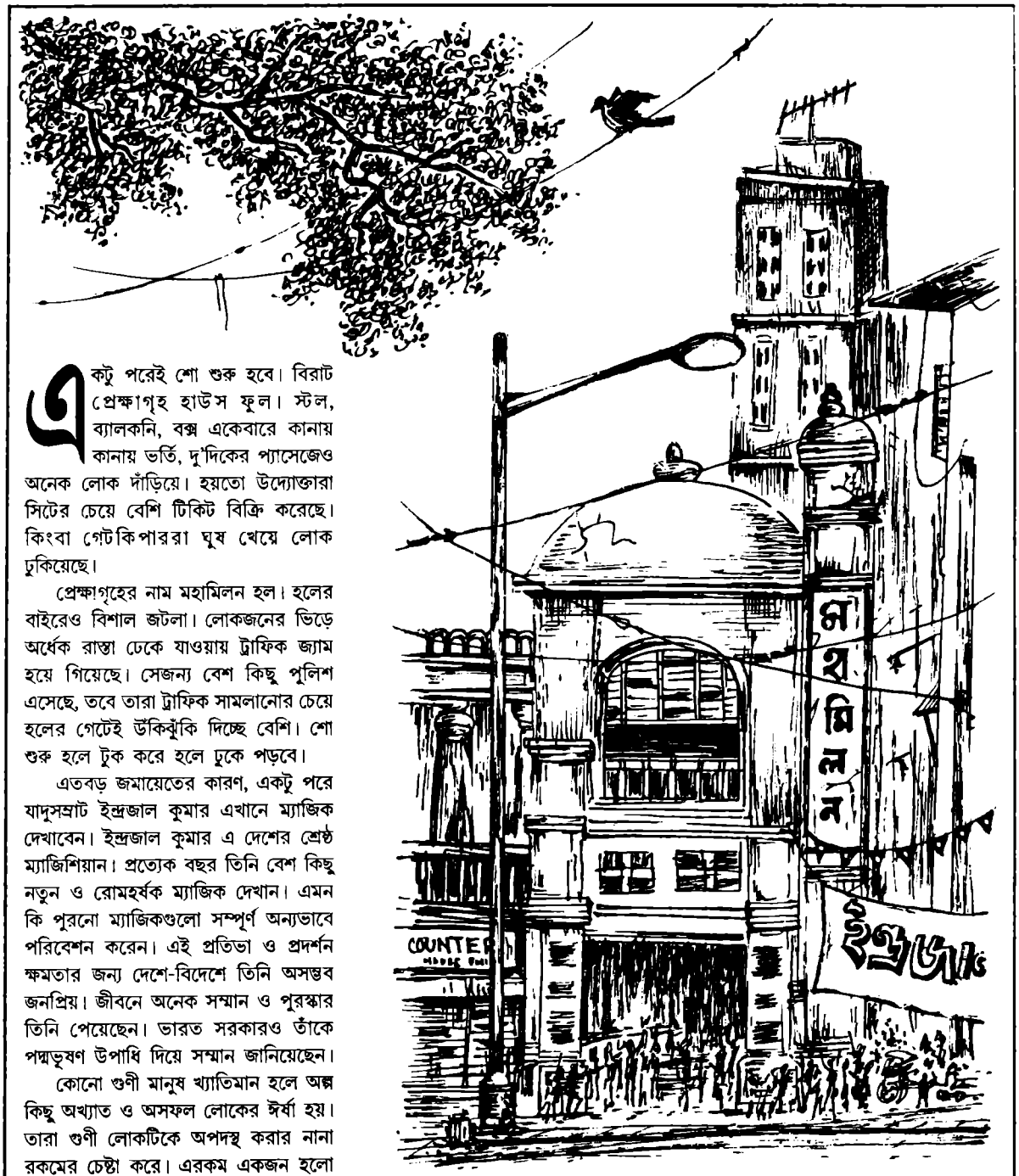

শেষ ম্যাজিক

বিদ্যুৎ চৌধুরী

একটু পরেই শো শুরু হবে। বিরাট প্রেক্ষাগৃহ হাউস ফুল। স্টল, ব্যালকনি, বক্স একেবারে কানায় কানায় ভর্তি, দু'দিকের প্যাসেজেও অনেক লোক দাঁড়িয়ে। হয়তো উদ্যোক্তারা সিটের চেয়ে বেশি টিকিট বিক্রি করেছে। কিংবা গেটকিপাররা ঘুষ খেয়ে লোক ঢুকিয়েছে।

প্রেক্ষাগৃহের নাম মহামিলন হল। হলের বাইরেও বিশাল জটলা। লোকজনের ভিড়ে অর্ধেক রাস্তা ঢেকে যাওয়ায় ট্রাফিক জ্যাম হয়ে গিয়েছে। সেজন্য বেশ কিছু পুলিশ এসেছে, তবে তারা ট্রাফিক সামলানোর চেয়ে হলের গেটেই উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে বেশি। শো শুরু হলে টুক করে হলে ঢুকে পড়বে।

এতবড় জমায়েতের কারণ, একটু পরে যাদুসম্রাট ইন্দ্রজাল কুমার এখানে ম্যাজিক দেখাবেন। ইন্দ্রজাল কুমার এ দেশের শ্রেষ্ঠ ম্যাজিশিয়ান। প্রত্যেক বছর তিনি বেশ কিছু নতুন ও রোমহর্ষক ম্যাজিক দেখান। এমন কি পুরনো ম্যাজিকগুলো সম্পূর্ণ অন্যভাবে পরিবেশন করেন। এই প্রতিভা ও প্রদর্শন ক্ষমতার জন্য দেশে-বিদেশে তিনি অসম্ভব জনপ্রিয়। জীবনে অনেক সম্মান ও পুরস্কার তিনি পেয়েছেন। ভারত সরকারও তাঁকে পদ্মভূষণ উপাধি দিয়ে সম্মান জানিয়েছেন।

কোনো গুণী মানুষ খ্যাতিমান হলে অল্প কিছু অখ্যাত ও অসফল লোকের ঈর্ষা হয়। তারা গুণী লোকটিকে অপদস্থ করার নানা রকমের চেষ্টা করে। এরকম একজন হলো নতুন যাদুকর চন্দ্রজাল কুমার। চন্দ্রজাল তার আসল নাম নয়। ইন্দ্রজাল কুমারের সঙ্গে রেষারেষি করে সে নাম নিয়েছে চন্দ্রজাল কুমার।

চন্দ্রজালের ইতিমধ্যে যাদুকর হিসেবে কিছুটা পরিচিতি হয়েছে। এখন তার লক্ষ্য ইন্দ্রজাল কুমারকে টেক্কা দেওয়া। সে হঠাৎ

খবরের কাগজে 'লক্ষ টাকার চ্যালেঞ্জ' শিরোনামায় বিজ্ঞাপন দিয়ে বসল ঃ ইন্দ্রজাল কুমারের যাদুকে আমি চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি। ওঁর যন্ত্রপাতি আমি পরীক্ষা করার পরও যদি উনি ম্যাজিক দেখাতে সক্ষম হন তবে ওঁকে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার দেবো।

ইন্দ্রজাল কুমারের অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা ওঁকে এই বিজ্ঞাপনটা দেখাল। উনি বললেন, চন্দ্রজাল ছেলেমানুষ। ওকে আমি স্নেহ করি। তবে ওর উদ্ধত ব্যবহার ভবিষ্যতে ওর ক্ষতি করবে। তাই ওর চ্যালেঞ্জ আমি গ্রহণ করছি। ইন্দ্রজালের উত্তর ফলাও করে প্রকাশ করার জন্য উদ্যোক্তারা 'শিশুর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ' নামে আরো বেশি জায়গা জুড়ে একটা বিজ্ঞাপন দিল। এতে তারা দেখাতে চাইল যে চন্দ্রকে ইন্দ্র শিশু বলে মনে করেন। তবে শিশুকে মাঝে মাঝে আদব কায়দা শেখানো দরকার। তাই ইন্দ্রজাল কুমার ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি চন্দ্রজালের চ্যালেঞ্জের উপযুক্ত জবাব দেবেন।

আজ সেই ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি। সুতরাং হল লোকে লোকারণ্য হবে তাতে আর বিচিত্র কি? আর পনের মিনিট পরে ম্যাজিক শুরু, সেই চ্যালেঞ্জ যুদ্ধও শুরু। তবে উদ্যোক্তারা একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছেন, কারণ ইন্দ্রজাল কুমার এখনো প্রেক্ষাগৃহে আসেননি। ঘণ্টা দুই আগে খবর পাওয়া গিয়েছিল ওঁর একটু প্রেশার বেড়েছে, তাই প্রথমে সহকারী ও যন্ত্রপাতিগুলো পাঠিয়ে দিচ্ছেন। উনি খানিকটা বিশ্রাম নিয়ে ঠিক সময়ে এসে পড়বেন।

সহকারীরা যন্ত্রপাতি গুছিয়ে নিজেরা সেজেগুজে অপেক্ষা করছে। কিন্তু যাদুসম্রাটের দেখা নেই। মাইকে এতক্ষণ ঘোষণা করছিল, একটু পরেই আপনারা দেখতে পাবেন শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজাল, আর তার সঙ্গে চ্যালেঞ্জের জবাব। এখন চ্যালেঞ্জের জবাব কথাটা বলা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। উদ্যোক্তাদের কপালে ভাঁজ, ঠিক সময়ে অনুষ্ঠান শুরু না হলে জনতা সব লণ্ডভণ্ড করে দেবে। মাইকে এখন বারে বারে শুধু বলছে, আপনারা গোলমাল না করে ধৈর্য ধরে একটু বসুন।

ছটা বাজল। শো শুরু হওয়ার সময়, অথচ গ্রীনরুমে ইন্দ্রজাল কুমারের দেখা নেই। মাইকে তবু বলছে, আমাদের অনুষ্ঠান আর কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হবে। পাঁচ মিনিট গেল, দশ মিনিট গেল, লোকজনের গুঞ্জন শুরু হলো। এখানে ওখানে মন্তব্য শোনা যাচ্ছে, চিটিংবাজি হচ্ছে! আমাদের টাকা ফেরত চাই! ব্লাফ মাস্টার। ফোর টুয়েন্টি।

চন্দ্রকুমার ও তার সাঙ্গোপাঙ্গ সামনের দুটো সারির পরের সারিতে বসে ছিল। সাঙ্গোপাঙ্গরা উঠে চেঁচাতে শুরু করল, ইন্দ্রজাল কুমার শেম, শেম। যাদুসম্রাট, শেম শেম। যাদুকর চন্দ্রজাল, জিন্দাবাদ।

স্টেজের দিকে একটা জুতোর পাটি ছুটে এল। লোকজন কেউ কেউ উঠে দাঁড়াচ্ছে। দেখতে দেখতে হৈচৈ, চ্যাঁচামেচি, জটলা থেকে চেয়ার ঠেলাঠেলি, লাথালাথি শুরু হলো। যে পুলিশেরা গেট দিয়ে ঢুকেছিল তারা কোথায় গিয়ে লুকিয়ে পড়ল। উদ্যোক্তারাও বুঝতে পেরেছে সত্যিকারের একটা ম্যাজিক শুরু না হলে এই লঙ্কাকাণ্ড থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে না।

মাইকের ছেলেটা তখনো ভয় না পেয়ে ক্রমাগত বলে যাচ্ছিল, আপনারা একটু ধৈর্য ধরুন। ইন্দ্রজাল কুমার অদ্ভুত উপায়ে এখানে আবির্ভূত হবেন। দেরি করে আসাটাও ওঁর একট নতুন ধরনের ম্যাজিক। আপনারা ভাঙচুর কর—

ছেলেটার কথা শেষ হওয়ার আগেই আচমকা হলের সমস্ত বাতি নিভে গেল, মাইক স্তব্ধ হয়ে গেল। পাঁচ সেকেন্ড হতভম্ব হয়ে থেকে যখন লোকজন আবার হুড়োহুড়ি করতে শুরু করছে তখন হলের ঈশান কোণে একটা বেগুনী আলো দেখা গেল। আলোটা প্রথমে বিদ্যুতের মতো কয়েকটি আঁকাবাঁকা ঝলক দেবার পর স্থির রশ্মির মতো জেগে রইল। সবাই হাঁ করে যখন সেটার দিকে চেয়ে আছে, তখন তার ভেতরে একটা হাত নড়তে লাগল অভিবাদনের ভঙ্গিতে। মিনিট দুয়েকের মধ্যে সেই আলোটা আবার মিলিয়ে গেল। এদিকে শোনা যাচ্ছিল সেতারের টুং টাং। সঙ্গে বাঁশির একটা মিষ্টি আওয়াজ।

স্তম্ভিত লোকজন অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে নিজের নিজের জায়গা খুঁজে বসতে শুরু করেছে। লোকেরা বসতে না বসতে এবার আলো দেখা গেল অগ্নিকোণে। এবারের আলোর রং লাল টকটকে। তার ভেতর জেগে উঠেছে একটা মানুষের মুখ। মুখটাও আলো আর ছায়ায় তৈরি। যাঁরা ইন্দ্রজাল কুমারকে আগে দেখেছেন তাঁদের সন্দেহ নেই, মুখটা অবিকল তাঁরই মতো।

একইভাবে কিছুক্ষণ দেখা দেওয়ার পর সেই আলো ক্ষীণ হতে হতে মিলিয়ে গেল। আবার যখন হলে অন্ধকার, তখন দর্শক আসন থেকে চন্দ্রজাল কুমার চেঁচিয়ে উঠল, বুজরুকি, বুজরুকি। লেজার লাইটের বুজরুকি।

তার কথায় কেউ পাত্তা দিল না। বরং অন্য আসন থেকে একজন দর্শক চেঁচিয়ে উঠল, শাট আপ। আবার চেঁচালে ঘাড় ধরে বের করে দেবো।

আধ মিনিট নীরবতার পর স্টেজের সামনে সিলিংয়ের কাছে দেখা গেল একটা সবুজ আলোর রশ্মি বন বন করে ঘুরছে। তার ভেতর আস্তে আস্তে ফুটে উঠল একটা শরীর। গায়ের ঢোলাঢালা কালো আলখাল্লা পৎপৎ করে উড়ছে। মাথায় উষ্ণীষ, পায়ে নাগড়াই জুতো, হাতের সবকটি আঙুলে ঝকমকে পাথরের আংটি। দু' হাত জড়ো করে সেই আলোর সঙ্গে ভাসতে ভাসতে স্টেজের দিকে মূর্তিটা নামছিল আর স্টেজের পর্দাটা আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছিল।

মূর্তির পা স্টেজের প্ল্যাটফর্ম ছোঁয়াতেই স্পটলাইটের আলো বাড়তে শুরু করল। দেখা গেল, স্টেজের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছেন স্বয়ং ইন্দ্রজাল কুমার। উনি হাতজোড় করে মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকে বললেন, নমস্কার! নমস্কার! এটা আমার আজকের প্রথম ম্যাজিক।

তুমুল হাততালি শুরু হলো। পাঁচ মিনিট ধরে হাততালির মধ্যে ইন্দ্রজাল কুমার বারে বারে মাথা ঝুঁকিয়ে জনতার অভিনন্দন নিচ্ছিলেন। চন্দ্রজাল বুঝতে পারছে না, কি করে এই অবিশ্বাস্য ম্যাজিকটা করা হলো। উদ্যোক্তাদের চোখ ছানাবড়া, অবাক ইন্দ্রজাল কুমারের সহকারীরাও। শুধু মাইকের ঘোষক বুক ফুলিয়ে হতভম্ব লাইটম্যানকে বলল, দ্যাখ, আমি কেমন অ্যানাউন্স করেছিলাম। যাদুসম্রাট কি উনি এমনি এমনি হয়েছেন?

ইন্দ্রজাল কুমার বললেন, এবার আমি এমন একটা সাধারণ খেলা দেখাবো, যা বাচ্চা যাদুকরেরা দেখায়। একটা বাক্সের মধ্যে সুন্দরী মেয়েকে ঢুকিয়ে দিয়ে আমি তলোয়ার দিয়ে তাকে এফোঁড়-ওফোঁড় করবো। আমি নয়, আপনারা যে কেউ করতে পারেন। যেদিক থেকে খুশি, যেভাবে খুশি তলোয়ার চালাবেন। তারপর আমি ডালা খুলে দিলে সেই সুন্দরী অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে আসবে।

একটু দম নিয়ে যাদুসম্রাট বললেন, আপনারা কেউ এই বাক্স পরীক্ষা করে দেখতে চান? কিংবা তলোয়ারটা?

চন্দ্রজাল এই সুযোগই খুঁজছিল। সে সদর্পে দাঁড়িয়ে বলল, আমি পরীক্ষা করবো। তারপর দর্শকদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, আমার নাম চন্দ্রজাল কুমার, আমিই

আপনাদের যাদুসম্রাটকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছি। আমি এক্ষুণি ওঁর মুখোশ ছিঁড়ে ফেলব। আপনারা দেখতে পাবেন, উনি ম্যাজিকের কিছুই জানেন না।

ইন্দ্রজাল কুমার মিষ্টি করে হাসলেন। চন্দ্রজাল গট গট করে স্টেজে এসে বাক্সটা পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করল। নাঃ, কোনো গোপন খুপরি নেই। তাছাড়া বাক্সটা হাল্কা বোর্ডের তৈরি। ফলে যে কোনো জায়গা থেকে যে কোনো দিকে তলোয়ার ফুঁড়ে দেওয়া যায়। তাহলে কি তলোয়ারের ভেতর কোনো চালাকি রয়েছে? সে ধারালো তলোয়ারটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে বুড়ো আঙুল সামান্য কেটে ফেলল, তবু কোনো খুঁত পেল না। তখন যাদুসম্রাট ঠাট্টা করে তাকে বললেন, এই সুন্দরী মেয়েটিকেও পরীক্ষা করে দেখবে নাকি!

মেয়েটি চন্দ্রজালকে দাঁত দেখিয়ে, জিভ বের করে, চোখ মটকে এমন ভ্যাঙাল যে হলসুদ্ধ হাসিতে ফেটে পড়ল। তখন ইন্দ্রজাল কুমার মেয়েটিকে বাক্সে ঢুকিয়ে ডালা বন্ধ করলেন। তারপর চন্দ্রজালের হাতে তলোয়ার দিয়ে বললেন, এবার তোমার পালা। দেখি কেমন তলোয়ার চালাতে পারো।

চন্দ্রজাল ভাবল, এই সুযোগ। সে এলোপাথাড়ি ক্রমাগত তলোয়ার চালাতে চালাতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। ইন্দ্রজাল কুমার তাঁর রুমালটা ওর হাতে দিয়ে বললেন, বড্ডো ঘেমে গিয়েছ। মুছে নাও। এদিকে তাঁর ইঙ্গিতে সহকারীরা বাক্সের ডালা খুললে সেই মেয়েটি অক্ষত শরীরে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল।

দর্শকদের অজস্র হাততালি আর চন্দ্রের প্রতি দুয়ো দেবার আওয়াজ চলল বেশ কিছুক্ষণ। ইন্দ্রজাল কুমার বললেন, জানি, তুমি এখনো সন্দেহ করছ মেয়েটি আসল না নকল। আচ্ছা, তুমি যদি বাক্সে ঢোক, আর তোমার হেল্পার যদি তলোয়ার চালায়, কেমন হয়? ভয় নেই, আমি কিছু করবো না। আমি এইখানে চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকবো।

দর্শকদের ভেতর থেকেও কেউ কেউ বলে উঠল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভেতরে ঢুকে পড়। তোমার এলেমটা একবার দেখি। চন্দ্রজাল কুমার দেখল, তার সম্মান আর থাকে না। অগত্যা সে রাজী হয়ে তার শাগরেদকে স্টেজে আসতে বলল। স্টেজে এলে তার কানে কানে সাবধান করে বলল, শোন, বাক্সে কোনো ফাঁকা জায়গা নেই। খুব আস্তে আস্তে, ধার দিয়ে ধার দিয়ে চালাবি। সুযোগ বুঝে আমি অন্যদিকে সরে যাবো।

চন্দ্রজাল কুমার বাক্সে ঢুকলে তার অ্যাসিস্ট্যান্ট তার কথামতো বেশ রয়েসয়ে তলোয়ার চালাচ্ছিল। কিন্তু যখনই তলোয়ারের ফলা বাক্সে ঢুকছে তখনই চন্দ্রজালের মনে হচ্ছে, সেটি তার শরীরের ভেতর বিঁধে যাচ্ছে। ফলে প্রত্যেক বার যন্ত্রণা ও ভয়ে সে চেঁচিয়ে উঠছিল। বাক্সের ভেতর থেকে হলেও সেই আওয়াজ দর্শকরা শুনতে পাচ্ছিল মাইকের কল্যাণে।

কয়েকবার খোঁচানোর পর ভয় পেয়ে শাগরেদ চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ল। ইন্দ্রজাল বললেন, থামলে কেন হে? তোমার ওস্তাদ তো আমার মেয়েটাকে ষাট বার খোঁচা দিয়েছে। তুমি অন্তত ষোল বার দাও।

শাগরেদ আবার শুরু করতেই চন্দ্রজাল হাউহাউ করে কেঁদে উঠল। যেখানেই খোঁচা দিচ্ছে সেখানেই এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে চন্দ্রজালের। সে বলল, থামাও, থামাও। আমি মরে যাচ্ছি। আমায় বাঁচাও!

ইন্দ্রজাল বললেন, ভয় নেই, চন্দ্রজাল তুমি মরবে না। তিনি তিনবার প্রদক্ষিণ করে যাদুদণ্ড দিয়ে বাক্সের উপর কয়েকবার টোকা দিলেন। এতক্ষণ চন্দ্রজালের যে জ্বালা-যন্ত্রণা চলছিল, তা দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল।

বাক্সের ডালা খুলতে দিব্যি নিখুঁত শরীরে বেরিয়ে এলো সে।

ইন্দ্রজাল বললেন, ভীতুর মতো অত

মুখটা অবিকল তাঁরই মতো।

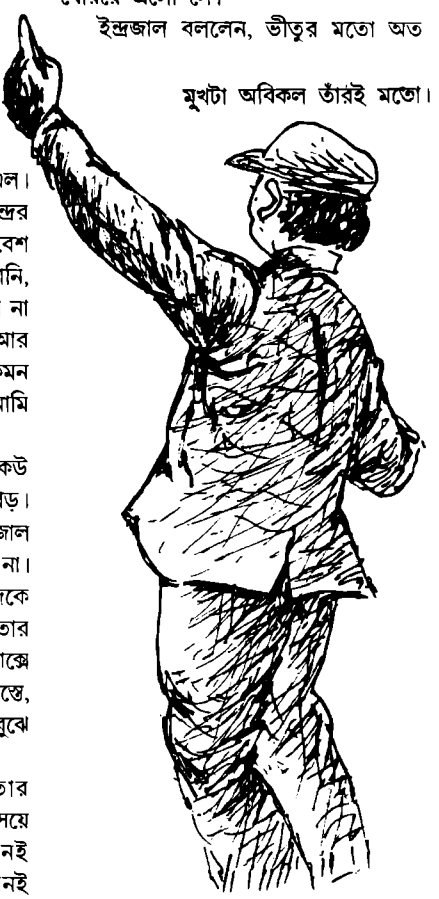

চেঁচাচ্ছিলে কেন? তোমার গায়ে তো আঁচড়টিও লাগেনি। এই সাহস নিয়ে তুমি ম্যাজিক দেখাবে?

চন্দ্রজাল আর কি বলবে? একটু আগেই তার মনে হচ্ছিল শরীরের ভেতরটা যন্ত্রণায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। এখন দিব্যি ফুরফুরে লাগছে। তাহলে কি আমি স্বপ্ন দেখছিলাম! নাকি সম্মোহন! কিন্তু বাক্সের ভেতরে বসে থাকা মানুষকে কি হিপনোটাইজ করা যায়? লোকটা অসাধারণ যাদুকর, না অপদেবতা!

মাথা নিচু করে সে স্টেজ থেকে নেমে যাচ্ছিল আর ভেতরে ভেতরে প্রতিশোধ নেবার কথা ভাবছিল। ইন্দ্রজাল কুমার কি করে সেটা বুঝে গেলেন। চন্দ্রজালের মাথায় ছিল একটা গলফ টুপি। সে যখন তার সিটের কাছে ফিরে গিয়েছে তখন জাদুসম্রাট তাকে বললেন, তোমার টুপিটা আমার অ্যাসিস্ট্যান্টের খুব পছন্দ হয়েছে। ওটা ওকে দিয়ে দাও।

হলভর্তি লোকজন আবার হো হো করে হেসে উঠল। ইন্দ্রজাল কুমার বললেন, থাক, তোমায় আর স্টেজে এসে দিতে হবে না। আমিই তুলে নিচ্ছি।

তাঁর যাদু লাঠিটা চন্দ্রজালের টুপির দিকে তাক করে আস্তে আস্তে ওপরে তুলতেই টুপিটা শূন্যে উঠে ভাসতে ভাসতে স্টেজের দিকে এগোল। এবার তিনি যাদুদণ্ডটি একজন সহকারীর মাথার ওপর দু'বার ঠেকালেন। টুপিটা এসে ওই সহকারীর মাথার ওপর বসে পড়ল। লাঠিটা চন্দ্রজালের দিকে লক্ষ্য করে ইন্দ্রজাল গম্ভীর গলায় বললেন, এবার মন দিয়ে খেলা দেখ এবং শেখ।

একের পর এক দুর্ধর্ষ খেলা দেখাতে লাগলেন যাদুসম্রাট ইন্দ্রজাল কুমার। স্টেজে সিংহ চলে এল, ভ্যানিশ হলো। দুটো খাড়া লাঠির ওপর ভর দিয়ে একটা লোক ঘুমিয়ে পড়ল। একটা লাঠি পায়ের নিচে, অন্যটা মাথার নিচে, আর কোথাও কিছু নেই। এমন কি একটা বাচ্চা ছেলে লোকটার পেটের ওপর পা ঝুলিয়ে বসল, যেন শক্ত কাঠের বেঞ্চিতে বসেছে। ঝাঁপি থেকে বের করা বিষাক্ত সাপ ফণা তুলে ছোবল দিচ্ছে, সাপটাকে দু'হাত দিয়ে টেনে একটা সাপমুখো ছড়ি করে ফেললেন ইন্দ্রজাল কুমার। সেই ছড়ি হাতে জমিদারের মতো কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করলেন।

খেলা দেখতে দেখতে দর্শকদের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে। বুক ধকধক করছে, নিঃশ্বাস বন্ধ। এক একটা খেলা শেষ হলে হাততালিতে ফেটে যাচ্ছে হলঘর। তাঁর সহকারীরাও হতবাক। এতকাল ধরে তারা ওঁর অনেক অসাধারণ খেলা দেখেছে। কিন্তু আজ যা করছেন তার তুলনা নেই। স্বয়ং যাদুদেব বুঝি ওঁর ওপর ভর করেছে।

এইভাবে দু'ঘণ্টা নিমেষে শেষ হয়ে গেল। ইন্দ্রজাল কুমার ভারী গলায় ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন, চল্লিশ বছর ধরে আপনাদের ম্যাজিক দেখিয়ে আনন্দ দেবার চেষ্টা করেছি। তার বিনিময়ে পেয়েছি আপনাদের অফুরন্ত প্রীতি ও ভালবাসা। আজই আমার শেষ ম্যাজিক আপনাদের দেখালাম। এবার অবসর নেব। বিদায় নেবার আগে একটা কথা সবাইকে বলে যাই। জানবেন ম্যাজিক সত্যি নয়। ম্যাজিক মানে, ভেল্কি—মানুষের চিত্ত বিনোদনের একটা উপায় মাত্র।

হলের আলো আস্তে আস্তে কমে এল। ইন্দ্রজাল কুমার তাঁর যাদু লাঠি সহকারীর মাথায় দু'বার ঠেকাতেই চন্দ্রজালের টুপিটা আবার শূন্যে ভেসে উঠল। লাঠি দিয়ে চন্দ্রজালের দিকে তাক করায় টুপিটা ভাসতে ভাসতে গিয়ে তার মাথার ওপর নেমে পড়ল।

হল পুরোপুরি অন্ধকার হলে একটা সবুজ আলোর বৃত্ত আবার তাঁর চারদিকে পাক দিতে শুরু করল। তিনি শূন্যে উঠতে লাগলেন। উঠতে উঠতে বললেন, চন্দ্রজাল, অন্য যাদুকরের সাফল্যে আক্রোশ করে বড় যাদুকর হওয়া যায় না। বড় যাদুকর হতে গেলে প্রচুর পড়াশোনা, চিন্তাভাবনা, অভ্যাস, মনোযোগ ও ইচ্ছাশক্তি দরকার। এবার থেকে সেই সাধনা করবে, কেমন? আশীর্বাদ করি, তুমি আমার চেয়েও বড়ো যাদুকর হও। বিদায়।

সেই আলো এবং ইন্দ্রজালের অবয়ব হলের সিলিং-এর কাছে যেতে যেতে মিলিয়ে গেল। তার সঙ্গে অন্ধকারের মধ্যে করুণ সুরে একটা বাঁশির আওয়াজ। ধীরে ধীরে হলের ভেতরের আলোগুলো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। দর্শকেরা উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ছে। দশ মিনিট ধরে ক্রমাগত হাততালি পড়ছিল।

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসে চন্দ্রজাল খবরের কাগজে একটা অদ্ভুত সংবাদ দেখতে পায় ঃ যাদুসম্রাট ইন্দ্রজাল কুমারের রহস্যময় প্রয়াণ। সংবাদে প্রকাশ, যাদুসম্রাট কাল বিকেলে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে লেকভিউ নার্সিংহোমে ভর্তি হন। তাঁকে অবিলম্বে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে নিয়ে যাওয়া হয়। ওইদিন সন্ধ্যায় মহামিলন হলে তাঁর একটি ম্যাজিক শো ছিল। প্রত্যক্ষদর্শীর মতে তিনি সেখানে পুরো দু'ঘণ্টা ধরে অত্যাশ্চর্য ও রোমহর্ষক ম্যাজিক প্রদর্শন করেন। এমন কি তাঁকে চ্যালেঞ্জ করা একজন তরুণ যাদুকরকে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করেন। এদিকে নার্সিংহোম সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদ অনুযায়ী, ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। এই দুটি পরস্পরবিরোধী সংবাদ অত্যন্ত চাঞ্চল্যকর ও সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। কারো কারো মতে যাদুসম্রাট অলৌকিক ভাবে তাঁর জীবনের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ যাদু দেখিয়ে চলে গেলেন। তাঁর মরদেহ লেক গার্ডেনসে তাঁর বাড়িতে নিয়ে আসা হয়েছে। আজ বিকেলে কেওড়াতলা শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।

চন্দ্রজাল কুমারের ব্রেকফাস্ট খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। সে অনেকক্ষণ ধরে চুপচাপ বসে থাকার পর দু'হাত জড়ো করে বলল, যাদুসম্রাট, তোমাকে প্রণাম।

ছবি ঃ সুদীপ্ত মণ্ডল

বিচিত্র খবর

প্রবীর কুমার মৈত্র

এক নাগাড়ে তবলা বাজিয়ে বিশ্বরেকর্ড

সম্প্রতি এক নাগাড়ে তবলা বাজিয়ে বিশ্বরেকর্ড করলেন তরুণ যুবক রিঙ্কু আদর্শ। দিল্লীর কনোট প্লেসের কেন্দ্রীয় উদ্যানে একটা তাঁবুর ভেতরে বসে এই তরুণ এক নাগাড়ে ২১ ঘণ্টা তবলা বাজালেন। এর আগে অবশ্য জাপানের লিও ফার্নান্ডেজ ২০ ঘণ্টা এক নাগাড়ে ড্রাম বাজিয়ে বিশ্বরেকর্ড করেছিলেন। প্রথম ভারতীয় যন্ত্রী হিসাবে গিনেস বুক অব্ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস-এ নাম তুলে রিঙ্কু এখন রীতিমতো খুশি।

ম্যালেরিয়া ঠেকাতে নাইট্রিক অক্সাইড

সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা ২০১০। অক্টোবর-এর শেষ। ভোরের দিকে হালকা ঠাণ্ডার আমেজ। এক সপ্তাহ পরেই কালীপুজো। এদিকে কলকাতা জুড়ে ম্যালেরিয়ার তাণ্ডব যথারীতি শুরু হয়ে গেছে। গত বছরের তুলনায় এ বছর ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অন্তত পাঁচগুণ বেশি। রাজারহাটের মেগাসিটিতে এক আকাশছোঁয়া বাড়ির দশতলায় থাকেন ঘনশ্যাম গড়গড়ি। তাঁর পাশের ফ্ল্যাটেই ক'দিন আগে হানা দিয়েছে ম্যালেরিয়া। বাধ্য হয়ে ঘনশ্যামবাবু ভাবছিলেন মশারি টাঙিয়ে শোবেন কিনা। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল দু'চার দিন আগে দুপুরবেলা এক ছোকরা এসে কি একটা ট্যাবলেটের প্যাক জোর করে গছিয়ে গেছে। বলে গিয়েছে রাতে শোবার আগে একটা করে ট্যাবলেট খেতে, তাহলে আর ম্যালেরিয়া হবে না। দেখাই যাক না কি হয়। এই ভেবে ড্রয়ার খুলে ট্যাবলেটের প্যাক বার করে এক ঢোঁক জল দিয়ে একটা ট্যাবলেট গিলে ফেললেন ঘনশ্যাম গড়গড়ি। তারপর শুয়ে পড়লেন।

এ পর্যন্ত মনে হতেই পারে এটা কোনো কল্পবিজ্ঞান গল্পের সূচনা। বাস্তবে কিন্তু তা নয়। বিষয়টা পুরোদস্তুর গবেষণার সহজবোধ্য প্রতিবেদন। ম্যালেরিয়া বিশেষজ্ঞ একদল চিকিৎসাবিজ্ঞানী বর্তমানে এ নিয়ে কাজ করছেন জোর কদমে। তাঁরা চাইছেন নিয়মিত বিশেষ কিছু ওষুধ খাইয়ে মানুষের রক্তে নাইট্রিক অক্সাইড গ্যাসের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে। তাতে শরীরে প্লাসমোডিয়াম ফ্যালসিপেরামের সংক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধক্ষমতা তৈরি হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জার্নাল অব এক্সপেরিমেন্টাল মেডিসিনের এক সংখ্যায় এই গবেষণার বিস্তারিত ফলাফল কিছুদিন আগেই প্রকাশিত হয়েছে। যে বিশেষজ্ঞরা ফ্যালসিপেরাম ম্যালেরিয়ার সঙ্গে শরীরে নাইট্রিক অক্সাইড গ্যাসের সম্পর্ক নিয়ে কাজ করছেন, তাঁদের প্রধান হলেন মহামারী বিশেষজ্ঞ ডঃ নিকোলাস এনস্টে। তাঁর তত্ত্বাবধানেই আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া আর আমেরিকার তিনটি বড় হাসপাতালে রোগীদের ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ চালিয়েছেন দশজন বিজ্ঞানীর একটি দল। সেই সমীক্ষার ফলাফল এবং গবেষণা প্রসঙ্গে ডঃ এনস্টে বলেছেন, এমনিতেই মানুষের শরীরে নাইট্রিক অক্সাইড তৈরি হয়। আমরা প্রতিদিন যা খাই তার মধ্যে থাকে অন্তত ২৫টি অ্যামাইনো অ্যাসিড। এরকম একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড হলো আর্জিনিন। এই আর্জিনিন থেকেই তৈরি হয় নাইট্রিক অক্সাইড।

ইসকিমিক হার্ট ডিজিজ, পেপটিক আলসার প্রভৃতি নানা অসুখের চিকিৎসায় নাইট্রিক অক্সাইডের ব্যবহার এখন বহুল প্রচলিত। এছাড়া মাথায় রক্ত সঞ্চালন, শরীরের বিভিন্ন অংশের কোষে কোষে যোগাযোগ রাখা প্রভৃতি কাজেও নাইট্রিক অক্সাইডের ভূমিকা এখন প্রমাণিত তথ্য। আবার শরীরের প্রয়োজনে নাইট্রিক অক্সাইডের পরিমাণও নির্দিষ্ট কিছু খাবার-দাবারের মাধ্যমে বাড়ানো যায়। যেমন ডিমের অ্যালবুমিন, দুধের কেজিন প্রভৃতিতে আর্জিনিন আছে। এসব খাবার একটু বেশি পরিমাণে খেলেই শরীরে নাইট্রিক অক্সাইডের পরিমাণ বাড়বে। গবেষণায় দেখা গেছে শরীরে এই গ্যাসটির পরিমাণ বাড়লে, ফ্যালসিপেরাম পরজীবী রক্তে ঢুকলেও ম্যালেরিয়া তৈরি করতে পারে না এই গ্যাসটির পরিমাণ একটি নির্দিষ্ট মাত্রার কম থাকলে ম্যালেরিয়া হলেও সেরিব্রাল বা ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ার কোনো সম্ভাবনাই থাকছে না। ডঃ এনস্টে ও তাঁর সহকারীরা এই ফলাফল দেখে নিশ্চিত হলেন, ম্যালেরিয়া পরজীবীকে আটকাতে রক্তে নাইট্রিক অক্সাইড বেশি রাখাটা খুবই জরুরি।

ডঃ এনস্টে ও তাঁর সহকারীরা এই তথ্যের ভিত্তিতেই বর্তমানে চেষ্টা করছেন উপযোগী ট্যাবলেট বা ক্যাপসুল তৈরি করতে। এ জন্য দরকার এই গ্যাস কীভাবে ম্যালেরিয়া পরজীবীকে রুখে দেয় তা জানা। তাহলেই বাকি কাজ শেষ করতে সময় লাগবে না। আপাতত সে কাজই চলছে। ওই গবেষকরা আশা করছেন আগামী দু'এক বছরের মধ্যেই সব তথ্য তাঁদের হাতে এসে যাবে। তখন সেই তথ্যের ভিত্তিতেই তৈরি হবে ম্যালেরিয়া আটকানোর ট্যাবলেট। তারপর সেলসম্যানের মাধ্যমে পৌঁছে যাবে ঘরে ঘরে এবং ঘনশ্যামবাবুর সঙ্গে আমরা সবাই একটা করে ট্যাবলেট জল দিয়ে খেয়ে নিয়ে, মশারি না টাঙিয়েই শুয়ে পড়তে পারব।

কিছুতেই বলবে না

নির্মলেন্দু গৌতম

পরিমল হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।

পরিমল যে নিরুদ্দেশ হতে পারে, সেটা আমরা কিছুতেই ভাবতে পারছি না।

হঠাৎ কী এমন হতে পারে যার জন্য নিরুদ্দেশে যেতে হলো পরিমলকে! দিন কয়েক আগেই পরিমলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমাদের। না, তখন আমাদের মনেই হয়নি নিরুদ্দেশ হতে পারে পরিমল।

পরিমলদের বাড়ি থেকে ফিরতে ফিরতে দেবেশ্বর আর আমি পরিমলের নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া নিয়েই কথা বলছিলাম।

কিছুক্ষণ আগে পরিমলদের বাড়ির পাশ দিয়েই গাড়ি করে ফিরছিলাম আমি আর দেবেশ্বর।

হঠাৎ গাড়ি থামিয়ে দিয়ে দেবেশ্বর বলেছিল, 'পরিমলকে একবার ডেকে যাবে নাকি?'

'চলো।' আমি বলেছিলাম।

সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থেকে নেমে পড়েছিল দেবেশ্বর।

আমিও সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়েছিলাম গাড়ি থেকে।

এগিয়ে গিয়ে দরজার কড়া নাড়তেই দরজা খুলে দাঁড়িয়েছিল যে, তাকে আমরা কখনও দেখিনি। আসলে, পরিমলদের বাড়িতে তো আর নিয়মিত আসি না আমরা। কাজেই পরিমলদের বাড়ির সবাইকে চেনার কথা নয় আমাদের। কিন্তু যে দরজা খুলে দাঁড়িয়েছিল, তাকে দেখে মনে হচ্ছিল, সে আমাদের চেনে।

দেবেশ্বরের গাড়ির দিকে একবার তাকিয়ে সে বলেছিল, 'কাকে চাই?'

'পরিমলকে।' দেবেশ্বর বলেছিল।

মুহূর্তে তার দু'চোখ বুঝি করুণ হয়ে গিয়েছিল। একটু সময় কী যেন ভেবেছিল সে। তারপর বড় করে একটা শ্বাস নিয়ে বলেছিল, 'খবরটা আপনারা পাননি নিশ্চয়ই!'

কথাটা শুনে চমকে উঠেছিলাম আমরা দু'জনই।

দেবেশ্বর বলেছিল, 'কি খবর?'

'তাঁর নিরুদ্দেশের খবর। ভোরবেলাতেই তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন।'

'নিরুদ্দেশ মানে?' প্রায় লাফিয়ে উঠে বলেছিল দেবেশ্বর।

সে বলেছিল, 'এখন মানে-টানে আর আমাদের মাথায় আসছে না।'

'ঠিক। এরকম একটা ঘটলে মাথায় কিচ্ছু আসে না।' আমি বলেছিলাম সঙ্গে সঙ্গে।

দেবেশ্বর বলেছিল, 'ঠিক আছে, মানে-টানে জিজ্ঞেস করছি না, কিন্তু পরিমলকে খোঁজা শুরু হয়েছে তো?'

'সাংঘাতিকভাবে খোঁজা শুরু হয়েছে। কিন্তু কোনোরকম কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছে না।' বলেছিল সে।

আমি বলেছিলাম, 'কি কারণে নিরুদ্দেশ হয়েছে, সেটা কি জানা গেছে?'

'না, সেটাও জানা যায়নি। সবাই মিলে চেষ্টা করা হচ্ছে জানতে।' সে বলেছিল।

দেবেশ্বর বলেছিল, 'সঙ্গে কি কিছু নিয়ে গেছে?'

'যদ্দুর মনে হচ্ছে সঙ্গে কিছু নিয়ে যায়নি। আসলে, এখনও সেটা কেউ দেখার কথা ভাবেনি। ভাববার মতো মনও নেই।' সে বলেছিল।

না, আর কিছু প্রশ্ন করবার নেই। মনে মনে কথাটা ভেবে দেবেশ্বরের দিকে তাকিয়েছিলাম আমি।

দেবেশ্বরও বোধহয় সেকথা ভেবে ফেলেছিল। সেজন্যেই বোধহয় আমি তাকাতেই আমায় বলেছিল, 'বুঝলে, ব্যাপারটা ভারি রহস্যময় মনে হচ্ছে।'

আমি বলেছিলাম, 'আমরা কি কিছু করতে পারি না?'

'নিশ্চয়ই পারি। একশোবার পারি।' দেবেশ্বর বলেছিল।

কথাটা শুনে কি যেন ভেবেছিল সে। বলেছিল, 'কি পারেন?'

'খুঁজতে পারি পরিমলকে।' দেবেশ্বর বলেছিল।

ভারি খুশি হয়েছিল সে। বলেছিল, 'তাহলে এখন থেকেই খুঁজতে শুরু করুন। মানে, দেরি হলে হয়তো আর খুঁজেই পাওয়া যাবে না।'

'ঠিক তাই।' আমি বলেছিলাম।

দেবেশ্বর বলেছিল, 'তাহলে চলো, খুঁজতে বেরিয়ে পড়ি।'

বলেই তার দিকে ফিরে বলেছিল, 'শোনো, পরিমলকে খুঁজে পাওয়া গেলেই তোমরা একটা টেলিফোন করবে আমাদের। পরিমলকে জিজ্ঞেস করলেই পেয়ে যাবে আমাদের টেলিফোন নম্বর। আমরা যদি খুঁজে পাই পরিমলকে তাহলে আমরাও

টেলিফোন করব তোমাদের।'

'আচ্ছা।' সঙ্গে সঙ্গে বলেছিল সে।

না, আর অপেক্ষা করিনি আমরা। ঘুরে পা বাড়িয়েছিলাম গাড়ির দিকে।

পরিমলের নিরুদ্দেশ নিয়ে কথা বলতে বলতেই অনেকটা চলে এলাম আমরা।

শেষ পর্যন্ত দেবেশ্বরের দিকে ফিরে আমি বললাম, 'আচ্ছা, পরিমল কোথায় নিরুদ্দেশ হতে পারে বলে তোমার মনে হয়?'

'সেটা বলা যাবে না।' দেবেশ্বর বলল।

আমি বললাম, 'কেন?'

'আসলে, আমার মনে হবার সঙ্গে পরিমলের মনে হওয়াটা এক নাও হতে পারে। নিরুদ্দেশ হবার জন্য যে যার নিজের মতো জায়গা বেছে নেয়। একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে।' দেবেশ্বর বলল।

ঠিকই বলেছে দেবেশ্বর। মনে মনে কথাটা ভেবেই আমি বললাম, 'তাহলে পরিমলকে আমরা কোথায় খুঁজব?'

'সেটা ভাবতে হবে।' গাড়ি চালাতে চালাতেই বলল দেবেশ্বর।

আমি বললাম, 'তার মানে এখুনি আমরা পরিমলকে খুঁজতে শুরু করছি না।'

'এখ্‌খুনি খুঁজতে শুরু করছি না বললে ঠিক হবে না। এই যে যাচ্ছি, চারদিক দেখতে দেখতেই তো যাচ্ছি। এটাকে নিশ্চয়ই খোঁজা বলতে হবে।' দেবেশ্বর বলল।

আমি তার কিছু বললাম না।

পরিমল নিরুদ্দেশ হতে পারে, সেটাই ভাবলাম।

বিকেলবেলা সুজয়ের বাড়িতে গিয়েছিলাম আমি আর দেবেশ্বর। আসলে, সুজয়ের সঙ্গে পরিমলের দেখা হয় নিয়মিত। ওর কাছে পরিমলের খবর-টবর কিছু পাওয়া যাবে ভেবেছিলাম আমরা। কিন্তু না, সুজয় কোনো খবর দিতে পারেনি। বরং পরিমলের নিরুদ্দেশের খবরটা আমাদের কাছ থেকে শুনে কিরকম যেন অসহায় হয়ে গিয়েছিল। কি করবে ঠিক ভেবে উঠতে পারছিল না।

বেশিক্ষণ আমরা সুজয়ের বাড়িতে থাকিনি। ব্যাপারটা নিয়ে সুজয়কে ভাবতে বলে বেরিয়ে পড়েছি।

গাড়ি চালাতে চালাতে দেবেশ্বর হঠাৎ বলল, 'আচ্ছা, পরিমল যদি আর না ফেরে?'

'খুবই দুঃখের ব্যাপার হবে সেটা।' আমি বললাম।

দেবেশ্বর বলল, 'সত্যিই খুব দুঃখের ব্যাপার হবে সেটা।'

বলে কী যেন ভাবতে থাকল।

আমি আর কিছু না বলে পরিমলকে নিয়েই ভাবতে থাকলাম।

আচ্ছা, নিরুদ্দেশ হয়ে কি কলকাতাতেই থাকবে পরিমল? যদি কলকাতায় না থাকে, তাহলে কখনোই আমরা খুঁজে বের করতে পারব না পরিমলকে। কোথায় যাব পরিমলকে খুঁজতে?

কথাটা দেবেশ্বরকে বলতে, দেবেশ্বরও মেনে নিল কথাটা। বলল, 'আমরা, মানে পরিমলের বন্ধুরা মিলে, খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিলে কিরকম হয়?'

'দারুণ হয়।' আমি লাফিয়ে উঠলাম।

দেবেশ্বর বলল, 'পরিমলের ছবি দিয়ে বিজ্ঞাপনটা দিতে হবে।'

'তাহলে চলো, এখুনি আমরা পরিমলদের বাড়িতে গিয়ে পরিমলের একটা ছবি চেয়ে আনি।' আমি বললাম।

এক মুহূর্ত ভেবে দেবেশ্বর বলল, 'ঠিক আছে। চলো।'

যদুবাবুর বাজারের কাছাকাছি আসতেই প্রায় লাফিয়ে উঠলাম আমি।

পরিমল!!

বাসস্টপে দাঁড়িয়ে বোধহয় বাসের জন্যই অপেক্ষা করছে।

'দেবেশ্বর, পাওয়া গেছে পরিমলকে। ঐ যে বাসস্টপে দাঁড়িয়ে আছে পরিমল!' এক নিঃশ্বাসে বলে ফেললাম আমি।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দেবেশ্বর দেখে ফেলল পরিমলকে।

পরিমলও বুঝি আমাদের দেখে ফেলেছে।

আসলে, পরিমল তো বাসের জন্য রাস্তার দিকে তাকিয়েই ছিল। কাজেই, আমাদের গাড়িটা পরিমলের চোখে পড়বেই।

না, পরিমল সরে পড়ার চেষ্টা করল না।

বোধহয় বুঝে ফেলেছে, সরে পড়াটা আর সম্ভব নয়। সেজন্যেই বুঝি আর সরে পড়ার চেষ্টা করল না পরিমল।

দেবেশ্বর গাড়িটাকে একেবারে পরিমলের সামনে দাঁড় করিয়ে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির কাছে এগিয়ে এল পরিমল। এমনভাবে এগিয়ে এল, যেন কোনও ঘটনাই ঘটেনি। বোধহয় পরিমল জানে না, তার নিরুদ্দেশ হবার খবরটা আমরা জানি।

সেটাই ঠিক!

কথাটা ভেবেই আমি রীতিমতো উত্তেজিতভাবে তাকালাম পরিমলের মুখের দিকে। ঠিক কী বুঝতে চেষ্টা করলাম নিজেই তা ঠিকঠাক বুঝতে পারলাম না।

দেবেশ্বর ভাল করে একবার পরিমলকে দেখে নিয়ে সতর্ক গলায় বলল, 'হঠাৎ তুমি এখানে, মানে, এই বাসস্টপে দাঁড়িয়ে?'

'কাছেই এক বন্ধুর অফিস। দেখা করতে গিয়েছিলাম। বাস ধরবার জন্য এখানে দাঁড়িয়ে আছি।' ভারি সহজ গলায় পরিমল বলল।

ঠিক তেমনি সতর্ক গলায় ফের দেবেশ্বর বলল, 'কোথায় যাবে এখন?'

'নকুলেশ্বরবাবুর বাড়িতে।' তেমনি-ভাবেই বলল পরিমল।

দেবেশ্বর বলল, 'নকুলেশ্বরবাবুর বাড়ি কোথায়?'

'প্রিয়নাথ মল্লিক রোডে। হাজরায় নেমে একটুখানি হাঁটতে হবে।' পরিমল বলল।

দেবেশ্বরকে কিছু জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল পরিমল। তার আগেই আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ভোরবেলা থেকে এতক্ষণ তুমি কোথায় ছিলে?'

আমার প্রশ্নটা শুনেই আমার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকাল পরিমল। বলল, 'হঠাৎ এরকম একটা প্রশ্ন করলে কেন?'

ঠিক কি উত্তর দেবো ভেবে পেলাম না আমি। ঠিক এই মুহূর্তে নিশ্চয়ই বলা যাবে না, তুমি নিরুদ্দেশ হয়েছ বলেই এরকম একটা প্রশ্ন করেছি।

দেবেশ্বর বোধহয় বুঝে ফেলল সেটা। বুঝে ফেলেই বলল, 'আসলে, ওর প্রশ্নটা শুনে আমিও অবাক হচ্ছি।'

'যে কেউ অবাক হবে এরকম একটা প্রশ্ন শুনলে।' পরিমল বলল।

নিজেকে সামলে নেবার জন্য আমি এবার বললাম, 'সত্যি, আমিও কিন্তু অবাক হচ্ছি। আচ্ছা, এরকম একটা প্রশ্ন কেন করলাম বলো তো!'

দেবেশ্বর বলল, 'মাথাটা তোমার ঠিক নেই বলে।'

'ঠিক। তোমার মাথাটা ঠিক নেই।' পরিমল বলল সঙ্গে সঙ্গে।

দেবেশ্বর আমার দিকে মুহূর্তের জন্য একবার তাকিয়ে পরিমলের দিকে ফিরে বলল, 'যাকগে, আমার প্রশ্নের উত্তরটা দাও তুমি।'

'প্রশ্নটা বলো।' পরিমল বলল।

দেবেশ্বর বলল, 'নকুলেশ্বরবাবুর সঙ্গে দেখা করে তুমি কি বাড়িতেই ফিরবে?'

'আর একটা জায়গায় যাবার কথা আছে। কিন্তু যাব না। বাড়িতেই ফিরব।' পরিমল বলল।

বাড়িতে যদি ফেরে তাহলে তো পরিমল নিরুদ্দেশে যায়নি। আচ্ছা, ইচ্ছে করেই পরিমল বাড়িতে ফেরার কথা বলল না তো? নিশ্চয়ই ইচ্ছে করে বলল। মনে মনে কথাটা ভেবে ফেলেই বললাম, 'আরেকটা জায়গায় না গিয়ে সত্যিই কি তুমি বাড়িতে ফিরবে?'

কথাটা শুনেই কিরকম যেন হয়ে গেল পরিমলের মুখ। বলল, 'সত্যিই বাড়িতে ফিরব কিনা জিজ্ঞেস করলে কেন? ঠিকই, আজ তোমার মাথাটা ঠিক নেই।'

'না, মানে ব্যাপারটা হলো কি—' আমি ঠিক কথা খুঁজে না পেয়ে থেমে গেলাম।

পরিমল বলল, 'কথাটা ঘোরাতে চেষ্টা কোর না তুমি।'

দেবেশ্বর বলল, 'ঠিক। কথাটা ঘোরাতে চেষ্টা কোর না।' বলে একটুখানি থেমে দেবেশ্বর ফের বলল, 'যাকগে, আমার মাথায় একটা প্রশ্ন ঘুরছে। প্রশ্নের উত্তরটা একটু ভেবে বলবে। ধরো, কেউ যখন নিরুদ্দেশ হয়, তখন কোথায় যাব বলে সে নিরুদ্দেশ হয়?'

তীক্ষ্ণচোখে এবার দেবেশ্বরের দিকে তাকাল পরিমল। কিছু ভেবে নিল। তারপর বলল, 'হঠাৎ এরকম একটা প্রশ্ন তোমার মাথায় ঘুরছে কেন?'

'না পরিমল, সেটা ঠিক বলতে পারব না। আসলে, হঠাৎ মাথায় ঘুরছে প্রশ্নটা। তোমাকে পেয়ে গেলাম সামনে, জিজ্ঞেস করে ফেললাম।' দেবেশ্বর সহজ গলায় বলল।

মনে হলো পরিমল বিশ্বাস করল না কথাটা। বলল, 'যাই বল, তোমরা যে সব প্রশ্ন-ট্রশ্ন করছ সেগুলো কীরকম যেন সন্দেহজনক মনে হচ্ছে আমার। সত্যি করে বলো তো, হঠাৎ এরকম প্রশ্ন করছ কেন তোমরা?'

'না, মানে—' আমি বলতে চেষ্টা করলাম কিছু।

পরিমল বলল, 'না মানে বললে শুনব না। সত্যি কথাটা বলতেই হবে।'

দেবেশ্বর একবার তাকাল আমার দিকে।

তারপর পরিমলের দিকে ফিরে বলল, 'বললে আবার সরে পড়বার চেষ্টা করবে না তো?'

'সে কি, সরে পড়ব কেন!' অবাক হয়ে বলল পরিমল।

দু'মুহূর্ত ভাবল দেবেশ্বর। তারপর বলল, 'আসলে, সকালবেলা তোমাদের বাড়িতে গিয়েছিলাম। কড়া নাড়াতেই যে দরজা খুলেছিল, সে বলেছে, তুমি নাকি ভোরবেলা নিরুদ্দেশ হয়ে গেছো। সেজন্যেই তোমায় আমরা এরকম সব প্রশ্ন করছিলাম।'

লাফিয়ে উঠল পরিমল। বলল, 'বুঝেছি, ভাগ্নে সন্তু কাণ্ডটা করেছে। গতকাল এসেছে দুর্গাপুর থেকে। তোমরা ওকে আগে দেখনি কখনও। বিশ্বাস করো,—সকালবেলা আমি বাড়িতেই ছিলাম। বাড়ি থেকে বেলা বারোটার সময় বেরিয়েছি।'

লাফিয়ে উঠলাম আমি! বললাম, 'তাই তো বলি, তুমি হঠাৎ নিরুদ্দেশে যাবে কেন!'

'ঠিক তাই। যাবার মতো জায়গার কি কোনো অভাব আছে তোমার!' দেবেশ্বর বলল।

আমি বললাম, 'উফ্, সেই সকাল থেকে আমরা তোমার নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া নিয়ে শুধু ভেবেই যাচ্ছি।'

'কাগজে বিজ্ঞাপন দেবার প্ল্যান পর্যন্ত করে ফেলেছি আমরা।' দেবেশ্বর বলল।

পরিমলের মুখটা যেন কিরকম হয়ে গেল। বলল, 'বিশ্বাস কর, ব্যাপারটা আমি ভাবতেই পারছি না।'

'ভাবা যায়ও না।' দেবেশ্বর বলল।

দু'মুহূর্ত ভাবল পরিমল। তারপর বলল, 'আমায় নিরুদ্দেশে পাঠাবার মজাটা ওকে আজই বুঝিয়ে দেব।'

'এখুনি তো বুঝিয়ে দিতে পার। মানে, আমরা তোমায় দশ মিনিটের মধ্যে তোমার বাড়িতে পৌঁছে দিতে পারি।' দেবেশ্বর বলল।

পরিমল বলল, 'কিন্তু এখন তো ওকে পাওয়া যাবে না।'

'কেন?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'দাদার সঙ্গে কোথায় যেন যাবার কথা আছে সন্তুর। রাত হবে ফিরতে। কিন্তু যত রাতই হোক, ফিরলেই এক্কেবারে চেপে ধরব।' পরিমল বলল।

'ঠিক। ওকে পেলেই তোমার চেপে ধরা উচিত।' আমি বললাম।

দেবেশ্বর বলল, 'যাক্‌গে, কাল সকালে আমরা দু'জন যাচ্ছি তোমাদের বাড়িতে। দেখব, তোমার ভাগ্নে সন্তু আমাদের দেখলে কি করে।'

'ঠিক আছে। তোমাদের জন্য আমি অপেক্ষা করব।' পরিমল বলল।

দেবেশ্বর এবার গাড়ির দরজাটা খুলে দিয়ে বলল, 'নাও, উঠে পড়। তোমায় আমরা নকুলেশ্বরবাবুর বাড়িতে পৌঁছে দিচ্ছি।'

কোনো কথা না বলে গাড়িতে উঠে পড়ল পরিমল।

দেবেশ্বর সঙ্গে সঙ্গে স্টার্ট দিল গাড়িতে। তারপর চালিয়ে দিল গাড়ি।

গাড়ি চলতেই পরিমলের সঙ্গে ফের সন্তুকে নিয়ে কথা শুরু হলো আমাদের।

না, নকুলেশ্বরবাবুর বাড়ি পৌঁছুনো পর্যন্ত সে কথা থামল না।

পরদিন সাতটা বাজবার আগেই দেবেশ্বরের কাছে চলে এলাম আমি।

তৈরি হয়েই ছিল দেবেশ্বর। আমায় দেখেই বলল, 'ঠিক সময়মতোই এসে গেছ। আমি একেবারে রেডি। চলো!'

কথা না বাড়িয়ে দেবেশ্বরের সঙ্গে বাইরে এসে গাড়িতে উঠে পড়লাম।

সঙ্গে সঙ্গে স্টার্ট দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দিল দেবেশ্বর।

আমি বললাম, 'সন্তু আমাদের দেখলে কি করবে, সেটাই ভাবছি।'

আমার দিকে তাকাল দেবেশ্বর। হেসে বলল, 'ঠিক। আমিও সেটাই ভাবছি।'

'সন্তুকে কি বলবে ভেবে ফেলেছ?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

দেবেশ্বর বলল, 'না, ভাবিনি। মুখোমুখি হলে কথাগুলো ঠিক এসে যাবে মাথায়।'

আমি আর কিছু বললাম না।

দেবেশ্বর নিঃশব্দে গাড়ি চালাতে থাকল।

পরিমলদের বাড়ির কাছে পৌঁছুতে বেশি সময় লাগল না।

গাড়ি থেকে নেমে দ্রুতপায়ে আমি আর দেবেশ্বর দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম। দাঁড়িয়েই হাত বাড়িয়ে দরজার কড়া নাড়তে যাচ্ছিলাম আমি।

তার আগেই দেবেশ্বর হাত বাড়িয়ে কড়া নাড়াল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে দিল পরিমল।

দেবেশ্বর বুঝি সন্তুর কথাটা বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু বলতে পারল না। কারণ তার আগেই পরিমল আমাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, 'সন্তু নিরুদ্দেশ।'

'সন্তু নিরুদ্দেশ মানে!' চমকে উঠে প্রশ্ন করল দেবেশ্বর।

পরিমল বলল, 'নিরুদ্দেশ মানে নিরুদ্দেশ।'

দেবেশ্বর বলল, 'সত্যিই?'

পরিমল বলল, 'সত্যি কিনা যখন বলছ, তখন সন্তুর লেখা চিঠিটাই দেখাতে হচ্ছে তোমাদের।'

বলে একটা চিঠি আমাদের হাতে ধরিয়ে দিল পরিমল।

তাতে লেখা ছোটোমামা, তোমার বন্ধুরা সকালে আসবে বলেছ। ওরা এলে বলবে, ছোটোমামাকে নিরুদ্দেশে পাঠাতে গিয়ে সন্তুকেই নিরুদ্দেশে যেতে হয়েছে। সন্তুর নিরুদ্দেশের জায়গাটা যে দুর্গাপুর সেটা কিন্তু কিছুতেই বলবে না। ইতি সন্তু।

চিঠিখানা থেকে মুখ তুলতেই পরিমল বলল, 'যাই হোক, সন্তু যে নিরুদ্দেশ এটাই কিন্তু তোমরা ভাববে। মানে, ও যদি জানতে পারে চিঠিখানা আমি তোমাদের দেখিয়েছি—'

না, আমরা কেউ কিছু বললাম না। আসলে, এরপর কি আর কোনও কথা বলা যায়।

ছবি : সঞ্জয় সরকার

জানো কী!

☐ অক্টোপাস স্যামের চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল। চিকো হতাশ গলায় চেঁচিয়ে ওঠে, বুদ্ধু কোথাকার, সব ফাঁস করে দিলে.....

☐ ঘুমিয়ে ছিল গ্রামের মানুষ। শেষ রাতে আচমকা চিৎকার, জাগো, সবাই জাগো। ঘুম ভেঙে যায় সকলের। ভয়ে ভয়ে বাইরে এসে দেখে.....

☐ বিচারকের রায়ে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে গরিব মানুষটির। সে দোষী, তাকে জরিমানা দিতে হবে! কিন্তু কোথা থেকে দেবে সে? তার কোনো কথা শুনতে চায় না তার বড়লোক বন্ধু আর বিচারক.....

☐ ময়না রাজার জন্যে এনেছে অমৃত ফল। সেই ফল মুখে দিতেই দাসী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। ক্রোধে জ্বলে উঠলেন রাজা.....

☐ কাঞ্চনপুরের কাঞ্চন রাজার চার মেয়ে। সকালের আলোর মতো রূপ তাদের। তবু বর জোটে না। রাজার গালে হাত, রানীর গালে হাত। ভেবে ভেবে দিন কাটে না রাজা-রানীর। তারপর একদিন.....

এইসব প্রশ্নের উত্তর পাবে **চৈত্র** মাসের শুকতারায়। সেই সঙ্গে আরও এমন কিছু যা **শুকতারার** এই সংখ্যাটির কথা কাউকে ভুলতে দেবে না। হাঁদাভোঁদা, বাঁটুলরা তো আছেই।

মজার পাতা

নতুন শব্দমালা

সূত্র

পাশাপাশি : ১। দাবি আদায়ের চূড়ান্ত পথ ৬। মড়ক ৭। চট্টগ্রামের পাহাড়ি উপজাতি ১০। কানেই দোলে ১১। যাতে জল নেই ১২। বন্দুকের ছোট গুলি ১৩। এ দিয়ে কি আর মাছ ঢাকা যায়। ১৪। যা দিয়ে ঢাকা দেওয়া হয় ১৭। একরকমের রেশমি কাপড় ১৯। ঘটনাস্থলে গিয়ে অনুসন্ধান।

উপর-নিচ : ১। কৃষ্ণপক্ষের শেষ তিথি ২। পাপীরাই গুলজার করে ৩। মধ্য এশিয়ার প্রাচীন জাতি ৪। বকুনি ৫। কানায় কানায় ভরা ৭। পুরনো এ নাকি ভাতে বাড়ে ৮। ডাকনামে সত্যজিৎ রায় ৯। নিরামিষাশীর অপছন্দ ১০। সেলিম ক্রিকেটার ১৩। গাছও হয় মাছও হয় ১৫। চোরের কাজ ১৬। মেঘ ১৭। যা চলে গেছে ১৮। দাঁত।

এটি তৈরি করেছেন শান্তিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সগড়াই, বর্দ্ধমান।

এ মাসের প্রশ্ন

ছবিটি ভারতের এক সেরা কার্টুনিস্টের, যিনি শিশুদের জন্য লিখেছেন, এঁকেছেন অজস্র ছবি।
'লাইফ উইদ গ্রান্ডফাদার' বইটি তাঁরই লেখা, নয়াদিল্লিতে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন পুতুল মিউজিয়াম।
বলতো এই কার্টুনিস্টের নামটি কি?

নতুন ধাঁধা

১. পেট কাটলে চড়বে তুমি
মাথা কাটলে কাঁদবে
তিন অক্ষরে জুড়াবে প্রাণ
নাম বল তো কি হবে?

প্রবীর কুমার মৈত্র
রয়েড স্ট্রিট / কলকাতা

২. দেহাংশ, ডিমে দেয় মা
গাছে আছে বলে যা।

তিমিরবরণ চঁদ
গুসকারা / বর্ধমান

৩. মাথা নেই হাত আছে
কী এ উৎসব
নদী ও সমুদ্রকূল
মহা কলরব।

শ্যামল নায়ক
মগমা / ধানবাদ

৪. জোকার-ছাড় পাশাপাশি
খবর শুনতে ভালবাসি।

বিশ্বজিৎ কর
সুভাষপল্লী / খড়গপুর

ফুটকি থেকে ফুটকি

মজার পাতা

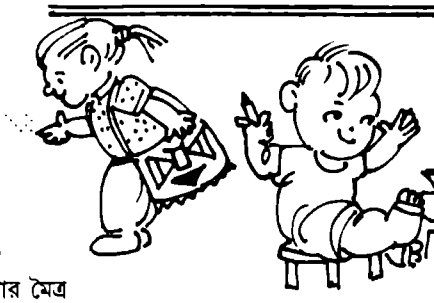

বিকির বিচার অঙ্ক

□১. তিন অঙ্কের সবচেয়ে ছোট সংখ্যা যাকে ৮, ৯, ১২ বা ১৫ দিয়ে ভাগ করলে প্রতি ক্ষেত্রেই ১ ভাগশেষ থাকে সংখ্যাটি কি?

□২. দুটি সংখ্যার যোগফল ২৫। বিয়োগফল ১৩। ঐ সংখ্যাদুটির গুনফল কত?

□৩. সংখ্যা ১ এবং সঙ্গে ৫টি শূন্য অর্থাৎ ১,০০০০০ -এটি ইউরোপে বলে একশ-হাজার; ভারতে বলে এক লক্ষ। কিন্তু বলতে পারো সংখ্যা ১ এবং সঙ্গে ৩০টি শূন্য — এই অবিশ্বাস্য সংখ্যাটিকে ইউরোপে কি বলে?

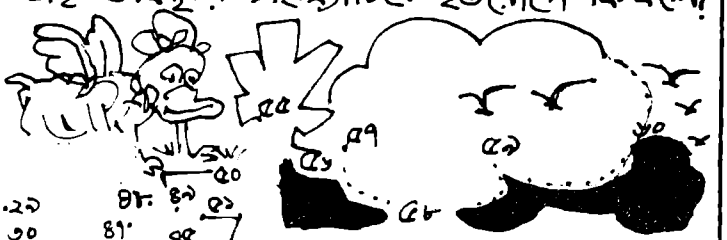

মাঘ সংখ্যার নতুন শব্দমালার উত্তর :

পাশাপাশি : ১. পতিব্রতা ৪. তেকাঁটা ৬. বস্তা ৭. তাকিয়া ৯. গরম-গরম ১১. নবম ১৪. শশক ১৬. আলাম-কালাম ১৯. তবল ২০. পায়া ২১. দমন ২২. নবকাল

উপর-নিচ : ১. পবমান ২. তিস্তা ৩. তাতার ৪. তেয়াগ ৫. টাইম ৮. কিমতে ৯. গম ১০. রমেশ ১২. বদলা বেকার ১৪. শম ১৫. কবিয়াল আপদ ১৭. মতন ১৮. লালন ২০. পাকা

মাঘ সংখ্যার নতুন ধাঁধার উত্তর :

নেতাজী ২. চাদর কপাল ৪. নটবর

অগ্রহায়ণ সংখ্যার নতুন ধাঁধার সফল উত্তরদাতাদের নাম ঃ

।। কলকাতা ।।

বাণীকণ্ঠ, শুক্লা, শুভদীপ, রূপপর্ণা, দেবকণ্ঠ, সুনন্দা, ঋতুপর্ণা, শ্রেয়পর্ণা, চুনী, কবিতা, অনির্বাণ ও দেবানিক / কনরপুর, কল-৩২; তাপস, রত্না, অভয়, পূবালী ও শৌভিক বসু / অটলবিহারী বসু লেন, কল-১১; সৌরভ, সৌনক, অলকা, শঙ্কর, রূপা, পার্থ, কেয়া ও ভাইলু / অনুশক্তি আবাসন, কল-৬৪; বুম্বাই, টুকাই, মিতুন, তাপস, পম্পা, অরিন্দম, শিখা, চুনী ও অমিয় লাই /ডি. এন. চ্যাটার্জী রোড, কল-৫৮; নাভাশা, প্রিয়াংকা, মীনাক্ষী, দাদাভাই ও তপনজ্যোতি ভৌমিক / মীনাক্ষী হাউসিং কমপ্লেক্স, তেঘরিয়া, কল-৫৯; অযস ও অভিতেশ চক্রবর্তী / পাটুলী, কল-৯৪; ববি, জুলি, অংশু, টুকটুকি, সৌরভ, বুড়ি ও মেঘা / অমলাংশু সেন রোড, কল-৪৮; সায়নদীপ ঘোষ / বিধান আবাসন, সল্ট লেক, কল-৯৭; প্রসূন ভট্টাচার্য, কাজন্তি সরকার ও শকুন্তলা ভট্টাচার্য / কালীতলা, বাগুইআটি, কল-৫৯; গৌরী, চয়নিকা, প্রণবেশ ও অমল ভট্টাচার্য / গুরুপ্রসাদ রায় লেন, কল-৫; টাবু, লাবু, বীতু, গোগল, মালা, বিভা, শোভা, মিহির ও সুনীল সাহা / বিজয়গড়, কল-৩২; বুনবুনি, বাপুন, ঘুতু, সুমন ও নন্দীশ / রিজেন্ট এস্টেট, কল-৯২; মা, বাবা, গৌতম, দেবযানী ও শমীক ভট্টাচার্য / পোর্ট হসপিটাল পার্ক, মাঝেরহাট, কল-৫৩; শান্তনু বসু / হিন্দুস্থান পার্ক, কল-২৯; প্রবীর, রমা, প্রিয়াংকা ও প্রিয়ালী বিবাড় / নিবেদিতা সরণি, পর্ণশ্রী, কল-৬০; রতন, দেবু, বাপ্পান, সেন, শুভাশিস, স্বপন, সঞ্জয়, অজয়, সজল, বিশ্বম্ভর ও পার্থ / শিয়ালদা, কল-৯;

।। ২৪ পরগনা (উঃ/দঃ) ।।

সৌম্য, শমিত, অয়ন, সায়ন ও শরণ্যা বটব্যাল / দক্ষিণ বারাসত (দঃ); অতীন গুহঠাকুরতা / দক্ষিণ মাসুন্দো, নবব্যারাকপুর (উঃ); পারমিতা ও পারিজাত চক্রবর্তী /ধর্মতলা রোড কোন্দালিয়া (দঃ); শঙ্কর চন্দ্র দে, শিপ্রা ও মিঠু দে / চাঁপাডালী মোড়, বারাসত (উঃ);

।। হাওড়া ।।

সৌম, সৌরভ ও সোনালি ব্যানার্জী / বি. বি. হালদার লেন, শিবপুর; বুম্বা ও ডোবা মুখার্জী / বিনোদ বিহারী লেন, শিবপুর; দিশা, দোদো, পুকান ও তুহিন কুমার গুপ্ত / নবকুমার নন্দী লেন, চৌধুরি বাগান; রিয়া ও ঋজু দাশগুপ্ত / সাঁকরাইল; প্রদীপ ও অপর্ণা বসু / মধুসূদন বিশ্বাস লেন; টুপাই, রূপাই, নন্দভাই ও শিখাদি / আন্দুল রোড; মীরা, বিমান, রীতা, সব্যসাচী ও শতাব্দী মুখার্জী / গণেশ চ্যাটার্জী লেন, শিবপুর;

।। হুগলী ।।

কুন্তল, গিরি, আনিসুর, কস্তুরী, দীপ, ডোডো ও বাপ্টু / ত্রিবেণী; ঈশান দেব, সুরঞ্জনা, সুনীতি ও অশোক কুমার মুখার্জী / শ্রীরামপুর; চায়না, প্রকৃতি ও রূপালী দাস / মহানাদ; দিগন্ত, পূর্বাশা, বিজলী, আশিস কোলে, ভুট্টো, প্রীতম, মৌ, ফুচু, মিঠু, অপূর্ব, কণিকা, চন্দ্রা, তন্দ্রা, রিতা ও টিনি / চণ্ডীকুণ্ড মাঠ, শেওড়াফুলী;

।। বর্ধমান ।।

বেকংশি, চৈতালী, প্রতিমা, শিল্পী, গৌরব ও দেবাশিস বিশ্বাস / ভিসেবগড়; সব্যসাচী, শান্তনু, সুগত ও পার্বতী মুখার্জী / ত্রিবটি, কালিপাহাড়ী; সরিৎ, রণিত, বাবা, দাদু ও মা / টেগোর রোড, আসানসোল; অভিজিৎ ও বর্ণালী চ্যাটার্জী / শিবপুর, ভাতুড়িয়া; বাবাই, আলো, সোনা, সুতপা ও সুদীপ্ত দাস / কাটোয়া, সার্কাস ময়দান; বনবীথি ও শঙ্খসাথি পাল / সুবোধ স্মৃতি রোড (বাইপাস), কাটোয়া; অভীক ও অন্তরা বাউরী / শান্তিপথ, সি-জোন, দুর্গাপুর; শতরূপা পাত্র / আকবর রোড, এ-জোন, দুর্গাপুর; টুবাই, টোটো, টবি, দুলালকাকা / বাঁকোলা এরিয়া কলোনি, উখড়া; কিশোর ও কল্যাণী দত্ত / ফরিদপুর, দুর্গাপুর; নীল্টু ও অপু / শাঁখারী পুকুর; অপু, দোলন, রীণা ও পাপ্পা মোহান্ত / লাকুড্ডি, কর্মকারপাড়া; রাজশ্রী ও রাজদীপ হাজরা / শ্রীপুর রোড, কুলটি; বিকাশ নন্দী, কল্পনা, মিঠু, জয়, পাপিয়া, সোমা, রানা, বরুণ দাস, মুনমুন ও মনা / গুরু নানক পল্লী, আসানসোল; অনুমিতা সরকার / জিলাপী বাগান, জগৎবেড়; পীযূষ, জয়শ্রী ও প্রলয় বাগচী / কল্যাণপুর, আসানসোল; তপন, রীণা ও ঋতুপর্ণা মুখার্জী / শাকতোড়িয়া; শৌনক ও অচ্যুত কোনার / অমরারগড়; টুয়া, টুবাই, বুয়া ও রুবাই / মানকর, পূর্বাশা; সঞ্চিত ও সঞ্জীব কুমার / অমরারগড়; সোহিনী ও শৌভিক ঘোষ / রানীগঞ্জ স্কুলপাড়া; প্রণব, গীতা, সৌম্য সেনগুপ্ত ও চিত্রলেখা দাশগুপ্ত / বহালপাড়া, কুলটি;

।। বীরভূম ।।

রাজা ও রানা / নজরুলপল্লী, নলহাটি; সুদীপ্ত ও সুতপা দাশ / দাসকল; শুভম ও তাতাই মুখার্জী, অর্ক, যিশু ও নেহা মণ্ডল / আমেদপুর; লাল, মামণি, সোমনাথ ও মিনু / স্কুলবাগান, বোলপুর;

।। বাঁকুড়া ।।

অন্বেষা, সঞ্চিতা, সুব্রত লায়েক, বাবা ও মা / মটুকবনী; সমীর, সুচিত্রা, সুপ্তদ্বীপা, সম্বুদ্ধ, বাবি ও ঈশিতা কর্মকার / দেশুড়িয়া, গঙ্গাজলঘাটী; নিসর্গা, রেখা ও কাঞ্চন কুমার দাস/ বেলিয়াতোড়, কলেজ পাড়া; শ্রাবন্তী, হৈমন্তী, অর্ণব, দীপা ও বিশ্বদেব বটব্যাল / ভক্তাবাঁধ; ঋজু, বকুল ও সৌমেন রায় / মাকুড়গ্রাম; প্রীতিসুন্দর ও প্রেমসুন্দর বটব্যাল / ভক্তাবাঁধ; আকাশ, বাণী, সোনা, শুভম, অসীম ও অস্মিতা / ভক্তাবাঁধ; দাদু, বাবা, মা, শীলু, মিলু ও নিলু / ভক্তাবাঁধ; ডলি, বকুল, মুকুল ও দেবিদাস ব্যানার্জী / দিগপাড়, চাটুজ্জোপাড়া; ডাঃ রামপ্রসাদ ধঁক ও দেবিদাস ব্যানার্জী / চাতরার মোড়, দাসদীঘি; অনির্বাণ পাত্র / হাতিরামপুর; নির্মাল্য মহান্তী / প্রতাপ বাগান; বাবা, মা ও জয়দীপ রায় / উখড়াডিহি; বুল্টি ও দীপু/ উখড়াডিহি; দেবলীনা বিশ্বাস / আইবাজার, বিষ্ণুপুর; শুভ্রাংশু, সুধাংশু, হিমাংশু, সিতাংশু, সৌরাংশু ও স্নেহাংশু / মটুকবনী, শালতোড়া; তনুশ্রী ও শ্রেয়সী ব্যানার্জী / জুনবেদিয়া; সুভদ্রা, আনতি, অপর্ণা ও শিউলি নায়ক / গঙ্গাজলঘাটী; সৈকত হাজরা ও শিঞ্জিনী ঘোষ / সারদা পল্লী, নতুনচটী; ইন্দ্রনীল ও অভিজিৎ মুখার্জী / মেজিয়া হাইস্কুল ডাঙ্গা, মেজিয়া; স্মিতা ও অর্ণব মুখার্জী / অর্ধগ্রাম;

।। মেদিনীপুর ।।

শান্তি, গায়ত্রী, শিউলি, পীযূষ, মৌলি, সৌরভ, মুক্তি, রিনা, শতাব্দী, শতদ্রু, ভক্তি, রীতা ও রিয়া দাশ / দাঁতন; শ্যামাশ্রী, সমীর, সৌম্য, রমা, কস্তুরী, শুভ্র, রিয়া ও ছোড়দি / মাঁয়াপাড়া, বেলদা; অলক, সাগর, পীযূষ, পিন্টু ও মধু শাসমল / শোনপুর, বামনগর; উমা, প্রণব, সুলেখা, বিশাখা ও সুদেষ্ণা হলদর / কদম কানন, ঝাড়গ্রাম; রঘু, সমু, মিঠু, বাপ্পা, পলি ও মিলি / মুগবেড়িয়া প্রতীদীপ ও অর্পণদেব দিণ্ডা / হাঁসচড়া; সৌরভ, পৌলমী, তনুশ্রী, শ্রাবণী, প্রণীতা, রনি, সান্টি, রিকু, পিকু; নুটু, টুকুন, বনি, রিঙ্কি, লিজা ও লিসা / কাজলাগড়;

।। মুর্শিদাবাদ ।।

পিউ গুপ্ত / অরবিন্দ পল্লী, রঘুনাথগঞ্জ; ফেরদৌসী, জেবুন্নেসা ও নজুলা খানম / বাণীনাথপুর (আশ্রম) সারগাছি আশ্রম; শফিকুল ইসলাম, রফিক খান চৌধুরি ও শিরীন সুলতানা / চর-কাবিলপুর, সাগরদীঘি; অরুণ, সঙ্গীতা, দেবদ্যুতি ও দূর্বাদল দাস / এ. সি. রোড (পূর্ব), খাগড়া; শুভঙ্কর ও তন্দ্রা চক্রবর্তী / তামালতলা রোড,আজিমগঞ্জ; পাপিয়া, শুভজিৎ, পুপুন ও বিশ্বজিৎ মুখার্জী / বনবিহারী পাড়া, জঙ্গীপুর; কল্পনা ও মৌসুমী মণ্ডল / মধুপুর রোড, বহরমপুর; বাঁধন, মোনেম ও পাপড়ি / ওল্ড পুলিশ লাইন রোড, গোরাবাজার, বহরমপুর; দিয়া, বেবি, রুম্পা, শিল্পী, চিন্টু, বুবু, ঠাম্মা ও বুকা / গোরাবাজার, বহরমপুর;

।। দার্জিলিং ।।

পারিজাত, পারমিতা, রুনু ও পরমেশ্বর মুখার্জী / শিলিগুড়ি; ধর্মদাস চক্রবর্তী / দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি;

।। দিনাজপুর (উঃ / দঃ) ।।

নির্মাল্য ও নিত্যগোপাল সাহা / বেলতলাপার্ক, বালুরঘাট (দঃ); সায়ক, রুণা ও সুবাস দে বিশ্বাস / সুকান্তপল্লী, ডালখোলা (উঃ); সুকান্ত অধিকারী, চিরদীপ অধিকারী, মাঙ্ক রায়, গোবর্ধন চন্দ্র দাস ও তপন ব্রহ্মচারী / হরিরামপুর (দঃ);

।। জলপাইগুড়ি ।।

দেবু, অরুণাভ ও গীতশ্রী চক্রবর্তী / ইঞ্জিনীয়ারিং কলোনি, আলিপুরদুয়ার জংশন; সমর ও বুলা দে / ইঞ্জিনীয়ারিং কলোনি, আলিপুরদুয়ার জংশন;

।। ঝাড়খণ্ড ।।

কৌশিক ও সৌমিক আশ / চিরকুণ্ডা ধানবাদ; রিচিক, নিরঞ্জন, রুবেন, শুভেন, বুবুন, চুমকি ও রন্টি করগুপ্ত / জামশেদপুর; সৌরেন, শৌভিক, সুকন্যা, গদাই, অর্ক, মিলি, গুড্ডু, ঊর্মি, অমিতাভ, গৌতম, কুণাল, বৌদি, মা ও বাবা / বাবু লাইন, মৌভাণ্ডার (ঘাটশিলা);

।। মালদহ ।।

অসীম, অনিল, পাণ্ডব, গোবিন্দ, প্রভাত, রঞ্জিত, পলাশ, প্রদ্যুৎ, গোগোল, ইন্দ্র, ডলি ও নয়ন / সাহাপুর; ইয়ংস্টার ক্লাবের সভ্যবৃন্দ / সাহাপুর;

।। নদীয়া ।।

শান্তনু, মহাশ্বেতা, দোলন ও ঝুলন / বাদকুল্লা; তারক, অর্চনা, দীপালী, দীপক, সুষমা, অক্ষয় ও পম্পা / ওলাদেবীতলা, নবদ্বীপ;

।। পুরুলিয়া ।।

দীপক, সৌমেন, রিয়া ও প্রিয়া চৌবে; আনাড়া গ্রাম;

।। অসম ।।

ঈশিতা, অর্কদীপ, সুমিতা, সুজাতা, প্রতাপ, শুভ্রেন্দু, দেবব্রত ও ঋতা চন্দ / নজরুল সরণি, হাইলাকান্দি; চয়ন, রত্না, দেবরূপা দত্তরায়, প্রদীপ দাশগুপ্ত ও বেবী গুহ / পূবালী এপার্টমেন্ট, বড়ঠাকুর মিল রোড, উলুবাড়ি, গৌহাটী; রেশমী, গীতা ও উদয় ভট্টাচার্য / নামডিং;

।। কর্নাটক ।।

রীতম ভট্টাচার্য / ব্যাঙ্গালোর।

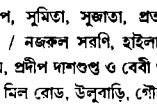

জানা-অজানা

মহসীন মল্লিক

যে কাঠ জলে ডোবে

আমরা জানি কাঠ মাত্রই জলে ভেসে থাকে। কিন্তু পৃথিবীতে এমন কাঠও আছে যা জলে ডুবে যায়। আর এই কাঠের গাছটি একমাত্র ভারতেই পাওয়া যায়। তার নাম 'অঞ্জন' কাঠ, বৈজ্ঞানিক নাম 'হার্ডউইকিয়া বাইনাটা'।

ট্রামগাড়ি থাকবেই

অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায়

খুব ভোরবেলা ময়দান ছুঁয়ে ট্রামগাড়ি ভেঙে দেয় ঘুম
হাওয়ার সঙ্গে কানাকানি তার, এই তো খেলার মরশুম
দুলে-দুলে ছোটে দু-কামরা গাড়ি
ছড়ানো যে হাত, গতির দিশারী
ঘুমের শহর জাগেনি তখনও, চারিদিক ভারি নিঝঝুম
খুব ভোরবেলা ময়দান ছুঁয়ে ট্রামগাড়ি ভেঙে দেয় ঘুম।

টালিগঞ্জ থেকে বালিগঞ্জ ছুঁয়ে ধর্মতলায় ছুটছে
ছুটন্ত লোক ব্যস্ততা নিয়ে ফুটদানি পেয়ে উঠছে।
ঢিলেঢালা গতি, খেয়ালী এ ট্রাম
মহানগরীতে ছোটে অবিরাম,
ভিড়-জ্যামজট ভ্রুক্ষেপ নেই, রোদ্দুর গায়ে ফুটছে
টালিগঞ্জ থেকে বালিগঞ্জ ছুঁয়ে ধর্মতলায় ছুটছে।

রাতের শহর খুশি ঝলমল, সেজেছে আলোর কন্যা
ভিক্টোরিয়ায়, শহীদ মিনারে জেগেছে আলোর বন্যা।
ট্রামগাড়ি সেও আলোর পোশাকে
হাতছানি দিয়ে ডাকছে তোমাকে
ঘুমপাড়ানির ঢং-ঢং গান, তাই বুঝি সে অনন্যা
রাতের শহর খুশি ঝলমল, সেজেছে আলোর কন্যা।

এ শহর যেন বলে না কখনো, এই ট্রামগাড়ি আর না
ইস্কুলে যায় যারা ভোরবেলা, তবে জুড়ে দেবে কান্না।
ট্রাম নয় এ তো স্বপ্নের গাড়ি
শুক্তির মাঝে মুক্তো বাহারি
যেন রূপকথা ঠাম্মার মুখে, স্মৃতি হীরে ঘেরা পান্না
এ শহর যেন বলে না কখনো, এই ট্রামগাড়ি আর না।

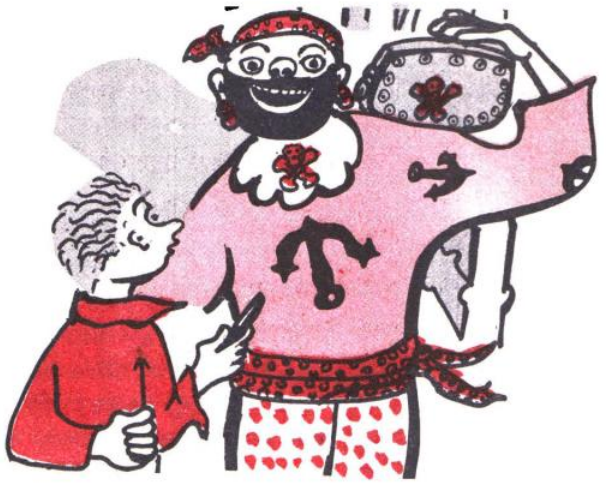

ওরা সবাই ব্যস্ত

অতীন বসু

'ক' গিয়েছে কলকাতাতে
দেখবে ঘুরে শহরটা
'খ' গেল ভাই খড়্গপুরে
দেখতে বড় স্টেশনটা।
'গ' গেছে ভাই গয়ায়
পিণ্ডি দিতে বাবার
'ঘ' গেল ঘাটশিলাতে
খবর আনতে মামার।

'ঙ' গেছে মোয়া খেতে
ট্রেনে চেপে জয়নগরে
'চ' গিয়েছে চক্ররেলে
বাবুঘাটের ধারে।
'ছ' গেল কিনতে ছাতু
জগুবাবুর বাজারে
'জ' যাচ্ছে জাপানে
চাকরি করার খাতিরে।
'ঝ' গেল ঝাউবনেতে
ফিস্টি করতে দীঘায়
'ঞ' কাঁদছে মিউ মিউ
একলা শুয়ে বিছানায়।

আমি ভয় পাইনি

দীপঙ্কর বিশ্বাস

হাতে নিয়ে পেন্সিলকাটা ছুরি বড়দার,
আমি আর ভুলো খুঁজি ডাকাতের সর্দার।
বাগানের কোণে কোণে এই ঘোর সন্ধ্যায়,
ভুলো করে ঘেউ ঘেউ, আমি বলি "কৌন্ হ্যায়"।
ভুলো মোর শাগরেদ আমি আজ দারোগা
ডাকাত পেলেই হলো মোটাসোটা বা রোগা।
মেলে যদি বোম্বেটে পাবো ধন গুপ্ত
ছুরির ডগায় বাছা হয়ে যাবে চুপ তো।
বাঁশঝাড়ে খস্‌খস্ ভুলো করে চন্‌মন্
ভুলোরে সামাল দিতে আমি ছুটি প্রাণপণ।
হাঁসফাঁস করে ভুলো, দেখেছে কি ডাইনী?
ভুলোটাই পেলো ভয়, আমি ভয় পাইনি।
দাদা বলে, "খরগোস", আমি কই, "বোম্বেটে"
শুনে সবে হাহা রবে হেসে মরে দম ফেটে।
এই ফাঁকে নির্ঘাৎ পালিয়েছে ব্যাটারা
নইলে দিতাম এনে বোম্বেটে প্যাঁটারা!

মণিরামের প্রেতাত্মা

সতীশ বিশ্বাস

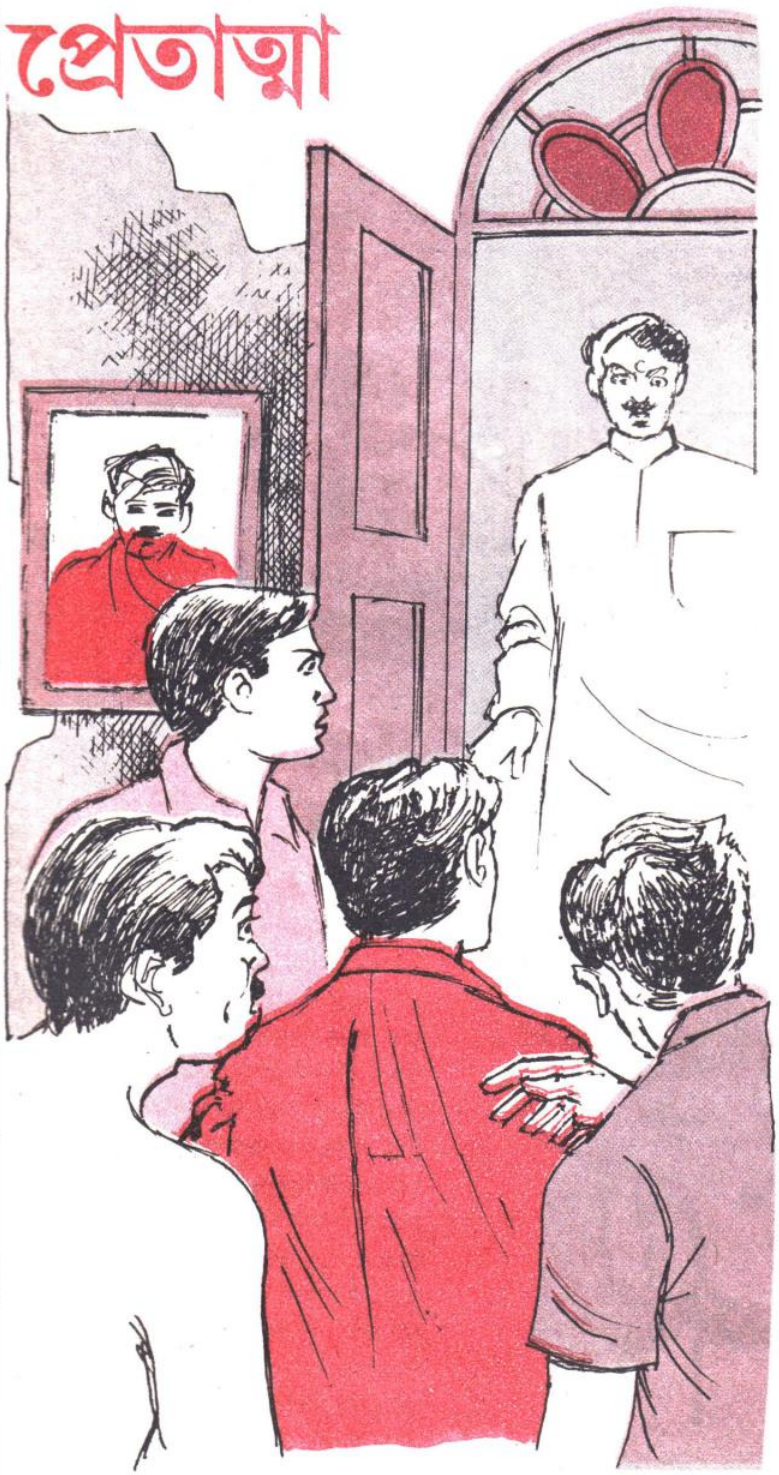

পবন গ্রামের সব থেকে ধনী লোক মণিরাম রায়। তাঁর একটা মস্ত মুদিখানা দোকান আছে, আছে দুটো ট্যাক্সি আর বিঘে পঁচিশেক জমি। তাঁর বাড়িটি বিশাল কিন্তু সংসারটা ছোট। তিনি, তাঁর স্ত্রী এবং একটি কুড়ি বছরের ছেলে ছাড়া সংসারে আর কেউ নেই। বাড়িটায় অনেকগুলো ঘর থাকায়, কর্মচারীরা তাঁর বাড়িতেই বিভিন্ন ঘরে থাকতো। কর্মচারীর সংখ্যা সাত। দুটো ট্যাক্সি-ড্রাইভার, দু'জন মুদিখানার কর্মচারী, দু'জন জমিতে খাটার লোক আর একজন রাঁধুনী।

মণিরামের ইচ্ছে ছেলে রাজু লেখাপড়া শিখে বাড়িতে থেকেই সবকিছু দেখাশুনা করুক। কী দরকার বিদেশ-বিভুঁই-এ গিয়ে চাকরি করার? ভগবান তো তাঁকে কম দেননি। মনে মনে এই মতলব নিয়ে, ভিতরে ভিতরে যোগাযোগ করে পাশের গ্রামের এক সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ের সঙ্গে তিনি রাজুর বিয়ে দিয়ে দিলেন। কিপটে বলে মণিরামের একটু বদনাম ভাসতো বাতাসে কিন্তু ছেলের বিয়েতে খরচ করলেন দরাজ হাতে। সবাই বললো, হ্যাঁ, বিয়ের মতো বিয়ে বটে একখানা! অবশ্য সেই সঙ্গে কেউ কেউ এটাও বললো, কী দরকার ছিল মণিরামের এত তাড়াহুড়া করে ছেলের বিয়ে দেবার? ছেলে তো বলতে গেলে এখনও কচি খোকাটি! কিন্তু, কী অদ্ভুত ব্যাপার! এই এরাই আবার এক মাস যেতে না যেতেই বলতে লাগলো, ভাগ্যিস! মণিরাম ছেলের বিয়েটা দিয়ে দিয়েছিলেন, না হলে কী যে হতো! হ্যাঁ, বিয়ের ঠিক সাতাশ দিনের মাথায় মণিরামের স্ট্রোক হলো এবং কিছু করার আগেই তিনি মারা গেলেন। স্ত্রী, ছেলে, ছেলের বৌ তো কাঁদলোই, সেই সঙ্গে কর্মচারীরাও খুব কাঁদলো। প্রত্যেকটা কর্মচারীকে মণিরামই নিজে ডেকে এনে কাজ দিয়েছিলেন। ভালবাসতেন খুব।

তিন মাস পরের ঘটনা। সেদিন সন্ধ্যেবেলায় রাজু এক বন্ধুর বাড়ি যাবে বলে ঘড়িটা পরতে গিয়ে দেখে, তার সোনার ঘড়িটা যেখানে থাকত, সেখানে নেই। যাঃ ব্বাবা! রাজু ভাবে, স্পষ্ট মনে

আছে, দু'টো নাগাদ মুদিখানা থেকে এসে নিজের হাতে ঘড়িটা ওখানে রেখেছিলাম। বাড়িতে টি-টি পড়ে গেল। মা-বৌ সব জায়গায় তন্নতন্ন করে খুঁজতে লাগলো। কর্মচারীরাও বাদ গেল না। কিন্তু কোথায় ঘড়ি! থম মেরে বসে রাজু আবার মনে করে দেখলো, না, আজ বিকেলে তো বটেই, সারাদিনে তাদের বাড়িতে বাইরের কোনো লোকজন আসেনি। কাজেই ঘড়ি নিয়ে থাকলে তা নিয়েছে বাড়িরই কেউ। মা-বৌ নেবে না। সুতরাং... কর্মচারীদের ডেকে সে একে একে জিজ্ঞেস করলো কিন্তু সবারই এক কথা, আমি নিইনি বাবু।

মণিরাম রায়ের মৃত্যুর পর বেশ কিছুদিন হয়ে গেলেও সুবাসিনী দেবী এখনও ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠতে পারেননি। হয়তো পারতেন, কিন্তু ইদানিং মণিরামের আবছা মূর্তি তিনি বেশ কয়েকবার দেখেছেন। স্বামীর কণ্ঠস্বরও নাকি শুনেছেন দু'একবার। মণিরাম কখনো বলেছেন, আমি তোমার চারপাশে আছি সব সময়। তোমার কোনো ভয় নেই। কখনো শুনেছেন, রাজুর বৌ তোমাকে অযত্ন করে না তো? আবার কখনো, তোমার সোনার অলংকারগুলো এখনই যেন রাজুর বৌকে দিয়ে বসো না। সাবধান। শুধু সুবাসিনী দেবী নন রাজুর বৌও নাকি বার দুয়েক মূর্তিটাকে দেখেছে। কোনো কথা বলেনি শুধু তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেছে। কর্মচারীদের মধ্যেও মন্টু আর সুবল দেখেছে তাদের ঘরগুলোর চারদিকে মূর্তিটাকে ঘুরে বেড়াতে। ফলে সারা বাড়িতে একটা ভয়ের ছমছমে পরিবেশ। রাত সাড়ে দশটা, বড়জোর এগারোটা হতে না হতে খাওয়া-দাওয়া সেরে সবাই শুয়ে পড়ে। গোটা বাড়িটা ঢেকে ফেলে ঘুটঘুটে অন্ধকার।

সেদিন রাতেও সবাই খেয়েদেয়ে, যার যার মতো শুয়ে পড়েছে। মন্টু-সুবলরা শুয়ে শুয়ে এ-গল্প সে-গল্প করছিল। রাত সোয়া বারোটা নাগাদ হঠাৎ সুবলের চোখটা দরজার দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে যায়। তার মুখ দিয়ে অস্ফুট একটা আওয়াজ বেরুলো। সঙ্গে সঙ্গে সবাই

দারোগাবাবু হুকুম করলেন, চল ব্যাটা শ্রীঘরে!

দরজার দিকে তাকায়। দেখে দরজাটা আপনা-আপনি খুলে গেল। আর সেই দরজা দিয়ে আবছা চাঁদের আলোয় দেখা গেল মণিরামবাবু এসে দাঁড়িয়েছেন। সবাই একে অপরকে জড়িয়ে ধরে কাঁপতে লাগলো। হঠাৎ প্রেতাত্মাটা অদ্ভুত গলায় কথা বলে উঠলো, দশ মিনিটের মধ্যে রাজুর সোনার ঘড়িটা ফেরত দিয়ে আয়। না দিলে আমি তোর ঘাড় মটকে রক্ত খাবো! কথাগুলো ঠিক কার দিকে তাকিয়ে বললো বোঝা গেল না, কিন্তু পুলিন সঙ্গে সঙ্গে ছেঁড়াখোড়া কিছু বাতিল জামাকাপড়ের তলা থেকে একটা নোংরা পুঁটলি বের করলো। তার মধ্যেই সে ঘড়িটা রেখেছিল। তারপর পা টিপে টিপে রাজুর ঘরের সামনে গিয়ে দেখে দরজা বন্ধ।

কাছে যেতেই পুলিন বুঝলো দরজা বন্ধ নয়, ভেজানো। একটু ঠেলা দিতেই সেটা খুলে গেল। ঘড়িটা যেখানে রাখা থাকত সেখানেই সেটা রাখতে যাবে এমন সময় আলো জ্বলে উঠলো। পুলিন পেছন ফিরতেই দেখে ছোট মালকিন দাঁড়িয়ে আছেন সুইচবোর্ডের কাছে। পুলিন খোলা দরজা দিয়ে পালাবার চেষ্টা করতেই দেখলো সেখানে মণিরামবাবুর প্রেতাত্মা দাঁড়িয়ে। সে ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। তার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেছে! সেই চোখ দিয়েই সে দেখলো প্রেতাত্মাটা তার মাথা থেকে পরচুলাটা খুলে ফেললো আর তার ঢিলে পোশাকটাও খুলে পড়লো। দেখা গেল সেখানে রাজু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে। পুলিন সঙ্গে সঙ্গে তার পা জড়িয়ে ধরে বললো, ছোটবাবু, এবারের মতো আমাকে মাপ করে দিন। আর কোনোদিন এমন কাজ করবো না, দেখে নেবেন। রাজু বললো, আমি মাপ করার কে রে? ওই বাবুকে বলে দেখ উনি যদি মাপ করেন। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে তবে তোকে ধরেছি! পুলিন ধাঁ করে পেছন ফিরে দেখে দারোগাবাবু! তাঁর ইয়া বড় গোঁফ জোড়া দেখে সে আর কিছু বলতে সাহস পেল না। পুলিনের হাতে হাতকড়া পরিয়ে, তার পেটে একটা রুলের খোঁচা মেরে দারোগাবাবু হুকুম করলেন, চল ব্যাটা শ্রীঘরে!

ছবি : রঞ্জন দত্ত

নিলয় স্যার

দীপ্তরূপ গঙ্গোপাধ্যায়

আজ বিকেলে বুদু খেলতে যায়নি। টিপ-টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে কার্নিশ থেকে গড়িয়ে পড়া জলে হাত পাতছে। ছিটকে এসে জল তার মুখে, গায়ে লাগছে। বাঁ হাতের জামার হাতার কিছুটা ভিজে গেছে। বুদু সুর করে বলে, 'জল পড়ে পাতা নড়ে, পাগলা হাতি মাথা নাড়ে।'

ঘরে এসে বুদু খাতা নেয়। কলম ধরে। জানলার দিকে চেয়ে বৃষ্টি দেখতে থাকে। ছড়া সে ভালই লেখে। এবার ছড়া লিখে স্কুলে প্রাইজ পেয়েছে।

বুদুর বাবা পোস্টঅফিসে কাজ করেন। বদলির চাকরি। বছর দুয়েকের বেশি এক জায়গায় থাকা হয় না। এর মধ্যেই বুদুর দুটো স্কুল বদলি হয়ে গেছে।

এই মাস ছয়েক হলো এখানে তারা এসেছে। এ জায়গাটা বুদুর খুব পছন্দ হয়েছে। বিশেষ করে এই একতলা বাড়ি, সামনে ধু-ধু করা চাষের জমি, মাঝে মাঝে দু-একটা বট-অশ্বত্থ গাছ, খেত-জমি পেরিয়ে মাটির বাঁধ টপকে দামোদর নদ, বালিতে ভরা চর। শীতকালে দামোদরে জল না থাকলেও বর্ষায় নাকি এর রূপ আলাদা। প্রথম এসে বুদু বন্ধুদের সঙ্গে হাঁটুজলের দামোদর পেরিয়ে ওপারে গেছে। ইটভাঁটা দেখেছে। আর এপারে ছোট একটা বাজার—সুরে-কানলা। এখানের লোকেরা বেশির ভাগই চাষ আবাদ করে, আবার কিছু লোক ইটভাঁটায় কাজ করে।

এই গ্রামেরই স্কুলে বুদু পড়ে। যদিও স্কুল বাড়িটা তার বাড়ি থেকে বেশ দূর। বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করতে করতে আল পেরিয়ে, ধোপাপাড়ার মাঠ পেরিয়ে তার স্কুলে যেতে দারুণ লাগে। বুদু লেখে—

টাপুর টুপুর
সকাল দুপুর
ঘরে বন্দী সবাই,
সূর্য তুমি দাও না উঁকি
আমরা মাঠে যাই।

বুদু, অ্যাই বুদু, বাড়ি আছিস?

ঘরের ভেতর থেকে বুদু বলে, কে রে?

ভুতো।

আয় ভেতরে আয়—

ভুতো ছাতা বারান্দায় রেখে, চটি খোলে। পাপোশে পা মুছতে মুছতে বলে, কাল আমার জন্মদিন, অবশ্যই যাবি।

কখন রে?

সন্ধ্যাবেলা। বেশি রাত হলে আমার বাবা তোকে পৌঁছে দেবে। কাকু-কাকীমা কেউ বাড়ি নেই রে?

না রে। বাবা-মা চুঁচুড়া গেছেন। বিয়েবাড়িতে।

তুই যাসনি কেন?

কাল তো অঙ্ক পরীক্ষা, আর আমি অঙ্কে যা কাঁচা।

তুই তো তবু ষাট-সত্তর পাস, আমি তো চল্লিশের গণ্ডিই টপকাতে পারি না।

তুই কাল পরীক্ষা দিতে যাবি না!

হ্যাঁ হ্যাঁ স্কুল যাবো, রাতে তো অনুষ্ঠান।

আচার খাবি?

কিসের রে?

আমের।

ঝাল-ঝাল, মিষ্টি-মিষ্টি না টক-টক।

খেয়েই দেখ না।

বুদু বোয়েম থেকে আচার নিয়ে দুটো প্লেটে রাখে। ভুতোর হাতে একটা প্লেট দিয়ে বলে, খা—

ভুতো আঙুল দিয়ে একটা আমের গা থেকে মশলা তুলে মুখে পোরে। চোখ দুটো বড় বড় করে আঙুল চাটতে চাটতে বলে, ফ্যানটা হয়েছে রে।

আচার খাওয়া শেষ হলে ভুতো বলে, চলিরে বুদু, কাল আবার বিটকেল পরীক্ষা আছে।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে বুদু ভুতোর চলে যাওয়া দেখে। ঝপাৎ ঝপাৎ করে জমা জলে পা ফেলে আওয়াজ করতে করতে ভুতো চলে যায়।

বৃষ্টি এখনো কমেনি। টিপ টিপ করে পড়েই চলেছে।

২

সন্ধ্যা নামে। একটু দূরে গাবুদাদের

বাড়ি থেকে শাঁখের আওয়াজ ভেসে আসে। অঙ্ক বই আর খাতা সামনে নিয়ে মেঝেতে বসে বুদু।

পাশের বাগানে বৃষ্টির জমা জলে ঝপাৎ-ঝপাৎ করে আওয়াজ হচ্ছে। বুদু ভাবে ছাদের জল পড়ছে। কিন্তু না, আওয়াজটা যেন অন্যরকম। পা ফেলার শব্দ। বুদু বারান্দায় এসে বাগানের দিকে চেয়ে দেখে কেউ নেই, নিকষ অন্ধকার, বৃষ্টি পড়েই চলেছে। বাগানে ঝপাৎ-ঝপাৎ আওয়াজের তীব্রতা বাড়ছে। কখনও কাছে আসছে আবার কখনও দূরে চলে যাচ্ছে। এবার জানলার কাছে এসে থেমে গেল।

কে যেন বলল, বুদু অঙ্ক করছিস—

চারদিকে চেয়ে জানলায় চোখ পড়তে বুদু দেখে রোগা, পাংশুটে মুখ, খোঁচা-খোঁচা গালভর্তি দাড়ি, চোখে পুরু কাচের চশমা পরা একজন দাঁড়িয়ে আছে।

বুদু বলে, কে আপনি?

আমি নিলয় স্যার, তোদের স্কুলের অঙ্কের মাস্টারমশাই।

আপনাকে তো কোনোদিন দেখিনি?

দেখবি কি করে, আমি যে এক বছর ধরে অসুস্থ। আজ একটু সুস্থ লাগছে তাই পাইচারি করতে বেরিয়েছি।

স্যার, ভেতরে আসুন না।

নারে, ভেতরে যাবো না। শুয়ে থেকে পাগুলোয় যেন খিল ধরে গেছে। তা তুই কোন অঙ্কটা পারছিস না দেখি। প্রায় দশ হাত দূরের জানলার বাইরে থেকে নিলয় স্যার বলেন, পাঁচ প্রশ্নমালার তিনের অঙ্কটা পারবি—

সুদকষা, হ্যাঁ পারবো স্যার।

ওটা পরীক্ষায় আসবে কিন্তু। আর দশ প্রশ্নমালার আটেরটা, সাতের পাঁচেরটা, দুইয়ের তিনেরটা, পাঁচের সাতেরটা, খুব ইমপরটেন্ট।

বুদু অঙ্কের নম্বরগুলো খাতায় টুকে নেয়।

তোর লেখা একটা ছড়া শোনাবি, বুদু?

কোনটা স্যার—

যেটা তোর খুশি।

সূর্যিমামার বড় কষ্ট—
বাবরি মসজিদ দেখে,
মৌলবাদ, নিপাত যাক—
বলেন সৌরমণ্ডলের সবাইকে।

দারুণ, দারুণ হয়েছে। একেবারে বাস্তব। সৃষ্টিকর্তাই মৌলবাদের ধ্বংস চেয়েছেন, দারুণ!

ওটা পরীক্ষায় আসবে কিন্তু।

স্যার আপনার বাড়ি কোথায়?

স্কুলের পেছনে। আজ তবে চলি রে বুদু, অঙ্কগুলো ভাল করে করিস।

স্যার চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই বুদু বারান্দায় গিয়ে দেখে কেউ নেই। স্যার এলেনই বা কোথা দিয়ে আর গেলেনই বা কোথা দিয়ে—কিছুই বুঝতে পারে না বুদু।

ঘরে এসে স্যারের দেওয়া ইমপরটেন্ট অঙ্কগুলো কষতে থাকে।

৩

পরের দিন প্রশ্নপত্র পেয়ে বুদু দেখে নিলয় স্যার যে কটা অঙ্ক বলেছিলেন সব কটাই এসেছে। বুদু সব কটা অঙ্ক ঠিক ঠিক করে কষে। প্রতিটার উত্তরই মিলে যায়।

পরীক্ষা শেষে বাড়ি ফেরার পথে বন্ধুদের বলে, কাল সন্ধ্যায় নিলয় স্যার আমাদের বাড়ি এসেছিলেন।

ভুতো অবাক হয়ে বলে, নিলয় স্যার! কেমন দেখতে বল তো?

কেন, খোঁচা-খোঁচা গালভর্তি দাড়ি, চোখে পুরু কাচের চশমা, পাংশুটে চেহারা।

নেপাল বলে, ব্যাটা ছবি দেখেছে।

নারে ছবি দেখিনি। সত্যি বলছি কাল সন্ধ্যায় এসেছিলেন।

সুকুমার চোখ টিপে বলে, তোকে কি বললেন রে?

ইমপরটেন্ট অঙ্কগুলো বলে দিলেন, আর বিশ্বাস কর যে ক'টা বলেছিলেন সবকটা পরীক্ষায় এসেছে।

ভুতো বলে, টুপি দিচ্ছিস?

টুপি দেব কেন? আমায় ছড়া বলতে বললেন, আমি ছড়া শোনালাম।

নেপাল বলে, ঢপ দেবার জায়গা পাস না—

কেন?

নিলয় স্যার তুই আসার প্রায় এক বছর আগে রেল অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছেন, আর তুই বলছিস কাল তোর বাড়ি এসেছিলেন!

সবাই হো হো করে হেসে ওঠে। শুধু বুদু হাসে না। বুদুর মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে যায়। ভাবে, এটা কেমন করে হলো?

ছবি : অরিজিৎ গুপ্ত

কিচির মিচির আসর

সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

পাখির খাঁচাটা খোলা দেখে মা তো একেবারে থ। তাড়াতাড়ি কাছে এসে দেখে একটাও পাখি নেই। সব গেছে উড়ে। মায়ের মন গেল খারাপ হয়ে। মনে মনে ভাবল টাপুর স্কুল থেকে ফিরে না জানি কী কাণ্ড বাধায়।

মা টুপুরকে ডাকল।

টুপুর এক দৌড়ে এসে দাঁড়াল মায়ের সামনে। ডাকছ মা?

মা বলল, বলছি তুই কি মা ভুল করে পাখির খাঁচা খুলেছিলি?

টুপুর অবাক হয়ে বলল, না তো মা। আমি তো সোনালীদের সঙ্গে কিতকিত খেলছিলাম।

মা বলল, দ্যাখ সত্যি বলছিস তো? না হলে দাদা এসে ধুন্ধুমার কাণ্ড বাধাবে কিন্তু।

টুপুর মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বলল, মা আমি কখনো তোমার কাছে তো মিথ্যা বলি না। বিশ্বাস করো আমি জানিই না।

মা চিন্তিত মুখে ঠোঁট উল্টে বলল, জানি না বাপু কি করে এমনটা হলো।

টুপুর অবাক হয়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, কি হয়েছে মা, তুমি এত চিন্তা করছ কেন?

মা বলল, আরে বাবা সব পাখিগুলো উড়ে গেছে।

টুপুর চেঁচিয়ে উঠল, কি বলছ মা!

হ্যাঁরে মা, ঠিকই বলছি। যাও বিকেলে একটু খেলে চলে এসো। একদম দেরি করবে না, কেমন। আমি যেন এক ডাকে তোমাকে পাই। বলেই মা আঁচলে চাবির তোড়াটা গিঁট দিতে দিতে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

টুপুর এক দৌড়ে চলে গেল অতসীদের বাড়িতে।

অতসীদের বাড়িতে তখন সমৃতা, অমৃতা, মন্দা, ঈশিতা, নীতা আর সোনাই পুতুল নিয়ে খেলছে। আজ বারবির বিয়ে। উঃ ছেলে পুতুলটা অপূর্ব সুন্দর দেখতে। জুতো মোজা কোট প্যান্টে দেখার মতো। যেন সাহেব বাচ্চা। টুপুরের নাম দেওয়া পুতুল 'নটি বয়'।

অতসী বলল, ঐ তো টুপুর এসে গেছে।

সমৃতা হাসতে হাসতে বলল, টুপুর তোর ছেলে পুতুলটা দারুণ দেখতে হয়েছে।

মন্দা বলল, কেন রে, অতসীর বারবি ডলটা কিসে কম?

অমৃতা পাকা পাকা গলায় বলল, মেয়ে আমাদের মোটেও ফ্যালনা নয়।

সমৃতা অভিমানের স্বরে বলল, বাবা দেখলাম। আমি কি তাই বলেছি?

ঈশিতা হাসতে হাসতে বলল, নে নে সাজা তো মেয়েকে। কথা বাড়াসনি। উলু দে, শাঁখ বাজা। নাকি ঝগড়া করেই সময় কাটাবি তোরা!

নীতা ওদের মধ্যে একটু বড়। সে হাসতে হাসতে বলল, আচ্ছা নে নে লুচিপাতা আর মাটির সন্দেশগুলো নিয়ে আয়।

অতসী তাকিয়ে থেকে থেকে কেঁদে ফেলল।

সোনাই বলল, আহারে কাঁদবেই তো। ওহ বারবিটা আজ চলে যাবে টুপুরের কাছে। টুপুরের তো ছেলে তাই ও কাঁদছে।

সমৃতা বলল, কাঁদার কি আছে, বারবি তো নটি বয়-এর সঙ্গে মাঝে মাঝে বেড়াতে আসবে।

অমৃতা একটু বেশি পাকা। বলল, সামনেই পুজো। বিয়ের পরেই আবার অতসীর খরচা আছে।

মন্দা হো হো করে হাসতে লাগল। বলল, তুই থামাবি তোর এই পাকা পাকা কথা!

অতসী টুপুরকে চুপ করে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করল, কি রে তোর মুখ থমথমে কেন? তুই তো ছেলেবাড়ির লোক, আমার মেয়ে পুতুল তো তোর বাড়িতেই যাবে। তোর তো আনন্দ হবার কথা। তা না তুই এত গোমড়া কেন রে?

টুপুর হাসতে হাসতে বলল, নারে এমনি।

সমৃতা চেপে ধরল, না, কিছু একটা হয়েছে। চেপে যাচ্ছিস মনে হচ্ছে।

টুপুর বলল, জানিস দাদাভাইয়ের পাখির খাঁচাটা কে যেন খুলে রেখেছিল। আর সব পাখিগুলো গেছে উড়ে। এখন খাঁচা ফাঁকা।

সে কি রে। আমরা গায় হলুদের তত্ত্ব নিতে সকালে যখন গেলুম তখনও তো দেখলুম সব পাখিগুলো খাঁচায় জমিয়ে কিচির মিচির আসর বসিয়েছে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ কে এমন কাজ করল রে? শুধাল অতসী।

টুপুর বলল, জানি না ভাই, মনটা ভাল লাগছে না। খেলায় মোটেই মন বসছে না। আজ চলি রে, কাল খেলব।

নীতা চেঁচাল, আরে বাবা, মেয়ে-জামাইকে নিয়ে যা।

টুপুর কষ্ট চেপে হেসে ফেলল।

ঈশিতা রওয়ানা করিয়ে দিল মেয়ে-জামাইকে। অতসীর চোখ ছলছল করছে।

টুপুর বারবি ডল আর নটি বয়কে নিয়ে এক ছুট বাড়ির দিকে।

বাড়িতে এসেই মাকে বলল, মা! মা! এই দেখ আমার ছেলে পুতুলের আজ বিয়ে হলো। সে এই মেয়ে পুতুলটা নিয়ে এসেছে।

মা তো হেসে খুন। বলল, দেখ মেয়ের কাণ্ড! আমায় আগে বলবি তো, আমি উলু দিয়ে শাঁখ বাজিয়ে ছেলে আর বউকে ঘরে তুলতুম।

টুপুর মায়ের কথা শুনে মুচকি মুচকি হাসতে থাকে।

এদিকে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হলো। টাপুর ফিরছে না দেখে মা পড়ল চিন্তায়। বাবাও আজ তাড়াতাড়ি এসে পড়েছে। পাড়ায় দুর্গাপুজোর মিটিং আছে। ক'দিন বাদেই পুজো। ভাবতেই টুপুরের বুকের মধ্যে ড্যাম কুড় কুড় বাজনা যেন আপনিই বেজে ওঠে। সামনের শিউলি গাছটায় ফুল ধরবে, রোদ্দুরের রঙ যাবে বদলে। সবার মনে খুশির জোয়ার বইতে থাকে। ভাবলে গায় কাঁটা দেয়।

বাবা ফিরেই জিজ্ঞাসা করল, টাপুর কোথায়?

টুপুর বলল, বাবা! জান তো দাদাভাই ভলি ম্যাচ খেলতে গেছে।

মা বলল, এই খেলা খেলা করে ছেলেটার পড়ার সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে।

বাবা পায়ের মোজা খুলতে খুলতে বলল, দেখ পড়াশুনায় ও ফার্স্ট না হয় সেকেন্ড হয়। পাশাপাশি খেলাধূলাও খুব দরকার। কিন্তু—

টুপুর রেশ টেনে বলল, কিন্তু এত দেরি হচ্ছে কেন?

বাবা টুপুরকে কোলে তুলে নিতে নিতে বলে, খুব পাকা পাকা কথা শিখেছ, না!

টুপুর বাবার কোল থেকে নেমে গেল পড়ার ঘরের দিকে। মা এলো চা নিয়ে। এসেই বলল, জানো সর্বনাশ হয়েছে।

বাবা অবাক গলায় জানতে চাইল, কেন কি হয়েছে?

মা চিন্তিত গলায় বলল, পাখির খাঁচার দরজাটা কে খুলে দিয়েছে কে জানে। সব পাখি উড়ে গেছে। দেখলে এত খারাপ লাগছে কি বলব!

বাবা চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে বলল, বল কি? কে এমন কাজ করল?

মা বলল, হ্যাঁরে বাবা, তাই তো ভাবছি। টাপুরটা এসে দেখলেই তো ধুন্ধুমার কাণ্ড বাধাবে। চিল্লেমিল্লে একশা করবে।

বাবা জিজ্ঞাসা করল, কে করেছে কিছুই দেখনি?

মা বলল, আমি দুপুরে কাইদানা আর জল দিতে গিয়ে দেখি এই কাণ্ড।

হঠাৎ টাপুর দৌড়তে দৌড়তে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে চেঁচাতে লাগল, মা! মা! ওমা! তাড়াতাড়ি দরজা খোল।

মা দৌড়ে গেল দরজার কাছে। দরজা খুলতেই টাপুর হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকেই সটান শুয়ে পড়ল খাটের উপর।

বাবা ছুটে এল। জিজ্ঞাসা করল, কি রে শরীর খারাপ লাগছে?

টাপুর চুপ।

মা পাশে বসে মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলল, কি হয়েছে রে?

টাপুর একটু ধাতস্থ হয়ে বলল, জান মা, আজ করেদের বাগানবাড়িতে ভলি বলটা গিয়ে পড়তেই আমরা আনতে ঢুকলাম। ঢুকেই চোখ ছানাবড়া। পাকা ডাঁশা কাঁচা মিলিয়ে পরপর তিনটে পেয়ারা গাছ দাঁড়িয়ে। কতগুলো পাখি মনের আনন্দে নাচছে গাইছে আর পেয়ারা খাচ্ছে। সব চেয়ে মজা কি বল তো মা! পাখিগুলো এমন দুষ্টু বেছে বেছে পেয়ারাগুলো খাচ্ছে আর বাদবাকি ঝুলছে গাছে। তপাই গাছে উঠতে ওস্তাদ, ও উঠল গাছে। আমরা দু' একটা খেলাম। রাজা জামাটা ঠোঙার মতো করে বেশ কিছু পেয়ারা নিল। কিন্তু যেই পাঁচিলে উঠেছি দেখি তলা থেকে কে যেন একটা পা ধরে টানছে। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি মালীকাকা আর অন্য দুজন লোক। ব্যস। আমাদের আটকে রাখল। বলল, দাঁড়া, না বলে গাছে হাত দেওয়া, তোদের পুলিশে দেব। সারারাত ঘরে বন্দী হয়ে থাকবি। কোনো অনুরোধ শুনছে না। এদিকে সন্ধ্যা হয়ে আসছে। হঠাৎ মালীকাকা নারকেল ছোবড়া আনতে গেল পুকুরপাড়ে।

তপাই বলল, বাঁচতে হলে পালাতে হবে। এক্ষুণি, নে রেডি হ।

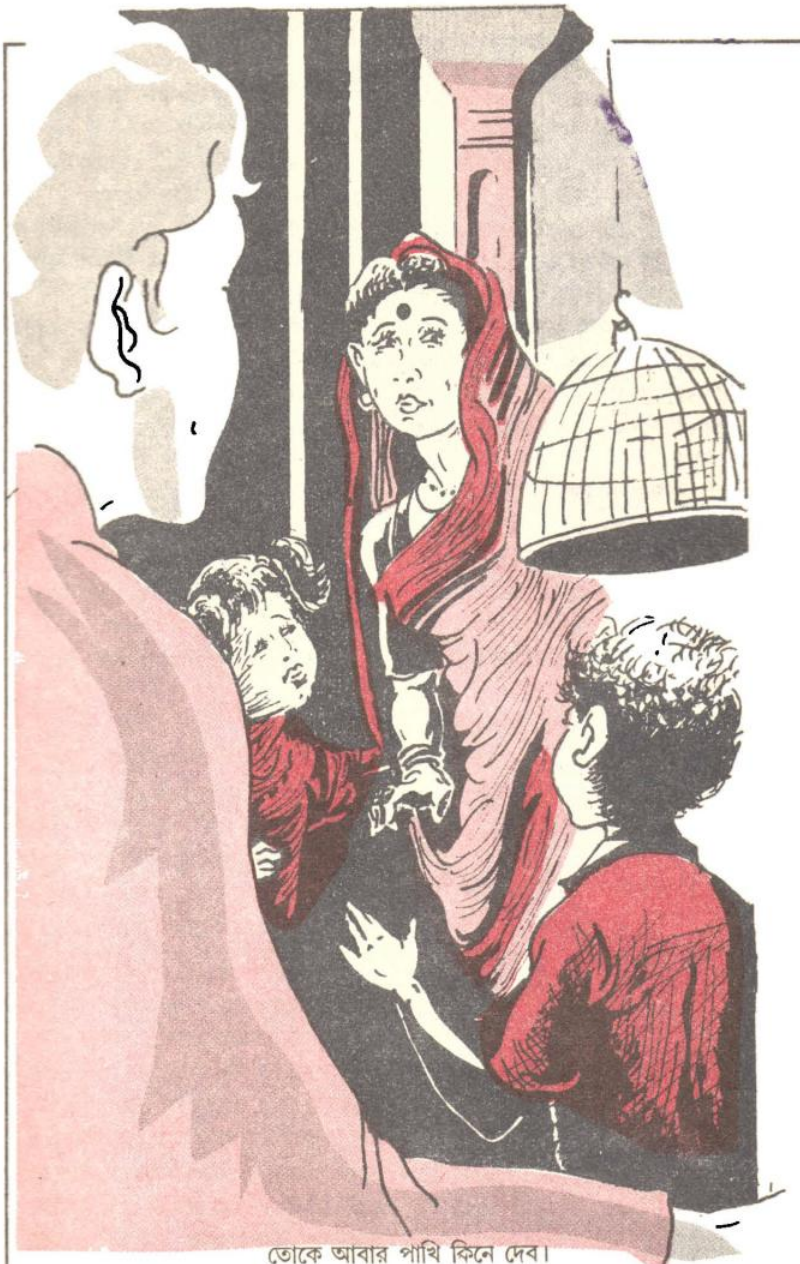

তোকে আবার পাখি কিনে দেব।

আমি বললুম, আবার ধরতে পারলে একদম পিটিয়ে মারবে।

রাজা চুপচাপ কথা না বাড়িয়ে উঠে পড়ল পাঁচিলে। তারপর একে একে আমরা দুজন উঠেই এপাশে লাফিয়ে পড়েই দৌড়। যতক্ষণ না বাড়িতে এসেছি আর থামিনি। খুব অন্যায় হয়ে গেছে মা। বিশ্বাস করো আজ বুঝলাম, না বলে কারো জিনিস নেওয়া কত অন্যায়। আর কক্ষণো করব না।

ব্যাপারটা হালকা হলো টুপুরের কথায়, দাদাভাই! দেখবে এসো পাশের ঘরে কারা এসেছে।

টাপুর ছুটে গেল। ভেবেছে বোধহয় বড় মামা এসেছে। যেতেই টুপুর বলল আঙুল তুলে, ঐ দেখ।

টাপুর দেখল দুটো পুতুল। বলল, ও তো পুতুল।

টুপুর বলল, তুমি তো পেয়ারা বাগানে বন্দী ছিলে, কিচ্ছু খোঁজ রাখ না। এদিকে কত কাণ্ড হয়ে গেল। আমার পুতুলের বিয়ে হলো, বাবা অফিস থেকে চলে এলো, তোমার পাখির খাঁচা খুলে সব পাখি ফুড়ুৎ।

টাপুরের ভ্রু কুঁচকে উঠল, কী, পাখি উড়ে গেছে? সে দৌড়ে মায়ের কাছে এলো।

এতক্ষণ মা সামলে ছিল। এবার আর নিজেকে সামলে রাখতে পারল না। কেঁদে ফেলল। চোখের জল মুছতে মুছতে বলল, হ্যাঁ রে বাবা, তোর পাখির খাঁচার দরজাটা কে খুলে দিয়েছে কে জানে। সব পাখি উড়ে গেছে। কিচ্ছু ভাল লাগছে না।

টাপুর এক ছুটে পাখির খাঁচার কাছে গিয়ে শূন্য খাঁচায় হাত বুলিয়ে দেখতে লাগল।

টাপুরের মনের কষ্ট মায়ের বুকে বিঁধতে লাগল। মা এগিয়ে এসে সান্ত্বনা দিয়ে টাপুরকে বলল, মন খারাপ করিস না বাবা। তোকে আবার পাখি কিনে দেব।

টাপুর শূন্যদৃষ্টি মেলে আকাশের দিকে খানিকক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে থেকে বলল, নাঃ মা, আর আমি কোনোদিন পাখি পুষব না। বড় কষ্ট।

মা বলল, মন খারাপ করিস না বাবা, আমি কথা দিলাম তোকে পাখি কিনে দেব। আবার উঠোনে বসবে কিচির মিচির আসর।

টাপুর মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বলল, মা! মালীকাকার কাছে আধঘণ্টা বন্দী থেকে হাড়ে হাড়ে বুঝেছি বন্দী থাকার কি কষ্ট। আমি আর ওদের খাঁচায় বন্দী করব না। দেখবে ওরা তা হলে আপনি এসে এই উঠোনে বসাবে কিচির মিচির আসর। তার থেকে বেশি মজা আর কিই বা হতে পারে। ইস আমি যদি ওদের উড়ে যাওয়াটা দেখতে পেতাম!

মনে মনে মালীকাকার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে প্রাণভয়ে দৌড়ে মাঠ পেরোনো আর পাখিদের খাঁচা খোলা পেয়ে উড়ে যাওয়ার গতি আর আনন্দ একাকার হয়ে যেতে লাগল। টাপুর হাততালি দিয়ে বলে উঠল, বেশ হয়েছে, বেশ।

মা ছলছলে চোখে আদরের টাপুরকে দেখতে দেখতে হঠাৎই মনে হলো—টাপুর যেন পাখির মতোই সহজ-সরল-সুন্দর। দু'হাত বাড়িয়ে কোলে টেনে নিল টাপুরকে।

টাপুর যেন ছোট, শ্রান্ত পাখি এখন শান্ত নীড়ে স্থির। মায়ের কোল যেন অভয়াশ্রম।

ছবি ঃ সুদীপ্ত মণ্ডল

বি. সি. মজুমদার কর্তৃক নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিঃ ৬৮ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও ১১ নং ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে শ্রী অরুণ চন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও সম্পাদিত।

বইমেলার বই

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের
বইব্যবসা ও পাঁচ পুরুষের বাঙালি পরিবার

(কোনও গল্প নেই, নিখুঁত তথ্যসমৃদ্ধ রচনা)

১৮৮০ সালে বরদাপ্রসাদ মজুমদার হাওড়া জেলার পাতিহাল থেকে কলকাতায় এলেন। জমিদারি ছেড়ে শুরু করলেন বই ফেরি। তাঁর শুরু করা সেই ব্যবসা পাঁচ পুরুষের হাত ধরে নতুন শতাব্দীর পঞ্চদশ দশকে প্রবেশ করল। কিভাবে, কতটা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে, দেশে-বিদেশে দুর্লভ এরকম একটি প্রতিষ্ঠান দেড়শ বছরের দিকে এগিয়ে চলেছে? নির্ভীক, নির্মোহ লেখনীতে অবিচ্ছিন্ন সেই ধারাবাহিকতার সম্পূর্ণ দলিল।

ডাঃ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর
আমাকে চেনো

সবল ও সুস্থ থাকার চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে এই বইটির মধ্যে। বইটি হাতের কাছে থাকলে অনেক অসুখ-বিসুখকেই দূরে সরিয়ে রাখা যাবে। আমরা যদি আমাদের শরীরকে চিনি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি জানি ও তাদের সুস্থ রাখতে পারি তাহলে শুধু দীর্ঘজীবীই হবো না, নীরোগ হয়ে বেঁচে থাকবো। স্কুল, কলেজ, ডাক্তারি, নার্সদের ট্রেনিংয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে বইটি একটি অমূল্য সম্পদ।

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের
শঙ্করকন্যার কাছে

অমরকণ্টক থেকে নর্মদার ধার ধরে সোজা আরব সাগর। দীর্ঘ এই পথ পরিক্রমাবাসীরা পায়ে হেঁটে অতিক্রম করেন। গভীর জঙ্গল, রুক্ষ পর্বত, হিংস্র জীবজন্তু, ভয়ঙ্কর ডাকাতে ভরা এই পথে আছে অজস্র শিবমন্দির। আছে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের ওঁকারেশ্বর, আছে রাজরাজেশ্বরী মন্দির, আছে শূলাপাণি ঝাঁড়ি। আর আছেন পিতা-পুত্রী—শিবশঙ্কর ও নর্মদা মাঈ। বিপদে-আপদে তাঁরাই রক্ষা করেন পরিক্রমাবাসীদের, যোগান ক্ষুধার অন্ন।

ছোটদের জন্যে

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের
গুপ্তধন রহস্য
(রহস্য সিরিজের নবম বই)

সুভাষ ধরের
লস্করহাটের দুই শয়তান
(সত্য ঘটনা অবলম্বনে পুলিশি কাহিনী)

গৌরী দের
রাত তখন বারোটা
(শিহরন জাগানো ভৌতিক কাহিনী)

নব কলেবরে

হেমেন্দ্র কুমার রায়ের

(তিনখণ্ডে ১১টি বই)

কিং কঙ
(কিং কঙ, অমানুষিক মানুষ, ভগবানের চাবুক, আলেকজান্ডার দি গ্রেট)

গুপ্তধনের দুঃস্বপ্ন
(গুপ্তধনের দুঃস্বপ্ন, বাঘরাজের অভিযান, চতুর্ভুজের স্বাক্ষর, নিশাচরী বিভীষিকা)

দেড়'শ খোকার কাণ্ড
(দেড়'শ খোকার কাণ্ড, সুন্দরবনের মানুষ বাঘ, আধুনিক রবিনহুড ও নেপোলিয়ন)

টার্জান সিরিজ

(চারখণ্ডে ১৩টি বই)

টার্জান দি এপ্‌ম্যান
(টার্জান দি এপ্‌ম্যান, অ্যাডভেঞ্চার অব্ টার্জান, টার্জান এন্ড হিজ মেট্)

টারজান দি ফিয়ারলেস
(টারজান দি ফিয়ারলেস, টারজান এন্ড হিজ সন, টারজান দি মাইটি)

টার্জান এ্যান্ড দি ট্রেইটর
(টার্জান এ্যান্ড দি ট্রেইটর, টার্জান ইন দি জাঙ্গল, টার্জান দি গ্রেট্)

টার্জান এ্যাণ্ড হিজ ফ্রেণ্ড
(টার্জান এ্যাণ্ড হিজ ফ্রেণ্ড, টার্জান ইন্ ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড, টার্জান ফাইটস ফর্ লাইফ্, টারজান দি হিরো)

শিবরাম চক্রবর্তীর—হিপ হিপ হুররে

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড ■ ২১, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

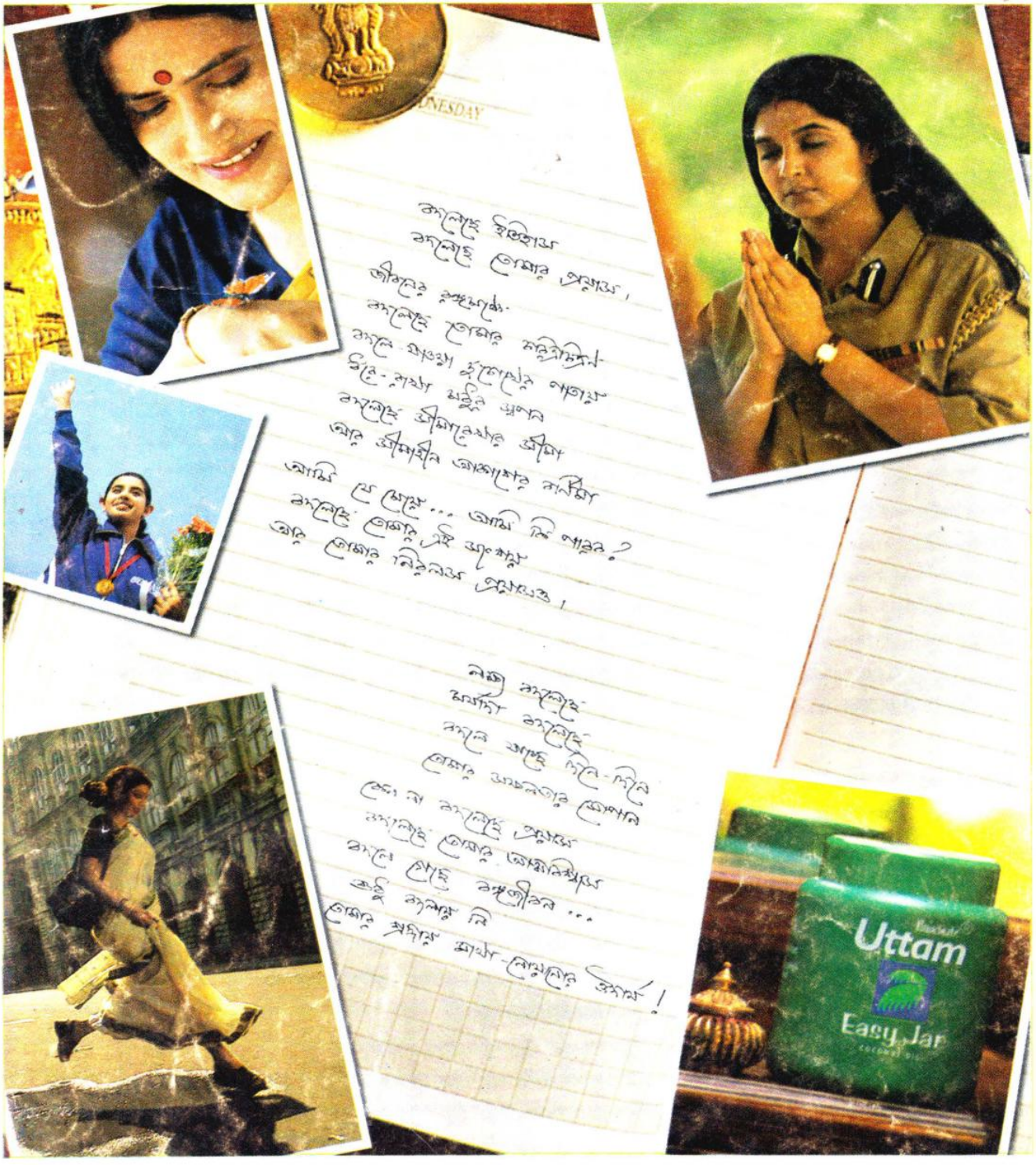

Registration No. Tech/W.B./RNP-93/ 2002 February "Suktara".

Parachute Uttam প্রগতিশীল বাঙালী নারীর সৌন্দর্যের ভরসায়।

MARI-UTTAM/01/0036